সহীহ হাদীসে উল্লেখিত মাসনূন নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ
হাদীস বিশারদগণের উদ্ধৃতি, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায়
সমৃদ্ধ একটি প্রামানিক উপস্থাপনা

নবীজীর নামায

ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল
মদীনা মুনাওয়ারাহ

সহীহ হাদীসে উল্লেখিত মাসনূন নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ
হাদীস বিশারদগণের উদ্ধৃতি, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায়
সমৃদ্ধ একটি প্রামাণিক উপস্থাপনা

নবীজীর নামায

মূল

ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল
মদীনা মুনাওয়ারাহ

সম্পাদনা ও ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব
আমীনুত তা'লীম : মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব : শান্তিনগর আজরুন কারীম জামে মসজিদ, ঢাকা
তত্ত্বাবধায়ক : মাসিক আল কাউসার, ঢাকা

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ
মুদাররিস : মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব : আফতাবউদ্দীন জামে মসজিদ, পল্লবী, ঢাকা
সহ-সম্পাদক : মাসিক আল কাউসার, ঢাকা

নবীজীর নামায

মূল ঃ ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মুমতায লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার, ৬ষ্ঠ তলা
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ২০১০ ঈসায়ী
প্রথম সংস্করণ ঃ আগস্ট ২০০৯ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-70250-0017-9

মূল্য ঃ তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র

একমাত্র পরিবেশক

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আমার সকল উসতাযের
হায়াতে তাইয়্যেবাহ্ কামনায়।

—অনুবাদক

অনুবাদকের কথা

'নবীজীর নামায' শব্দ দু'টি যে পবিত্র সম্বন্ধ বহন করে তা গভীরভাবে উপলব্ধি করার বিষয়। এই সম্বন্ধই একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য।

একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য এই যে, দেড় হাজার বছর পরও তার সকল শিক্ষা প্রকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। ইসলামের নবী (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ, শিক্ষা ও আদর্শ এমনভাবে সুসংরক্ষিত যে, এতে দ্বিধা-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। আকাঈদ ও ইবাদাত থেকে শুরু করে মুয়ামালাত, মুআশারাত, আখলাক ইত্যাদি সকল বিষয়ে এই কথা সত্য। আল্লাহ তাআলার এই মহা নেয়ামত, নবীর সঙ্গে উম্মতের এই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না।

বলাবাহুল্য যে, নবীর সঙ্গে যুক্ত থাকাই উম্মতের নাজাতের একমাত্র পথ, কামিয়াবী ও সফলতার একমাত্র উপায়। মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার এছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

এই সত্য মুসলিম উম্মাহ উপলব্ধি করুক বা না করুক, শত্রুরা ঠিকই উপলব্ধি করেছে। এজন্য তারা সর্বশক্তি ব্যয় করেছে, কীভাবে এই পবিত্র সম্বন্ধকে নস্যাৎ করা যায়। মুসলমানের শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে তো বহু পূর্বেই ইসলামকে উৎখাত করা হয়েছে, বিশ্বাস ও মুল্যবোধ এবং চেতনা ও অনুভূতি থেকেও কীভাবে তাকে বিলুপ্ত করা যায় এজন্য সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে চলেছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা, ইসলাম ও ইসলামের নবীর সঙ্গে যেন মুসলমানের কোনো যোগসূত্র অবশিষ্ট না থাকে। যেন ইসলামই হয় মুসলমানের জীবনে সবচেয়ে অপ্রাসঙ্গিক আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই হয়ে যান উম্মতের কাছে সবচেয়ে অপরিচিত! নাউযুবিল্লাহ! কুফর ও ইলহাদের সকল অপচেষ্টার মূল কথা এটাই।

অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহর কিছু নাদান দোস্ত এই খায়েরখাহী করছেন যে, অন্তত ইবাদত-বন্দেগীর পর্যায়ে যেসব মুসলিমের কিছু সম্পর্ক ইসলামের সঙ্গে রয়েছে তাদেরকেও সংশয়ী ও বিচলিত করে তুলছেন। এ প্রসঙ্গে নামাযের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এটি ইসলাম ও মুসলমানের সঙ্গে কী ধরনের ওয়াফাদারী তা ওই বন্ধুদের দ্বিতীয়বার ভেবে দেখা উচিত। এতে কি পরোক্ষভাবে দুশমনের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করা হয় না?

আমাদের করণীয় ছিল ইসলামের সঙ্গে মুসলমানের যেটুকু সম্পর্ক রয়েছে তাতে প্রাণ-সঞ্চারের চেষ্টা করা এবং যেসব বিষয়ে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে সেসব বিষয়ে তাদেরকে ইসলামী আদর্শের দিকে নিয়ে আসা। অতএব যারা কোনো স্বীকৃত ইমামের নির্দেশনা মোতাবেক নামায আদায় করছেন

তাদেরকে পেরেশান না করে যারা একেবারেই নামায পড়ে না, কিংবা নামায পড়লেও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে দূরে তাদের পিছনে সময় ব্যয় করা। অথচ এ বিষয়ে তাদেরকে আগ্রহী হতে দেখা যায় না।

আর একজন মুমিনের প্রতি এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কী হতে পারে যে, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে তাকে নবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন সাব্যস্ত করা হল! তার সুন্নাহ্সম্মত ইবাদত- বন্দেগীকেও সুন্নাহ্-বিরোধী আখ্যা দেওয়া হল! বলাবাহুল্য, এর চেয়ে বড় জুলুম আর কিছুই হতে পারে না। আজকাল নামায বিষয়ে এই অন্যায় প্রচারণা খুব বেশি শোনা যায় যে, হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের নামায সুন্নাহসম্মত নয়! তারা যেহেতু ইমামের পিছনে ফাতিহা পাঠ করে না, আমীন জোরে বলে না, রফয়ে ইয়াদাইন করে না, ঈদের নামায বারো তাকবীরের সঙ্গে আদায় করে না তাই তাদের নামায সুন্নাহ্-সম্মত হয় না! তাদের অভিযোগের সারকথা এই দাড়ায় যে, নামাযের যে নিয়ম তারা গ্রহণ করেছেন 'সুন্নাহ' তার মাঝে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে হাদীস ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নামাযের অন্যান্য নিয়ম সুন্নাহ থেকে খারিজ! তাদের এই অন্যায় ও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্তি প্রমাণ করে আলিমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে নামাযের বিষয়গুলো হাদীস ও সুন্নাহর মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে। 'নবীজীর নামায' শীর্ষক অনুবাদ গ্রন্থটি সে ধরনেরই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। গ্রন্থকার মূল গ্রন্থের ভূমিকায় রচনার উদ্দেশ্য আলোচনা করে লেখেন–

"আজকাল এমন এক দলের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যাদের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার সারকথা হচ্ছে, বিশেষ কিছু মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন উত্তপ্ত আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো, যাতে শরীয়ত-নির্দেশিত নিয়ম-নীতি, কায়েদা-কানুনের কোনো তোয়াক্কাই করা হবে না। অন্য দিকে তাদের কাছে রয়েছে সুন্নাহর এক অভিনব মাপকাঠি। তা এই যে, যে কাজ তারা করেন তা হল সুন্নাহ। আর অধিকাংশ মুসলিম যে কাজ করেন তা সুন্নাহ-বিরোধী।...

"তাদের প্রচার-প্রচারণার সারকথা এই দাড়ায় যে, হাদীস শরীফের সঙ্গে কেবল তাদেরই সম্পর্ক রয়েছে, আর অন্য সব মুসলিম হাদীস মোতাবেক আমল করা থেকে বঞ্চিত। এইসব বিভ্রান্তিকর প্রচার-প্রচারণা নিরসনের লক্ষ্যেই এ পুস্তক রচিত হয়েছে।"

মূল উর্দূ গ্রন্থটি বেশ সুখপাঠ্য এবং উর্দূভাষী পাঠকের রুচি ও মেযাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলা অনুবাদেও এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য মূলানুগ অনুবাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভাষা প্রাঞ্জল এবং পাঠকের জন্য সহজবোধ্য করার জন্য কোথাও কোথাও উপস্থাপনাগত কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

মূলগ্রন্থে বেশ কিছু আলোচনার গ্রন্থকার টীকা আকারে করেছেন। কিছু টিকা ছিল দীর্ঘ পর্যালোচনামূলক। অনুবাদে তা পরিশিষ্ট আকারে গ্রন্থের শেষে নিয়ে

যাওয়া হয়েছে। সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা, যেখানে সম্ভব হয়েছে মূল গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ ছাড়া আরো যেসব কাজ করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি হল উদ্ধৃতি পরীক্ষা। হাদীস ও আছারের আরবী পাঠ এবং অন্যান্য আরবী উদ্ধৃতি যত্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে এবং বেশ কিছু অসঙ্গতি দূর করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে হাদীসের কিতাবের শুধু অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ (কিতাব ও বাব) উল্লেখ করা হয়েছিল যেন যেকোনো এডিশন থেকে হাদীসটি বের করা যায়। অনুবাদে কুতুবে সিত্তার হিন্দুস্তানী নুসখার খণ্ড ও পৃষ্ঠানম্বরও সংযুক্ত হয়েছে। আশা করা যায়, তালিবে ইলম ভাইরা এতে উপকৃত হবেন।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম অনুবাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শুনেছেন এবং বেশ কিছু বিষয় সংশোধন করে দিয়েছেন, যা সংশোধন করা অপরিহার্য ছিল।

তাঁর ভূমিকাটিও এ গ্রন্থের একটি মূল্যবান সংযোজন। এটি 'সুন্নাহসম্মত নামায : কিছু মৌলিক কথা' শিরোনামে মাসিক আল-কাউসারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রথম দুটি প্যারা ১৪২৮ হিজরীর হজ্জের সফরে মসজিদে নববীর ছুফফায় বসে লিখেছিলেন।

গ্রন্থকারও বলেছেন যে, এ গ্রন্থের তথ্যসংগ্রহ ও বিন্যাসের বেশ কিছু কাজ তিনি হারাম শরীফে করেছেন আর গ্রন্থের শুভসমাপ্তি হয়েছে রিয়াজুল জান্নাহতে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু এবং এই মুবারক অনুসঙ্গগুলো কি অনুবাদটির মকবূলিয়্যাতের অসীলা হতে পারে না? মেহেরবান আল্লাহর জন্য তো কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

উস্তাদে মুহতারামের আরো তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ এ গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে "মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি", "সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা" এবং "সহীহ হাদীসের আলোকে ঈদের নামায"। ইনশাআল্লাহ পাঠকবৃন্দ এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

পরিশেষে মাকতাবাতুল আশরাফের সত্ত্বাধিকারী মাওলানা হাবীবুর রহমান খান ছাহেবের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুবাদে বারবার বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিটি অমলিন ছিল।

এ গ্রন্থের পিছনে আরো কিছু ভাইয়ের নীরব অবদান রয়েছে। তাদেরকেও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

দ্বীনের এই সামান্য প্রয়াস যদি আল্লাহ তাআলা নিজ ফয্ল ও করমে কবুল করেন তবেই আমাদের সবার শ্রম সার্থক হবে। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

অনুবাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত 'ইসলামী পুস্তক প্রদর্শনী' তখন বায়তুল মুকাররমের দক্ষিণ চত্বরে হতো। এ ধরনের এক প্রদর্শনী চলাকালে এক বিকেলে আমি মাকতাবাতুল আশরাফ-এর স্টলে এসে বসেছি। এর মধ্যে একজন মুরুব্বী এসে আমাকে বললেন,

> 'দেখুন! এ উপমহাদেশের লোকেরা শত শত বৎসর যাবত হানাফী ফিক্‌হের অনুসরণ করে পরিপূর্ণরূপে দ্বীনদারী পালন করে আসছে। আর আজকাল বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের অর্ধ শিক্ষিত কতিপয় শব্দের যাদুকর, বিদ'আতী ও লা-মাযহাবী সম্প্রদায় মিলে সেই মাযহাবের বিরুদ্ধে লাগাতার ভিত্তিহীন অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার মারাত্মক ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু আমাদের লোকদের এ ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে দেখছি না। আপনি দয়া করে আপনার এ প্রকাশনী থেকে এ ব্যাপারে মজবুত কিছু করার চেষ্টা করুন।'

পরবর্তীতে আমার মুরুব্বী এ দেশের অন্যতম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম তার অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন যে, তিনি তার কর্মস্থল গাজীপুরের বোর্ডবাজারে অবস্থিত ওআইসি'র আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজী'তে রিক্সাযোগে যাচ্ছেন। রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া দেওয়ার পর রিক্সাওয়ালা বললো, 'হুজুর! একটি কথা জিজ্ঞেস করি? 'আমরা নাকি হানাফী মুসলমান? মুহাম্মাদী (খাঁটি) মুসলমান নই? আজকাল একদল লোক রাস্তা-ঘাটে বারবার আমাদেরকে এ কথা বলে।'

হযরত প্রফেসর ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম তার জীবনের আরো একটি ঘটনা শোনালেন,

> তিনি বলেন, গত কয়েক বছর আগে হজ্বের মৌসুমে মক্কা শরীফে আমার পরিচিত একজন অন্য আরেকজন নতুন হাজী ছাহেবের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন মাসালার আলোচনা প্রসঙ্গে

আমি বললাম, 'আমাদের হানাফী মাযহাবে হজ্বের আমলসমূহের (যথা কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী করা ও মাথা মুণ্ডানোর) ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। ক্রম ঠিক না থাকলে দম ওয়াজিব হবে।'

আমার এ কথা শুনতেই সেই নতুন হাজী ছাহেব একেবারে জ্বলে উঠলেন এবং ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, এক আল্লাহ, এক রাসূল, এক কুরআন, মাযহাব আবার কোত্থেকে এলো? আপনারা মৌলবী সাবরাই বেশী বাড়াবাড়ি করেন। অথচ আমার পরিচয় দেওয়ার সময় পরিচয়দানকারী বলেছিলেন, 'ইনি বুয়েটের প্রফেসর, প্রতি বছর হজ্বে আসেন।' তাছাড়া সে সদ্য পাশ করা ডাক্তার। বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট - যুবক। সে যেভাবে আমাকে ধমক দিলো তাতে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। পরক্ষণেই মনে হলো, আল্লাহপাক তো কুরআন শরীফে বলেছেনই 'যখন তাদের সাথে অজ্ঞ লোকেরা বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন তারা বলে সালাম। আমি সালাম দিয়ে চলে আসলাম।

এরপর আমাদের এ মুরুব্বীও বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা কিছু সহজ-সরল কিতাব উম্মতকে উপহার দাও!

এছাড়া অনেকেই অনেক রকম তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন, বিশেষত বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যখন 'ইসলামী অনুষ্ঠান ও প্রশ্নোত্তর পর্ব' নামে অপরিণামদর্শী কতিপয় লোকের মাযহাবের বিরুদ্ধে লাগামহীন বক্তব্য আসতে থাকে এবং কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত স্বতঃসিদ্ধ ঐকমত্যের মাসয়ালাসমূহ হতে কতিপয় মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইজমায়ে উম্মতের বিপরীতে বহুদিন আগে পরিত্যক্ত কিছু 'শায', 'মুনকার' (ভ্রান্ত ও বিচ্যুত) রেওয়ায়েতকে সেসবের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে দাড় করানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা ধারাবাহিক ও অব্যাহতভাবে শুরু হয় তখন উপরোক্ত প্রস্তাব আমার অনেক শ্রদ্ধেয়জনের পক্ষ থেকে জোরালোভাবে আসতে থাকে।

সব সময়ই আমার মনে হয়েছে যে, বর্তমানে যখন মুসলমানদের ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে, ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক-এর স্থলে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা জায়গা করে নিয়েছে। পরস্পরের দরদ ও মহব্বতের জায়গায় বিরোধ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম জাতি আজ পার্থিব এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতো চিন্তা ও আদর্শের ক্ষেত্রে গোলামীর শিকার হয়েছে। যার ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মুসলমানদের কোন প্রভাবই নেই। ইসলামী শিক্ষা ত্যাগ করার কারণে মুসলমানদের জন্য পুরো পৃথিবীটাই জলন্ত দোযখে রূপান্তরিত হয়েছে।

একদিকে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান, কাশ্মীর, ইরাক ও ফিলিস্তীনে

মুসলমানদের উপর সর্বক্ষণ অগ্নি বর্ষিত হচ্ছে, নারী ও শিশুসহ হাজারো নিরপরাধ মুসলমানকে যখন ইচ্ছা তখনই পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলমানদের সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে, বসতী নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে, মুসলমানদের ইজ্জত আব্রু লুণ্ঠন করা হচ্ছে, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে কুফরের পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে, কুফরীশক্তি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস করার পর এখন সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবশিষ্ট রাষ্ট্র ও মুসলিম জনসাধারণের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার পায়তারা করছে।

এ ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কোন্ মুসলমান এমন আছে যে, নিজেদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধকে হাওয়া দিবে? মিটে যাওয়া পুরোনো ফিতনা নতুনভাবে খুচিয়ে তুলবে? নিভে যাওয়া আগুনকে নতুন করে প্রজ্জলিত করবে। এভাবে মুসলমানদের অন্তরে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করে তাদের ঈমান ও আকীদাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে?

কিন্তু আফসোস! উপরোক্ত ব্যক্তিরা এ কাজই করছে। আর সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আমলের মুহাফেজ হক্কানী উলামায়ে কেরাম তাদের এ সকল কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধের জন্য যবান ও কলমের জিহাদ অব্যাহত রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। আল্লাহপাক যাদের জন্য সীরাতে মুস্তাকীমের ফয়সালা করেছেন, তারা উলামায়ে কেরামের এ প্রচেষ্টায় সারা দিয়ে দ্বীন ও ঈমানের উপর কায়েম থাকতে সচেষ্ট হচ্ছেন।

মাযহাব বিরোধী সম্প্রদায় এবং আদর্শহীন একটি রাজনৈতিক মতের অনুসারী ও বিদআতপন্থীদেরকে আজকাল একটি ব্যাপারে খুবই তৎপর দেখা যায়। আর তা হলো হানাফী মাযহাবের অনুসারী নিয়মিত নামাযীদেরকে নামাযের ঐ সকল বিষয়ে সন্দেহপ্রবণ করে তোলা যেসব বিষয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক পদ্ধতি প্রমাণিত থাকার কারণে বিভিন্ন মাযহাবে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এ ব্যাপারে তারা এত বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করেছে যে, এখন যদি হক্কানী উলামায়ে কেরাম কিছু না করেন, তাহলে তা দায়িত্বে অবহেলার পর্যায়ে চলে যাবে।

এ কথা চিন্তা করে আমি আমার ইলমী মুরুব্বী মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমকে হানাফী মাযহাবে অনুসৃত নামাযের সূচনা হতে শেষ পর্যন্ত সকল মাসয়ালা যা কুরআন, হাদীস ও ইজমার মজবুত দলীলের দ্বারা প্রমাণিত সেগুলোকে দলীল উল্লেখসহ সাধারণ মুসলমানের বোধগম্য ভাষায় সংকলন করার প্রস্তাব করলে তিনি আমাকে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত একজন আলেম ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল কর্তৃক রচিত “নামাযে পায়াম্বার স.” এর একটি কপি দেখান এবং তা অনুবাদের প্রস্তাব করেন। আমি

হুজুরের তত্ত্বাবধানে মরকাযুদ দাওয়াহর কারো হাতে তরজমা করানোর কথা বললে, হুজুর মারকাযের উদীয়মান নবীন উস্তায মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহর নাম প্রস্তাব করেন। আমারও তা খুবই উপযুক্ত মনে হয়। এরপর হুজুরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রায় দুই বছরে কিতাবটি মুদ্রণের পর্যায়ে চলে আসে। এর মধ্যে হুজুর ৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী 'সুন্নাহসম্মত নামায : কিছু মৌলিক কথা' শীর্ষক একটি অতিমূল্যবান ভূমিকা লিখে দেন, যা আমার ধারণা মতে বাংলা ইসলামী সাহিত্যের সর্বোচ্চ ইলমী নমুনা। আল্লাহপাক হুজুরকে হায়াতে তাইয়্যেবাহ নসীব করুন এবং জাতিকে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সম্পাদক, অনুবাদক ছাড়াও অনেকেই এ কাজে আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহপাক তাদের সবাইকে উত্তম বদলা দিন। আমীন।

মাকতাবাতুল আশরাফের প্রায় দেড় শতাধিক প্রকাশনার মধ্যে আমার ধারণামতে এটিই সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইলমী প্রকাশনা। এজন্য আমরা আমাদের সাধ্যমতো সতর্কতা অবলম্বন করেছি। চেষ্টা করেছি কিতাবটিকে যথাযথ মানসম্পন্ন করে প্রকাশ করার। তরপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো ইনশাআল্লাহ।

আমাদের ধারণামতে কিতাবখানা উলামা তালাবাসহ সর্বশ্রেণীর মুসলমানেরই পাঠ করা উচিত এবং কওমী মাদরাসার মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য করা উচিত। কারণ কিতাবখানা গভীর মনোযোগসহ বুঝে পাঠ করলে নিজের মাযহাব সম্পর্কে দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে এবং মাযহাব বিরোধীদের উপস্থাপিত বক্তব্যের অসারতা প্রকাশ পাবে।

কিতাবখানা পাঠ করে যদি একজন মুসলমানেরও দ্বীনী উপকার হয়, তাহলে আমরা আমাদের শ্রম স্বার্থক মনে করবো।

আল্লাহপাক সবাইকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর দৃঢ়পদ থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

তারিখ
২৭ শাবান, ১৪৩০ হিজরী
২০ আগস্ট ২০০৯ ঈসায়ী
রাত ১:৫০ মিনিট

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা ১২০৫

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইশার নামাযের মাসনূন ওয়াক্ত	১২৯
ফজরের নামাযের মাসনূন ওয়াক্ত	১৩০
মাকরূহ ওয়াক্ত	১৩১
আযান	১৩৩
আযানের গুরুত্ব ও ফযীলত	১৩৩
আযানের ইতিহাস	১৩৩
আযানের বাক্য	১৩৪
মাসনূন আযান	১৩৪
আযানের জওয়াব	১৩৭
আযানের পরের দু'আ	১৩৭
ইকামত	১৩৮
প্রাসঙ্গিক আলোচনা	১৩৯
ইকামতের জওয়াব	১৪০
বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করা	১৪১
নামাযের মাসনূন নিয়ম	১৪২
কাপড় পরিধান করা	১৪৩
মাথা আবৃত করা	১৪৪
কিবলামুখী হওয়া	১৪৫
দাড়িয়ে নামায পড়া	১৪৬
নিয়ত করা	১৪৬
তাকবীর	১৪৭
হাত ওঠানো	১৪৮
ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরা	১৪৯
নাভির নিচে হাত বাঁধা	১৫০
ইমামগণের সিদ্ধান্ত	১৫০
ছানা	১৫১
সর্বোত্তম ছানা	১৫২
সাহাবায়ে কেরামের আমল	১৫২
তা'আওউয্	১৫৩
তাসমিয়া	১৫৩
খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবা-তাবেয়ীনের আমল	১৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা ফাতিহা	১৫৬
একা নামায আদায়কারী সূরা ফাতিহা পড়বে	১৫৬
মুকতাদী সূরা ফাতিহা পড়বে না	১৫৮
প্রথম দলীল	১৫৮
দ্বিতীয় দলীল	১৬০
তৃতীয় দলীল	১৬১
চতুর্থ দলীল	১৬৪
পঞ্চম দলীল	১৬৫
ষষ্ঠ দলীল	১৬৫
সপ্তম দলীল	১৬৬
অষ্টম দলীল	১৬৯
নবম দলীল	১৭০
দশম দলীল	১৭১
একাদশ দলীল	১৭১
দ্বাদশ দলীল	১৭১
ত্রয়োদশ দলীল	১৭২
আমীন-প্রসঙ্গ	১৭৪
হযরত উমর (রা.)-এর ফরমান	১৭৬
হযরত আলী (রা.)-এর তরীকা	১৭৭
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ফরমান	১৭৭
সূরা মিলানো	১৭৮
জোহর-আসরে অনুচ্চ স্বরে কিরাআত	১৭৯
রাফয়ে ইয়াদাইন (হাত ওঠানো)	১৮০
প্রথম দলীল	১৮০
দ্বিতীয় দলীল	১৮১
তৃতীয় দলীল	১৮৩
চতুর্থ দলীল	১৮৪
পঞ্চম দলীল	১৮৪
ষষ্ঠ দলীল	১৮৫
সপ্তম দলীল	১৮৫
অষ্টম দলীল	১৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা
জুমু'আ	২৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা

অভিমত

"এ কিতাব থেকে পয়গম্বরে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায স্পষ্টভাবে সামনে আসে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা যেসব বিভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকে তার স্বরূপ বুঝতেও এ কিতাব সহায়ক হবে। তাই ব্যক্তিগত অধ্যয়নের পাশাপাশি মসজিদে জামাতের নামায শেষে আগত মুসল্লীদেরকে দু' একটি আয়াত বা হাদীস পড়ে শুনিয়ে দিলে তা ইলম ও বরকতের কারণ হবে। আর ছাত্রদেরকে এ কিতাবের দলীলগুলো মুখস্থ করিয়ে দেওয়া উচিত।"

(মাওলানা) মুহাম্মদ আসআদ মাদানী– জানাশীন শায়খুল ইসলাম
মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী

"কিতাবটি নামাযের মাসাইল বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ও সমৃদ্ধ কিতাব। উপস্থাপনা সহজ, ভাষা গতিশীল, বিন্যাস হৃদয়গ্রাহী আর তথ্যসূত্র নির্ভরযোগ্য। দলীল-প্রমাণভিত্তিক আলোচনায় আগ্রহীদের জন্য তৃপ্তি ও প্রশান্তির মাধ্যম হতে পারে এমন একটি কিতাবের প্রয়োজন অনেক দিন ধরেই প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছিল।"

ড. সাইয়েদ শের আলী শাহ
পি. এইচ. ডি, মদীনা ইউনিভার্সিটি,
সাবেক মুদাররিস, মসজিদে নববী

"এ কিতাবে নামাযের আহকাম ও মাসাইল কুরআন-হাদীসের আলোকে সুবিন্যস্তভাবে পেশ করা হয়েছে। ইলমপ্রিয় বন্ধুগণ এ কিতাব অধ্যয়নে উপকৃত হবেন বলে মনে করি।"

(মাওলানা) মুহাম্মদ মালেক কান্ধলভী
শায়খুল হাদীস, জামেআ আশরাফিয়া, লাহোর।

"এটি একটি সমৃদ্ধ এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সংকলন। পাশাপাশি দলীল থেকে দাবি শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত হচ্ছে কি না— এ বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। যে বিষয়গুলো আলোচনার দাবিদার তা দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে পরিষ্কারভাবে পেশ করা হয়েছে। আশা করি, পাঠক এই জ্ঞানভাণ্ডার থেকে উপকৃত হতে পারবেন।"

(মাওলানা মুফতী) মকবুল আহমদ
খতীব ও মুফতী, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, গ্লাসগো, স্কটল্যান্ড
প্রধান, ইসলামিক শরীয়ত কাউন্সিল, বৃটেন

"এ কিতাবে মাসনূন নামাযের সকল আরকানের ব্যাখ্যা দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে করা হয়েছে। কিতাবটি ইলমপিপাসু বন্ধুদের সংগ্রহে রাখার মতো। বিশেষত হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান উপহার। এমনকি গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরাও যদি সত্যান্বেষী মন নিয়ে কিতাবটি পড়েন তবে তাদের কাছেও সঠিক বিষয় অস্পষ্ট থাকবে না (ইনশাআল্লাহ)। কিতাবটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিসাবভুক্ত হওয়া উচিত।"

(মাওলানা) মুহা. ইদরীস আনসারী
ইদারা তাবলীগুল ইসলাম, ছাদেকাবাদ

"আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের নামায যে সুন্নাহসম্মত তা এ কিতাবে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। উপস্থাপনা খুবই সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী।"

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
খতীব, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ইসলামাবাদ

ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

সুন্নাহসম্মত নামায : কিছু মৌলিক কথা

নামায ঈমানের মানদণ্ড। ইসলামের স্তম্ভ ও নিদর্শন। আর কালেমার পরে মুসলমানের সবচেয়ে বড় পরিচয়। খুশু-খুযুর সঙ্গে সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

নামাযের বিধান যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে এসেছে তদ্রূপ তার নিয়ম-পদ্ধতিও তিনিই উম্মতকে শিখিয়েছেন। দ্বীন ও শরীয়তের ইলম অর্জনের তিনিই একমাত্র সূত্র।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নামাযের পদ্ধতি সর্বপ্রথম শিখেছেন সাহাবায়ে কেরাম। নবীজী তাদেরকে মৌখিকভাবেও শিখিয়েছেন এবং নিয়মিত তাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করেছেন। তাঁর ইরশাদ–

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

'তোমরা সেভাবেই নামায আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ।'

এরপর সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে তাবেয়ীন, তাঁদের নিকট থেকে তাবে তাবেয়ীন, এভাবে প্রত্যেক উত্তরসূরী পূর্বসূরীদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

দুই.

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক সাহাবী তাঁর সঙ্গে মদীনাতেই অবস্থান করতেন। কিছু সাহাবী ছিলেন, যারা নিজ অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণের পর এক দুই বার মদীনায় নবীজীর সাহচর্যে এসেছেন এবং কিছুদিন অবস্থান করে ফিরে গিয়েছেন। বলাবাহুল্য যে, এই আগন্তুক সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'আমল' অধিক সময় প্রত্যক্ষ করার এবং সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাননি এবং তাঁরা দ্বীনের বহু বিষয়ের; বরং

অধিকাংশ বিষয়ের জ্ঞান সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে লাভ করেননি। এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় শরীয়তের বিধি-বিধান মানসূখ বা রহিত হওয়ার ধারাও চলমান ছিল। এজন্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই সাহাবীরা কোনো বিধান বা পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেছেন, পরে তা মানসূখ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাদের পক্ষে সেটা জানার সুযোগ হয়নি। অথচ মদীনার সাহাবীরা খুব সহজেই সে সম্পর্কে অবগত হয়ে যেতেন।

মদীনার সাহাবীরাও সবাই নবীজীর সমান সাহচর্য পেয়েছেন—এমন নয়। কিছু সাহাবী সার্বক্ষণিক সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁরা খুব কমই অনুপস্থিত থাকতেন। এঁদের মধ্যে প্রবীণ সাহাবীগণ যাদেরকে 'সাবিকীনে আওয়ালীন' ও বদরী মুজাহিদীনের মধ্যে গণ্য করা হয় তাঁরা ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবিশেষ আস্থার পাত্র। সাধারণত তাঁরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে প্রথম কাতারে নামায আদায় করতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ ছিল—

لِيَلِيَنِي مِنكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى

'তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী তারা আমার নিকটে দাঁড়াবে।' এ নির্দেশ অনুযায়ী এঁরা নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে দাঁড়াতেন।

বলাবাহুল্য যে, এই সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায ও তার দিনরাতের 'আমল' প্রত্যক্ষ করার যতটা সুযোগ পেয়েছেন তা অন্যরা পাননি। আর তাঁরা যেমন সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে বিষয়গুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হতেন অন্যদের জন্য তা এত সহজ ছিল না।

এই বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও আরো অনেকে শামিল ছিলেন। এখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সফরে-হযরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম ছিলেন। হাদীস ও তারীখে তাঁর উপাধী 'ছাহিবুন না'লাইন ওয়াল বিসাদ ওয়াল মিতহারা' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাদুকা, তাকিয়া ও অযুর পাত্র-বহনকারী। (সহীহ বুখারী হাদীস ৩৯৬১)

হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন, "আমরা অনেক দিন পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তার মাতাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'আহলে বাইত' (পরিবারের সদস্য) মনে করতাম। কেননা নবীজীর গৃহে তাদের আসা-যাওয়া ছিল খুব বেশি।" (সহীহ বুখারী হাদীস ৩৭৬৯, ৪৩৮৪)

তিন.

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর যখন ইসলামী খেলাফতের পরিধি বিস্তৃত হতে লাগল এবং নতুন নতুন অঞ্চল বিজিত হল তখন সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন ও ঈমানের তালীমের জন্য দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ফারূক রা. বড় বড় সাহাবীকে সাধারণত মদীনার বাইরে যেতে দিতেন না। তবে কাদেসিয়্যা (ইরাক) জয়ের পর যখন কূফা নগরীর গোড়াপত্তন হল তখন সে অঞ্চলে দ্বীন ও শরীয়ত এবং কুরআন ও সুন্নাহর তা'লীমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে পাঠালেন। তিনি কূফাবাসীকে পত্র লিখলেন যে, "আমি আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে (রা.) তোমাদের আমীর হিসেবে এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা.) উযীর ও মুয়াল্লিম হিসেবে প্রেরণ করছি। এঁরা দুজনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনীষী সাহাবীদের অন্যতম এবং বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তোমরা তাঁদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তাঁদের অনুসরণ করবে। মনে রাখবে, আবদুল্লাহকে আমার নিজের প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমি তোমাদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য তাকে পছন্দ করেছি।" (আততবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৬/৩৬৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১/৪৮৬)

এই দুই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কুফাতেই আরো পনেরো শ' সাহাবী অবস্থান করছিলেন। যাঁদের মধ্যে সত্তর জন ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা., সায়ীদ ইবনে যায়েদ রা., হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা., সালমান ফারেসী রা., আবু মূসা আশআরী রা., প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবী সবাই কূফাতেই ছিলেন। হাদীস ও তারীখের ইমাম আবুল হাসান ইজলী রাহ. "তারীখ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'কুফাতে দেড় হাজার সাহাবী এসে বসতি স্থাপন করেন।' (মারিফাতুস-সিফাত, ইজলী ২/৪৪৮ ফতহুল কাদীর ইবনুল হুমাম, খণ্ড ১, পৃ. ৯১)

খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রা. তো একে তাঁর দারুল খিলাফা বানিয়েছিলেন।

কূফায় অবস্থানকারী সাহাবীদের নিকট থেকে কূফার অধিবাসীরা দ্বীন ও ঈমান গ্রহণ করেছেন। কুরআন ও হাদীসের ইলম অর্জন করেছেন। নামায, রোযা, হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি সকল ইবাদতের নিয়ম-কানূন শিক্ষা লাভ করেছেন। কূফার অধিবাসীরা হজ্ব-ওমরা ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনায় যেতেন এবং সেখানকার সাহাবীদের নিকট থেকেও ইলম অর্জন করতেন। লক্ষ করার বিষয় এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও অন্যান্য সাহাবী যেভাবে কূফাবাসীকে নামায পড়তে শিখিয়েছেন তাঁরা মক্কা-মদীনায় গিয়েও সেভাবেই নামায পড়তেন, কিন্তু খলীফা হযরত উমর ফারুক রা. থেকে নিয়ে হারামাইনের কোনো সাহাবী বা কোনো তাবেয়ী তাদের নামাযকে খেলাফে সুন্নত বলেছেন–এমন একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাস থেকে দেখানো যাবে না।

এই কূফানগরীতে ইমাম আবু হানীফা রাহ. জন্ম গ্রহণ করেন ৮০ হিজরীতে এবং সেখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। সে সময় ইসলামী বিশ্বে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। কূফাতেও কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। আর এটা প্রমাণিত যে, ইমাম ছাহেব একাধিক সাহাবীর সাক্ষাত এবং তাঁদের থেকে রেওয়ায়েতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এজন্য ইমাম ছাহেব তাবেয়ীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এমন অনেক মনীষী এর স্বীকৃতি দিয়েছেন যাদের ফিকহী মাসলাক হানাফী নয়। কয়েক বছর আগে ড. মুহাম্মাদ আবদুশ শহীদ নুমানী দামাত বারাকাতুহুম (প্রফেসর শো'বায়ে আরবী, করাচি ইউনিভার্সিটি) রচিত 'ইমাম আবু হানীফা কী তাবেঈয়্যত আওর সাহাবা ছে উনকী রেওয়ায়াত' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইমাম ছাহেব বিপুল সংখ্যক তাবেয়ী মনীষীর সাহচর্য পেয়েছিলেন যাঁরা ছিলেন অসংখ্য সাহাবী কিংবা তাদের সমসাময়িক প্রবীণ তাবেয়ীদের সাহচর্যধন্য। এজন্য 'আমলে মুতাওয়ারাছ' অর্থাৎ কর্মগত ধারায় চলে আসা নবী-নামাযকে যতটা কাছ থেকে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল ততটা হাদীস ও ফিকহের অন্য ইমামদের হয়নি। কেননা, তাঁরা সবাই তার পরের যুগের ছিলেন। (ইমাম ইবনু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান, মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নু'মানী, পৃ. ৫০-৫৭ ও ৬৭-৭১; ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীছুহুম, যাহিদ কাওছারী পৃ. ৫১-৫৫; ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস, মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নু'মানী পৃ. ৩৬-৪৩ ও ১১৬-১১৯; আততা'আমুল, হায়দার হাসান খান টুংকী)

মোটকথা, উত্তর প্রজন্ম পূর্ব প্রজন্ম থেকে নামায আদায়ের পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে 'তা'আমুল' ও তাওয়ারুছের মাধ্যমেই গ্রহণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীগণকে শেখানোর সময় কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর বরাত উল্লেখ করতেন– তাঁর কোনো বাণী কিংবা কর্মের উদ্ধৃতি দিতেন, কখনও বিনা বরাতে শেখাতেন। কিন্তু সর্বাবস্থায় তারা তাবেয়ীদেরকে ওই নামাযই শেখাতেন যা তাঁরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন। তদ্রূপ যদি কেউ তাদের সামনে নামাযে কোনো ভুল করত, সুন্নতের খেলাফ কোনো কাজ করত তো তারা তা সংশোধন করে দিতেন এবং প্রয়োজনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো হাদীস উল্লেখ করতেন।

যেহেতু নামাযের পদ্ধতি শুধু মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে শেখার বিষয় নয়; বরং তা শিখতে হয় সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায়কারীর নামায পড়া দেখে। এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তা'আমুলের' মাধ্যমে শেখানোর ওপরই জোর দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামও এ পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন, তাদের পরে তাবেয়ীগণও। এজন্য দেখা যায় যে, পূর্ণ নামাযের বিবরণ কোনো এক হাদীসে উল্লেখিত হয়নি; বরং দশ-বিশটি বা শ' দুইশ হাদীসেও নয়। হাদীসের দু' চারটি বা আট-দশটি কিতাব থেকেও যদি কিতাবুস সালাতের সকল হাদীস একত্র করা হয় তবুও দুই রাকাত নামাযের সকল মাসআলা এবং তার পূর্ণ কাঠামো পরিষ্কারভাবে সামনে আসবে না। এর কারণ তা-ই যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ তারা এই হাদীসগুলো নামায শেখানোর সময় প্রয়োজন অনুসারে উল্লেখ করতেন। রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্যই এটা ছিল না যে, শুধু মৌখিক বর্ণনার মধ্যে গোটা নবী-নামাযের রূপ-রেখা একই মজলিসে বা এক আলোচনায় পেশ করা হবে।

সারকথা এই যে, নামাযের নিয়ম-কানূন মূলত 'তাআমুল' ও 'তাওয়ারুছের' মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রসঙ্গে মৌখিক বর্ণনার ধারাও অব্যাহত ছিল।

চার.

যখন আল্লাহ তাআলার গাইবী ইশারায় আইম্মায়ে দ্বীন উলূমে দ্বীন সংকলনের প্রতি মনোনিবেশ করলেন তখন আইম্মায়ে হাদীস দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের মতো নামায বিষয়ক সকল মৌখিক বর্ণনাও–তা নবীজীর বাণী হোক বা কর্ম, সনদসহ সংকলন করতে লাগলেন। প্রথমদিকে মরফূ হাদীসের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের; বরং তাবেয়ীনের কর্ম ও সিদ্ধান্তও সংকলিত হয়েছে। কেননা, এগুলো

প্রকৃতপক্ষে আমলে মুতাওয়ারাছেরই মৌখিক বিবরণ বা তার ব্যাখ্যা ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হল মরফূ রেওয়ায়েত সংকলনের দিকে।

ফুকাহায়ে কেরাম নামায বিষয়ে মৌখিক বর্ণনা এবং সাহাবা-তাবেয়ীনের কর্মধারা দু'টোই সামনে রেখেছেন। এ দুয়ের আলোকে তারা যেমন মাসনূন নামাযের (সুন্নাহসম্মত নামাযের) পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা পেশ করেছেন তেমনি নামায সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সমাধানও পেশ করেছেন। নামাযের এই পূর্ণাঙ্গ কাঠামো ও মাসাইল দু' ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে : ১. দলীলের উল্লেখ ছাড়া। যেন পঠন-পাঠনে সুবিধা হয়। ২. দলীলসহ বিস্তারিত আলোচনাসহ, যেন নামাযের কাঠামো ও মাসায়েলের সূত্রও মানুষের কাছে সংরক্ষিত থাকে।

এভাবে মুসলিম উম্মাহ সংকলিত আকারে দুইটি নেয়ামত লাভ করেছে : ১. মাসায়েলের উৎস হাদীসসমূহ। ২. ওইসব হাদীস ও অন্যান্য শরয়ী দলীলের নির্যাসরূপে নামাযের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো, প্রত্যেক অংশের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট মাসায়েল ইত্যাদি।

প্রথমটি হাদীসের কিতাবসমূহে সংরক্ষিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি সংরক্ষিত হয়েছে ফিকহ, তাফসীর ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা-গ্রন্থাদিতে।

পাঁচ.

প্রথম বিষয়ের কিছু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও সংকলকদের নাম উল্লেখ করা হল।

১. 'আলমুসান্নাফ', আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম (১২৬ হি.- ২১১ হি.) এগারো খণ্ডে।

২. 'আলমুসান্নাফ', আবু বকর ইবনে আবী শায়বা (১৫৯ হি.- ২৩৫ হি.) ২৬ খণ্ডে।

৩. 'আলমুসনাদ', আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪ হি.-২৪১ হি.) ৫২ খণ্ডে।

৪. 'সহীহ বুখারী;, আবু আবদুল্লাহ বুখারী (১৯৪ হি. -২৫৬ হি.)।

৫. 'সহীহ মুসলিম', মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২০৪ হি.-২৬১ হি.)।

৬. 'আসসুনান', আবু দাউদ সিজিস্তানী (২০২ হি.-২৭৫ হি.)।

৭. 'আলজামিউস সুনান', আবু ঈসা তিরমিযী (২১০ হি.-২৭৯ হি.)।

৮. 'আসসুনানুল কুবরা', নাসায়ী (২১৫ হি.-৩০৩ হি.)।

৯. 'সহীহ ইবনে খুযাইমা', আবু বকর ইবনে খুযায়মা (২২৩ হি.-৩১১ হি.)।

১০. 'শরহু মাআনিল আছার', আবু জা'ফর তহাবী (২৩৯ হি.-৩২১ হি.)।

১১. 'শরহু মুশকিলিল আছার', আবু জা'ফর তহাবী (২৩৯ হি.-৩২১ হি.) ১৬ খণ্ডে।

১২. 'সহীহ ইবনে হিব্বান', আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (আনুমানিক ২৭১ হি.-৩৫৪ হি.) ১৬ খণ্ডে।

১৩. 'আলমু'জামুল কাবীর', ২৫ খণ্ডে।

১৪. 'আলমু'জামুল আওসাত, ১১ খণ্ডে।

১৫. 'আলমু'জামুস সগীর' ১ খণ্ডে।

তিনটিই ইমাম তবারানী, আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহমদ (২৬০ হি.-৩৬০ হি.)-এর সংকলিত।

১৬. 'সুনানুদ দারাকুতনী', আলী ইবনে উমর দারাকুতনী (৩০৬ হি.-৩৮৫ হি.)।

১৭. 'আলমুসতাদরাক আলাস সহীহাইন', হাকিম আবু আব্দিল্লাহ (৩২১ হি.-৪০৫ হি.)।

১৮. 'আসসুনানুল কুবরা', আবু বকর বায়হাকী (৩৮৪ হি.-৪৫৮ হি.) দশ খণ্ডে।

১৯. 'আততামহীদ', ইবনু আবদিল বার (৩৬৮ হি.-৪৬৩ হি.) ২৬ খণ্ডে।

২০. 'আলইস্তিযকার', ইবনু আবদিল বার (৩৬৮ হি.-৪৬৩ হি.) ৩০ খণ্ডে।

দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ ফিকহের প্রসিদ্ধ সংকলক হলেন :

১. ইমাম আবু হানীফা, নু'মান ইবনে ছাবিত আলকূফী (৮০ হি.-১৫০ হি.)। অর্থাৎ ইমাম বুখারীর জন্মগ্রহণেরও চুয়াল্লিশ বছর পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর প্রসিদ্ধতম শাগরিদ দু'জন : ইমাম আবু ইউসুফ (১১৩ হি.-১৮২ হি.) এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (১৩২-১৮৯ হি.)। ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও তাঁর শাগরিদের সংকলিত ফিকহ আলফিকহুল হানাফী নামে পরিচিত।

২. ইমাম মালিক ইবনে আনাস আলমাদানী (৯৪ হি.-১৭৯ হি.)। তাঁর সংকলিত ফিকহ 'আলফিকহুল মালিকী' নামে পরিচিত।

৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশশাফেয়ী (১৫০ হি.-২০২ হি.)। তাঁর সংকলিত ফিকহ 'আলফিকহুশ শাফেয়ী' নামে পরিচিত।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪ হি.-২৪১ হি.)। তাঁর সংকলিত ফিকহ 'আলফিকহুল হাম্বলী' নামে পরিচিত।

এই চারজন যেমন ফিকহশাস্ত্রের ইমাম তদ্রূপ তাঁরা হাফেযুল হাদীসও ছিলেন। শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ.-এর 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে, যা হাফিযুল হাদীসগণের জীবনী বিষয়ে রচিত, উক্ত চার ইমামেরই আলোচনা রয়েছে। একইভাবে তাঁদের বিশিষ্ট শাগরিদ এবং শাগরিদের শাগরিদগণও হাফেযুল হাদীসের মধ্যে গণ্য, যাঁরা এই ইমামদের সংকলিত ফিকহ বিশদভাবে আলোচনা ও সংরক্ষণ করেছেন। ফিকহের প্রসিদ্ধ ইমামগণ হাদীসশাস্ত্রে কীরূপ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য রাখতেন সে সম্পর্কে বিশদ জানা যাবে তাঁদের জীবনী এবং হাদীস বিষয়ক তাদের কর্ম ও রচনাবলি অধ্যয়নের মাধ্যমে।

সহজ ও সংক্ষেপে এ বিষয়ে ধারণা পেতে চাইলে আলিম-তালিবে ইলমগণ নিম্নোক্ত কিতাবগুলোর কোনো একটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

১. মাকানাতুল ইমাম আবু হানীফা ফিল হাদীস, মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নু'মানী।

২. ইমাম আ'যম আওর ইলমে হাদীস, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সিদ্দীকী কান্দলভী।

৩. আলইমাম আবু হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন, যফর আহমদ উছমানী।

৪.মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশশাফেয়ী, খতীব বাগদাদী।

৫. মানাকিবু আহমদ, ইবনুল জাওযী।

৬. তারতীবুল মাদারিক, কাযী ইয়ায (ভূমিকা)।

উম্মতের উপর ফকীহগণের বড় অনুগ্রহ এই যে, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানের যেমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তদ্রূপ তা সংকলনও করেছেন। বিশেষ করে ইবাদতের পদ্ধতি ও পূর্ণাঙ্গ কাঠামো স্পষ্টভাবে পেশ করেছেন, যা হাদীস ও সুন্নাহ 'আমলে মুতাওয়ারাছ' (যা সুন্নাহর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকার) থেকে গৃহীত। এর বড় সুবিধা এই যে, কোনো মানুষ মুসলমান হওয়ার পর সংক্ষেপে ওই

পদ্ধতি তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় আর সে সঙ্গে সঙ্গে নামায পড়া আরম্ভ করে। শিশুদেরকে শেখানো হয়, সাত বছর বয়স থেকেই তারা নামায পড়তে থাকে। সাধারণ মানুষ, যাদের দলীলসহ বিধান জানার সুযোগ নেই এবং শরীয়তও তাদের উপর এটা ফরয করেনি, তাদেরকে শেখানো হয় আর তারা নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে থাকে।

যদি অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের পরে এবং শিশুকে বালেগ হওয়ার পর বাধ্য করা হত যে, তোমাদেরকে নামায আদায়ের পদ্ধতি হাদীসের কিতাব থেকে শিখতে হবে, কারো তাকলীদ করতে পারবে না, দলীল-প্রমাণের আলোকে সকল বিষয় নিজে পরীক্ষা করে নামায পড়বে তাহলে বছরের পর বছর অতিবাহিত হবে কিন্তু তার নামায পড়ার সুযোগ হবে না। একই অবস্থা হবে যদি সাধারণ মানুষকে এই আদেশ করা হয়।

খুব ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, কুতুবে ছিত্তা (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস-গ্রন্থের সংকলক ইমামগণও প্রথমে নামায শিখেছেন ফিকহে ইসলামী থেকেই। এরপর পরিণত হয়ে হাদীসের কিতাব সংকলন করেছেন। অথচ হাদীসের কিতাব সংকলন করার পর তারা না ফিকহে ইসলামীর উপর কোনো আপত্তি করেছেন, আর না মানুষকে ফিকহ সম্পর্কে আস্থাহীন করেছেন। বরং তারা নিজেরাও ইসলামের ফকীহগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থেকেছেন। তবে যেখানে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হয়েছে সেখানে তারা নিজেদের বিচার-বিবেচনা মোতাবেক কোনো এক মতকে অবলম্বন করেছেন এবং অন্য মত সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন।

মোটকথা, হাদীসের কিতাবসমূহের সংকলক এবং হাদীস-শাস্ত্রের ইমামগণের যেমন বড় অবদান উম্মতের প্রতি রয়েছে তেমনি ফিকহে ইসলামীর সংকলক ও ফিকহের ইমামগণেরও বড় অবদান রয়েছে। উম্মাহর অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত উভয় শ্রেণীর মনীষীদের অবদান স্বীকার করা এবং উভয় নেয়ামত : হাদীস ও ফিকহকে সঙ্গে রেখে চলা।

আট.

বাস্তবতা এই যে, উম্মতের যে শ্রেণী খাইরুল কুরূনের মতাদর্শের উপর বিদ্যমান রয়েছে তারা সর্বদা হাদীস ও ফিকহ এই দুই নেয়ামতকে একত্রে ধারণ করে

অগ্রসর হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারাই অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। তাদের কারো মনে শয়তান এই কুমন্ত্রণা দিতে পারেনি যে, হাদীসের হুকুম-আহকাম ফিকহের আকারে সংকলিত হয়ে যাওয়ার পর হাদীস শরীফের পঠন-পাঠন, চর্চা ও গবেষণার কোনো প্রয়োজন নেই। (নাউযুবিল্লাহ)। তদ্রূপ এই প্রশ্নও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি যে, হাদীস শরীফ থাকা অবস্থায় ফিকহ ও ফুকাহার প্রয়োজন কী? কেননা, তাদের কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে, কুরআন মজীদের পরে দ্বীনের সবচেয়ে বড় ও বিস্তৃত দলীল সুন্নাহ। আর এর সবচেয়ে বড় সূত্র হচ্ছে হাদীস শরীফ। এটা দ্বীনের দ্বিতীয় দলীল ও দ্বীনী বিধি-বিধানের দ্বিতীয় সূত্র। অতএব এর প্রয়োজন কখনও ফুরোবে না। একইভাবে এটাও তাদের সামনে পরিষ্কার ছিল যে, ফিকহে ইসলামী হাদীস শরীফ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়; বরং হাদীস শরীফ ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিধিবিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও সংকলন। খোদ হাদীস শরীফেও ফিকহের গুরুত্ব ও ফকীহর মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে এবং স্বয়ং হাদীস বিশারদ ইমামগণও ফকীহদের শরণাপন্ন হতেন এবং অন্যদেরকেও এর পরামর্শ দিতেন। এজন্য এই প্রশ্নই অবান্তর যে, হাদীস শরীফ থাকা অবস্থায় ফিকহের প্রয়োজন কী?

প্রত্যেক যুগে যারা সঠিক উদ্দেশ্যে ও সঠিক পন্থায় হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করেছেন তারা ফিকহ ও ফুকাহার প্রয়োজন বোধ করেছেন প্রচণ্ডভাবে। হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজন কী এই প্রশ্নটা তখনই এসেছে যখন হাদীস চর্চার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিতে ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

নয়.

উদাহরণস্বরূপ 'নামাযের পদ্ধতি' সম্পর্কেই চিন্তা করুন। ছিফাতুস সালাত বা সালাত-পদ্ধতি বিষয়ক যত বেশি হাদীস আপনি সংগ্রহ করবেন এবং তাতে যত বেশি চিন্তা-ভাবনা করবেন পাশাপাশি আপনার প্রতিদিনের নামায আদায়ের পদ্ধতি এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যত বেশি ভাববেন ততই ফিকহ ও ফুকাহার প্রয়োজন আপনার সামনে পরিষ্কার হতে থাকবে।

কিছু সহজ বিষয় লক্ষ করুন :

গোটা নামাযের পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে কোনো এক হাদীসে নেই।

পূর্ণ নামাযের ধারাবাহিক নিয়ম হাদীসের এক দুই কিতাব নয়, ছয় বা দশ কিতাবেও বিদ্যমান নেই।

নামাযের মধ্যে বা নামায সম্পর্কে অনেক নামাযীর এমন সব সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার কোনো শিরোনাম তারা হাদীসের কিতাবে খুঁজে পান না।

বহু বিষয় এমন রয়েছে যা হাদীস শরীফে বিদ্যমান থাকলেও হাদীসের কিতাবসমূহে তা শিরোনাম করা হয়নি। কেননা, সকল হাদীস ওইসব কিতাবেই সংকলিত হয়নি যা হাদীসের কিতাব নামে পরিচিত। সীরাতের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে, এবং সীরাতের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলোতেও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। হাদীসের একটি বড় অংশ আমলে মুতাওয়ারাছের মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে।

ফিকহের ইমামগণ যখন নামাযের নিয়ম কানূন ধারাবাহিকভাবে সংকলন করেছেন তখন তারা শুধু হাদীসের দু'চার কিতাবেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; হাদীস ও সুন্নাহর গোটা ভাণ্ডার তাদের সামনে বিদ্যমান ছিল। এ জন্য তাঁরা ছিফাতুস সালাত বা নামাযের পদ্ধতি বিষয়ক ওইসব দিকও উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন যেগুলো শুধু 'হাদীসের কিতাব' থেকে কেউ বের করতে পারবে না। যেমন কওমাতে দুই হাত বাধা থাকবে না ছেড়ে দেওয়া হবে, রুকু-সিজদার তাসবীহাত, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দুআ আস্তে পড়া হবে না জোরে, মুকতাদী এক রোকন থেকে অন্য রোকনে যাওয়ার তাকবীর আস্তে বলবে না জোরে ইত্যাদি।

নামাযের বিভিন্ন কাজকর্মের ফিকহী বিধান যেমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ, সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা, আদব, মুস্তাহাব ইত্যাদির বিবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়নি তদ্রূপ নামাযে বর্জনীয় বিষয়াদি যেমন, মাকরূহে তাহরীমী, মাকরূহে তানযীহী বা নামায বিনষ্টকারী কাজকর্মও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে নেই। একটি উদাহরণ দিচ্ছি : হাদীস শরীফে এটা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ ও দুআ পড়তে বলেছেন কিন্তু এদের মধ্যে কোনটা ফরয বা ওয়াজিব আর কোনটা সুন্নত বা মুস্তাহাব তার বিবরণ হাদীস শরীফে নেই।

কিংবা বলুন, নামাযের কাজকর্মের মধ্যে কোনটা পরিত্যাগ করলে নামায নষ্ট হয় এবং পুনরায় নামায আদায় করা ফরয বা ওয়াজিব হয় আর কোনটা ছেড়ে দিলে নামায বিনষ্ট হয় না তবে ছওয়াব কমে যায়–এই বিষয়গুলো বিবরণ আকারে হাদীস শরীফে বলা হয়নি। অথচ সচেতন মুসল্লীদের অজানা নয় যে, নামাযের কাজকর্মগুলোর শ্রেণী ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়াও নামাযীর জন্য অপরিহার্য। এ বিষয়গুলোও হাদীস শরীফে রয়েছে, কিন্তু এত সহজ বিবরণ

আকারে নয় যে, হাদীস শরীফের তরজমা পাঠ করলেই সব জানা যাবে। হাদীস শরীফ থেকে এই বিষয়গুলো আহরণ করার জন্য ইজতিহাদের যোগ্যতা এবং ফকীহ ও মুজতাহিদের অর্ন্তদৃষ্টি প্রয়োজন।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের সারকথা এই যে, হাদীস শরীফ অধ্যয়নের পরও আমাদের ফিকহ ও ফুকাহার শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই সমাধানগুলো আমরা তাঁদের কাছেই পাই। যদি হাদীসের কোনো কোনো ভাষ্যগ্রন্থে কিংবা ফিকহুল হাদীসের আলোচনা সম্বলিত হাদীস শরীফের কোনো বিশদ গ্রন্থে এ বিষয়ক কিছু সমাধান পাওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে, এই গ্রন্থের সংকলকগণ তা ফিকহে ইসলামী ও ফকীহদের নিকট থেকেই গ্রহণ করেছেন। এজন্য ফিকহের প্রয়োজন আজও ঠিক তেমনি আছে যেমনি গতকাল ছিল। এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে।

আগামী আলোচনা থেকে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

দশ

নামায প্রসঙ্গে হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ যাদের খোলার অভিজ্ঞতা হয়েছে, অন্তত সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী এবং মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় যারা নামায-প্রসঙ্গ অধ্যয়ন করেছেন, অথবা শুধু যদি শরহু মাআনিল আছারেও (তহাবী শরীফ) নামাযের হাদীসসমূহ পড়ে থাকেন তাহলে তাদের জানতে বাকি থাকেনি যে, অনেক বিষয়েই হাদীস শরীফে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। অথচ হাদীসের উৎস হল ওহী আর ওহীর ইলমে বিরোধ থাকতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষায় স্ববিরোধিতা থাকা একেবারেই অসম্ভব। অতএব প্রকৃত বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

দেখা যায় যে, এক রেওয়ায়েতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার কথা আছে তো অপর রেওয়ায়েতে আরো দুই জায়গায় তা করার কথা এসেছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে আরো অধিক স্থানে করার কথা।

কোথাও 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার কথা আছে, কোথাও আছে জোরে পড়ার কথা।

কোথাও আমীন আস্তে বলার কথা আছে, আবার কোথাও জোরে পড়ার কথা।

কোনো রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়, ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়া চাই অথচ অন্যান্য রেওয়ায়েতে এসেছে কিরাত (ফাতিহা ও সূরা) না পড়ার কথা?

কোনো হাদীসে তাশাহহুদের পাঠ একরকম, অন্য হাদীসে অন্য রকম। তদ্রূপ ছানা, তাসবীহাত, দরূদ ও দুআয়ে কুনূতেরও বিভিন্ন পাঠ রয়েছে। এ ধরনের আরো বহু বিরোধ ও বৈচিত্র্য।

তো প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল নন তারা কখনও কখনও দিশেহারা বোধ করে থাকেন। আর এটাই স্বাভাবিক। তবে বিশেষজ্ঞরা জানেন যে, এখানে বাহ্যত যে বিরোধগুলো দেখা যাচ্ছে তা এজন্য সৃষ্টি হয়নি যে, —নাউযুবিল্লাহ—ওহীর শিক্ষাতেই কোনো বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতা রয়েছে। কিংবা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে স্ববিরোধী নির্দেশনা দিয়েছেন! না, কক্ষনও না। ওই বাহ্যিক বিরোধগুলোর প্রকৃত পরিচয় এই :

১. সুন্নাহর বিভিন্নতা। অর্থাৎ অনেক বিষয়ে একাধিক মাসনূন তরীকা রয়েছে। এই হাদীসে যে পন্থাটা এসেছে সেটাও মাসনূন এবং অন্য হাদীসে যা এসেছে তা-ও মাসনূন। যেমন ছানাতে 'সুবহানাকা ...' পড়াও সুন্নাহ, আবার 'আল্লাহুম্মা ইন্নী ওয়াজজাহতু ...' পড়াও সুন্নাহ।

কুনূতে 'আল্লাহুম্মাহ্দিনী ...' পড়াও সুন্নাহ আবার 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা ...' পড়াও সুন্নাহ।

কওমাতে 'রাব্বানা লাকাল হামদ'ও বলা যায়, 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ'ও বলা যায়, 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ'ও বলা যায়। তদ্রূপ নিম্নোক্ত দুআও পড়া যায়। সবগুলোই সুন্নাহ।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَاقَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَايَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

২. বহু বিরোধ এমন রয়েছে যেখানে দুটো বিষয়ই হাদীস শরীফ কিংবা কোনো শরয়ী দলীলের দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ দুটোরই উৎস সুন্নাহ, কিন্তু বিভিন্ন

আলামতের ভিত্তিতে কোনো ফকীহ একটিকে উত্তম ও অগ্রগণ্য মনে করেন আর অন্যটিকে মনে করেন বৈধ ও অনুমোদিত। আবার অন্য ফকীহ এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

এটাও মূলত 'সুন্নাহর বিভিন্নতা'রই অন্তর্ভুক্ত। রাফয়ে ইয়াদাইন, আমীন ইত্যাদি বিষয়গুলো এই শ্রেণীর।

৩. কিছু দৃষ্টান্ত এমনও রয়েছে যে, প্রথমে একটা বিষয় 'মাসনূন' বা 'মুবাহ' ছিল পরে তা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। এর স্থলে অন্য একটি পদ্ধতি প্রদান করা হয় আর প্রথম পদ্ধতি পরিত্যাগ করা হয় বা সেটা 'মাসনূনে'র পর্যায় থেকে 'মুবাহ' বা 'বৈধতা'র পর্যায়ে নেমে আসে। পরিভাষায় একে নাসিখ-মানসূখ বলে।

ইসলামের প্রথম যুগে নামাযে সালামের জওয়াব দেওয়া যেত। এটা বৈধ ছিল। তখন প্রয়োজনীয় কথা বলারও অবকাশ ছিল। কিন্তু পরে তা মানসূখ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَاشَاءَ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَاتَكَلَّمُوْا فِي الصَّلَاةِ.

(সহীহ বুখারী : তাওহীদ, পরিচ্ছেদ : ৪২; সুনানে আবু দাউদ হাদীস : ৯২০)

তদ্রূপ একটা সময় পর্যন্ত রুকুতে দুই হাত একত্র করে দুই হাটুর মধ্যে রাখা ছিল মাসনূন পদ্ধতি। পরে দুই হাতের আঙুল দ্বারা দুই হাটু ধরা মাসনূন সাব্যস্ত হয়। তবে প্রথম পদ্ধতি নাজায়েয করা হয়নি।

৪. কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে একটি পদ্ধতি হল সুন্নাহ আর অন্যটি করা হয়েছিল ওজরবশত। কিন্তু কেউ কেউ একেও সুন্নাহ মনে করলেন। যেমন শেষ বৈঠকে বসার একটি মাসনূন পদ্ধতি রয়েছে যা কারো অজানা নয়। আরেকটি পদ্ধতি হল যেটা মহিলাদের জন্য মাসনূন। কোনো কোনো বর্ণনায় চারজানু হয়েও বসার কথা এসেছে। কিন্তু প্রাসঙ্গিক সকল হাদীস সামনে রাখলে এবং নামাযের পদ্ধতি-প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি ও ধারা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যায় যে, পুরুষের জন্য ওই প্রসিদ্ধ পদ্ধতিটাই মাসনূন তরীকা। অন্য পদ্ধতিগুলোও কখনো কখনো অনুসরণ করা হয়েছিল ওজরবশত কিংবা শুধু বৈধতা বোঝানোর জন্য।

৫. এমন কিছু উদাহরণও রয়েছে যেখানে মাসনূন তরীকা একটিই, বিভিন্ন হাদীসে যা উল্লেখিত হয়েছে। আর ভিন্ন পদ্ধতি যা কোনো কোনো বর্ণনায়

পাওয়া যায় সেটা সহীহ হাদীস নয়, বর্ণনাকারীর ভ্রান্তি। কিন্তু কোনটা সহীহ হাদীস আর কোনটা বর্ণনাকারীর ভুল এই সিদ্ধান্ত শুধু হাদীসবিশারদ ইমামগণই দিতে পারেন। তাঁরা যদি একমত হয়ে কোনো ফয়সালা প্রদান করেন তবে সেটাই নির্ধারিত। আর যেখানে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়, এবং অবশ্যই তা যুক্তিসংগত মতভেদ, সেখানে প্রাজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কোনো এক মত অবলম্বন করবেন। সাধারণ মানুষ অনুসরণ করবেন কোনো একজনের সিদ্ধান্ত।

এবার চিন্তা করুন : এই বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন করা যে, কোনটা সুন্নাহর বিভিন্নতা আর কোনটা উত্তম-অনুত্তমের পার্থক্য আর কোথায় সুন্নাহ ও ওজরের প্রসঙ্গ—এটা অবশ্যই দলীলের ভিত্তিতেই হতে হবে। কিন্তু এই দলীল, আলামত ও লক্ষণগুলো এত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয় যে, যে কারো পক্ষে তা অনুধাবন করা এবং তার আলোকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। এটা এমন এক ক্ষেত্র যেখানে ইজতিহাদ ও ফিকহী প্রজ্ঞা অপরিহার্য। প্রথম থেকেই এই গুরু দায়িত্ব উম্মাহর ফকীহ ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের উপরই ন্যস্ত ছিল এবং এটা ফিকহে ইসলামীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ। আর যেহেতু এই ক্ষেত্রগুলো ইজতিহাদ-নির্ভর তাই এখানে দ্বিমত সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

৬. অনেক বিষয়ে মতভেদ শুধু এজন্য হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। এখানে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা কোনো একটি ব্যাখ্যাকে শুধু অগ্রগণ্যই বলা যায়, এই ব্যাখ্যাটাই সুনিশ্চিত আর অন্যটা ভুল—এটা বলা যায় না। এ ধরনের ক্ষেত্রেও কিতাব ও সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ ফুকাহায়ে উম্মাহর (আইম্মায়ে মুজতাহিদীন) মাঝে মতভেদ হওয়া অবশ্যম্ভবী।

কোনো কোনো 'নুসূসে শরইয়্যাহ' তে (দলীলের পাঠ, আয়াত হোক বা হাদীস) একাধিক ব্যাখ্যার যে অবকাশ থাকে সেটা কখনও লুগাত বা ভাষাগত কারণে হয়। অর্থাৎ আরবী ভাষাতেই সে শব্দ বা বাক্যের একাধিক অর্থ রয়েছে। কখনও এজন্যও হয় যে, আলোচ্য বিষয়ে এই 'নস' ছাড়াও অন্যান্য দলীল ও 'নস' বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো সামনে রাখা হলে দেখা যায়, প্রথমে ওই নসের যে অর্থ বোঝা যাচ্ছিল তা আর নিশ্চিত থাকছে না। অন্য ব্যাখ্যারও অবকাশ সৃষ্টি হচ্ছে।

এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন লক্ষণ ও আলামতের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কোন ব্যাখ্যাটা অধিক উপযোগী বা অধিক সামঞ্জস্যশীল। বলাবাহুল্য, যখন লক্ষণ

বিভিন্ন হবে তো নসের ব্যাখ্যা নির্ণয়ে মতভেদ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ ধরনের মতভেদের দৃষ্টান্ত নবীযুগেও বিদ্যমান ছিল। এখানে এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ ঘটনাটি উল্লেখ করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গযওয়ায়ে আহযাব (খন্দকের যুদ্ধ)-এর মতো কঠিন গযওয়া থেকে ফিরে আসলেন এবং হাতিয়ার রেখে গোসল করলেন। ইতিমধ্যে হযরত জিব্রীল আ. এসে বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহর কসম! আমরা তো এখনও পর্যন্ত অস্ত্র ছাড়িনি। জলদি চলুন। এটাই আল্লাহর আদেশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন দিকে যাব? জিব্রীল আ. বনু কুরাইযার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওই দিকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে বের হলেন এবং হযরত বিলাল রা.-কে ঘোষণা দিতে বললেন–

مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلَا يُصَلِّيَنَّ الْعَصْرَ إِلَّا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ.

'যে রাসূলুল্লাহর বাধ্য ও অনুগত সে যেন বনু কুরাইযায় যেয়েই আছরের নামায পড়ে।'

ঘোষণা শোনামাত্র সবাই অস্ত্র হাতে রওনা হয়ে গেলেন। অনেকেই সময়মতো পৌঁছে গেলেন। আর কিছু সাহাবী রাস্তায় ছিলেন। এদিকে আছরের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এঁদের মধ্যে মতভেদ হল যে, নামায কোথায় পড়া হবে। কিছু সাহাবী বললেন, আমরা সেখানেই নামায পড়ব যেখানে পড়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন। অন্যরা বললেন, রাসূলুল্লাহর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আমরা নামায কাযা করি। শেষে কিছু সাহাবী পথিমধ্যেই নামায পড়ে রওনা হলেন, অন্যরা বনু কুরাইযায় পৌঁছে নামায পড়লেন। তখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পালন করেছি। অতএব আমাদের কোনো অপরাধ নেই। বর্ণনাকারী বলেন–

فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَتَرَكَتْ طَائِفَةٌ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا.

অর্থাৎ যারা পথিমধ্যে নামায পড়েছেন তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমানের কারণে ছওয়াবের আশায় নামায পড়েছেন আর যারা কাযা করেছেন তারাও রাসূলুল্লাহর আদেশের উপর ঈমান ও ছওয়াবের আশায় কাযা করেছেন।

পরিশেষে এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উপস্থাপিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেই ভর্ৎসনা করলেন না।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস ৪১১৯; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস ১৭৭০; সীরাতে ইবনে হিশাম খ. ৬, পৃ. ২৮২, ২৮৪; দালাইলুন নুবুওয়াহ বায়হাকী খ. ৪, পৃ. ৬-৭; আলমুজামুল কাবীর তবারানী খ. ১৯, পৃ. ৮০)

এই মতভেদ যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের অর্থ নির্ধারণ নিয়ে হয়েছিল এবং প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল নবীজীর আনুগত্য ও আদেশ পালন তাই কোনো দলকেই তিরস্কার করা হয়নি।

ইবনুল কাইয়েম রাহ. "যাদুল মাআদ" গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। বাস্তবে কাদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, যারা নামায কাযা করেননি তাদের সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক। তারা দুই ছওয়াবের অধিকারী। আর অন্যরাও যেহেতু 'নস'-এর বাহ্যিক অর্থ অনুসরণ করেছেন এবং তাদেরও লক্ষ্য ছিল রাসূলুল্লাহর আনুগত্য তাই তারা 'মাজূর' এবং এক ছওয়াবের অধিকারী।

(যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯; হাদয়ুহূ ফিল আমান)

আমি যে বিষয়টি আরজ করতে চেয়েছিলাম তা এই যে, 'শরয়ী নস'-এর অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কখনও কখনও সাহাবা-যুগেও মতভেদ হয়েছে এবং যেহেতু তা যুক্তিসংগত ছিল তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো উপরই আপত্তি করেননি।

আমাদের আলোচনা নামাযের নিয়ম সম্পর্কে। এজন্য এ বিষয়েরই আরেকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَاصَلٰوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

এই হাদীসের শাব্দিক তরজমা হল 'ফাতিহা ছাড়া কোনো নামায নেই।' নামাযের কিরাত-প্রসঙ্গে যদি এটিই একমাত্র হাদীস হত এবং এ বিষয়ে অন্য কোনো হাদীস বা শরীয়তের অন্য কোনো দলীল না থাকত তাহলে একথা বলা ছাড়া উপায় থাকত না যে, নামাযে ইমাম ও মুনফারিদের মতো মুক্তাদীরও ফাতিহা পড়া অপরিহার্য। কিন্তু যখন এই হাদীসের সঙ্গে কুরআন মজীদের এই আয়াতও সামনে থাকবে–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুনবে এবং নিশ্চুপ থাকবে। যাতে তোমদের প্রতি দয়া করা হয়। - সূরা আ'রাফ : ২০৪

এবং ওই হাদীসগুলোও সামনে থাকবে যেগুলোতে বলা হয়েছে—

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قُولُوا: آمِينَ.

এবং যখন (ইমাম) পড়ে তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকবে। আর যখন 'গয়রিল মাগদুবি আলাইহিম' বলবে তখন 'আমীন' বলবে।

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

যার ইমাম রয়েছে তো ইমামের কিরআতই তার কিরআত।

এবং ওইসব হাদীসও থাকবে যেগুলোতে আস্তে কিরাতের নামাযেও ইমামের পিছনে কিরাত পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তখন কি দ্বিধাহীনভাবে বলা যাবে যে, মুকতাদীর জন্যও ফাতিহা পড়া অপরিহার্য? আর এটাই এই হাদীসের বিধান? বরং উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের কারণে বলা হবে যে, প্রথম হাদীস দ্বারা নামাযে ফাতিহা পাঠ জরুরি প্রমাণিত হয়। তবে অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইমামের ফাতিহা পাঠই মুকতাদীর ফাতিহা পাঠ। অতএব সে আলাদা করে ফাতিহা পড়বে না; বরং নিশ্চুপ থাকার ও শ্রবণ করার আদেশ পালন করবে।

সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে প্রতি যুগের বিপুল সংখ্যক ফকীহ উপরোক্ত হাদীসের এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। মুকতাদীর জন্যও ফাতিহা পাঠ অপরিহার্য হওয়াকে তারা উপরোক্ত হাদীসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মনে করেননি। অন্যদিকে অনেক ফকীহর মত এই ছিল যে, আস্তে কিরাতের নামাযে মুকতাদী ফাতিহা পড়বে, জোরে কিরাতের নামাযে পড়বে না। কেউ কেউ মনে করতেন, মুকতাদী জোরে কিরাতের নামাযেও ফাতিহা পড়বে। বলাবাহুল্য যে, এ বিষয়ের সকল দলীল এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় সামনে রাখা হলে এই ব্যাখ্যাগুলোকেও নিশ্চিতভাবে ভুল বলা কঠিন।

কথা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, নামায বা শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ে যেসব ক্ষেত্রে হাদীস শরীফে বাহ্যত বিরোধ দেখা যায় সেখানে ওই বিরোধের ধরন ও তাৎপর্য নির্ণয় করা ছাড়া হাদীসের নির্দেশনার উপর আমল করা মোটেই সম্ভব নয়। এবার বলুন, এই বিষয়ে সমাধান কারা দিতে পারেন?

কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা ফিকহে ইসলামী ও ফুকাহায়ে উম্মতেরই কাজ। এজন্য সর্বযুগেই হাদীসের সাথে ফিকহও দ্বীনের খাদেম হিসাবে বিদ্যমান ছিল, আছে, থাকবে। আর ওয়ারিছে নবীর কাতারে যখন থেকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ছিলেন ঠিক তখন থেকেই ফুকাহায়ে কেরামও ছিলেন।

প্রসঙ্গত, শরীয়তের রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যাদের সঠিক ধারণা নেই তারা মতভেদ শব্দটি শোনামাত্রই ভ্রূকুঞ্চিত করেন এবং কিছুটা যেন বিব্রত হয়ে পড়েন, বিশেষত নামাযের মতো মৌলিক ইবাদতের বিষয়ে মতভেদ, যা ঈমানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় রোকন, তাদের পক্ষে একেবারেই যেন অসহনীয়!

তাদের জানা থাকা উচিত যে, মতভেদমাত্রই পরিত্যাজ্য নয়। কেননা কিছু মতভেদ আছে, যার প্রেরণা দলীলের অনুসরণ। স্বয়ং দলীলই ওই মতভেদের উৎস। আর কিছু মতভেদ আছে যা সৃষ্টি হয় মূর্খতা ও হঠকারিতার কারণে। দলীল সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা দলীলের শাসন মানতে অস্বীকৃতিই এই মতভেদের উৎস। প্রথম মতভেদ শরীয়তে স্বীকৃত আর দ্বিতীয়টা নিন্দিত। বিষয়গত দিক থেকে ঈমানিয়াত ও আকাইদ অর্থাৎ ইসলামের সকল মৌলিক আকীদা এবং শরীয়তের সকল অকাট্য মাসআলা ওই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যেখানে দলীলভিত্তিক কোনো ইখতিলাফ-মতভেদ হতেই পারে না। এজন্য দেখবেন, এসব বিষয়ে আইম্মায়ে দ্বীনের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। এক্ষেত্রে কেউ মতভেদ করলে তা অবশ্যই হঠকারিতা। আর ওই মতভেদকারী হয় মুবতাদি (বিদআতী) কিংবা মুলহিদ (বেদ্বীন)। কিন্তু ফুরূয়ী মাসাইল, এতেও শ্রেণীভেদ রয়েছে, এর ধরনটা ভিন্ন। এখানে দলীলভিত্তিক মতভেদ হতে পারে এবং হয়েছে। শরীয়তে এটা স্বীকৃত এবং শরীয়তই একে বহাল রেখেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং সাহাবা ও তাবেয়ীন-যুগেও এটা ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এই মতভেদের বিষয়ে শরীয়তের বিধান হল তা বিলুপ্ত করার চেষ্টা করা ভুল এবং একে বিবাদ-বিসংবাদের মাধ্যম বানানো অন্যায়। দলীলভিত্তিক মতভেদ স্বীকৃত; বরং নন্দিত, কিন্তু বিবাদ-বিসংবাদ হারাম ও নিষিদ্ধ।

এই শ্রেণীর ফুরূয়ী ইখতিলাফ (শাখাগত বিষয়ে মতভেদ) প্রকৃতপক্ষে গন্তব্যে পৌঁছার একাধিক পথ। সিরাতে মুস্তাকীমেরই বিভিন্ন পথরেখা। এগুলোর কোনোটাকেই প্রত্যাখ্যান করা কিংবা অনুসরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এটা ইলাহী নীতির বিরোধী, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যবান মুবারকে উচ্চারিত হয়েছে–

كِلَاكُمَا حَسَنٌ فَاقْرَءَا.

'দুজনই সঠিক, অতএব পড়তে থাক।' (সহীহ বুখারী হাদীস : ৫০৬২)

তদ্রূপ তার কর্ম দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে–

فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيْقَيْنِ.

অতঃপর কোনো দলকেই তিনি ভর্ৎসনা করলেন না।

এ ধরনের আরো বহু দলীলে যা উল্লেখিত হয়েছে।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, এই মতভেদ বিদ্যমান রাখার তাৎপর্য কী, তাহলে এর সুনিশ্চিত ও বিস্তারিত উত্তর তো আখিরাতেই আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জানা যেতে পারে। কেন তিনি দ্বীনের সকল বিষয় এক পর্যায়ের দলীল

قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ وَقَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ.

-এর মাধ্যমে দিলেন না, অভিন্ন গন্তব্যের জন্য বিভিন্ন পথ কেন নির্দেশ করলেন, সিরাতে মুস্তাকীমে বিচিত্র পথ-রেখার সমাবেশ কেন তিনি ঘটালেন? তিনি কি ইচ্ছা করলে সিরাতে মুস্তাকীমের একটিমাত্র ধারাই জারি করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু এখানে রয়েছে প্রজ্ঞার অতল গভীরতা, যার সবটা পরিমাপ করার আকাঙ্খাই হাস্যকর। তবে যতটুকু তিনি বান্দাদের সামনে প্রকাশ করেছেন তা-ও প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট। যারা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক তারা 'আসবাবুল ইখতিলাফ' ও 'আদাবুল ইখতিলাফ' বিষয়ে বিশদ ও গ্রহণযোগ্য কিতাবপত্র অধ্যয়ন করতে পারেন।

মনে রাখা দরকার, যে মতভেদের ভিত্তি দলীলের উপর নয়; বরং মূর্খতা, হঠকারিতা এবং ধারণা ও সংশয়ের উপর, তা আপাদমস্তক নিন্দিত। দ্বীনের স্বতসিদ্ধ বিষয়াদি এবং অকাট্য ও ইজমায়ী মাসআলাগুলোতে দ্বিমত প্রকাশ এই নিন্দিত মতভেদেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এটা 'মতভেদ' নয়, 'দলীলের বিরোধিতা'। এই বিরোধী ব্যক্তি সিরাতে মুসতাকীম থেকে বিচ্যুত। তার গন্তব্য ও ন্যায়নিষ্ঠ মুমিনের গন্তব্য এক নয়। সে তো এক ভিন্ন লক্ষ্যের অভিযাত্রী, যার পরিচয় হল–

مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

বলাবাহুল্য, সিরাতে মুসতাকীমের অর্ন্তগত বিভিন্ন পথ এবং সিরাতে মুসতাকীম থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন পথের হুকুম এক নয়। প্রথম ক্ষেত্রে পথরেখা বাহ্যত

বিভিন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে তা একই পথের অন্তর্গত। আর লক্ষ্য ও মঞ্জিল যে অভিন্ন তা তো বলাই বাহুল্য। আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে পথও ভিন্ন লক্ষ্যও ভিন্ন। প্রথম ক্ষেত্রে পথগুলো নিরাপদ ও স্বীকৃত আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিপদসঙ্কুল ও পরিত্যাক্ত।

এগার

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, নামাযের পদ্ধতিগত কিছু বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকেই মতভেদ ছিল। এটা খাইরুল কুরূনেও ছিল এবং পরের যুগগুলোতেও তার ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। এই মতভেদের কারণ সম্পর্কেও সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। এই ধরনের মতভেদের ক্ষেত্রে উম্মতের করণীয় কী তা শরীয়তের দলীলের আলোকে ফিকহে ইসলামীতে নির্দেশিত হয়েছে। হাদীস মোতাবেক নামায পড়ার জন্য ওই নিদের্শনা অনুসরণ করার কোনো বিকল্প নেই।

এই মতভেদ সম্পর্কে উম্মাহর যে নীতি খাইরুল কুরূন থেকে অনুসৃত তা সংক্ষেপে এই :

১. যে অঞ্চলে যে সুন্নাহ প্রচলিত সেখানে তা-ই চলতে দেওয়া উচিত। এর উপর আপত্তি করা ভুল। আপত্তি ওই বিষয়ে করা যায়, যা বিদআত বা সুন্নাহর পরিপন্থী। কিন্তু এক সুন্নাহর উপর এজন্য আপত্তি করা যায় না যে, এটা আরেক সুন্নাহর মোতাবেক নয়।

এ প্রসঙ্গে শাহ ইসমাইল শহীদ রহ.-এর ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি একবার রুকূ ইত্যাদিতে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করতে আরম্ভ করেছিলেন। অথচ সে সময় গোটা ভারতবর্ষের সর্বত্র (ক্ষুদ্র কিছু অঞ্চল ব্যতিক্রম ছিল, সেখানে ফিকহে শাফেয়ী অনুযায়ী আমল হত) নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন না করার সুন্নত প্রচলিত ছিল। শাহ ইসমাইল শহীদ রহ.-এর বক্তব্য এই ছিল যে, মৃত সুন্নত জীবিত করার ছওয়াব অনেক বেশি। হাদীস শরীফে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে–

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهٗ أَجْرُ مِأَةِ شَهِيْدٍ

উম্মাহর ফাসাদের মুহূর্তে যে আমার সুন্নাহকে ধারণ করে সে একশত শহীদের মর্যাদা পাবে। তখন তাঁর চাচা হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের দেহলবী রহ.

(শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর পুত্র; তাফসীরে মূযিহুল কুরআন-এর রচয়িতা) তার ধারণাকে সংশোধন করেন। তিনি বলেন, মৃত সুন্নাহকে জীবিত করার ফযীলত যে হাদীসে এসেছে সেখানে বলা হয়েছে যে, উম্মাহর ফাসাদের যুগে যে সুন্নাহকে ধারণ করে তার জন্য এই ফযীলত। বলাবাহুল্য, কোনো বিষয়ে যদি দুটো পদ্ধতি থাকে এবং দুটোই মাসনূন (সুন্নাহ ভিত্তিক) হয় তাহলে এদের কোনো একটিকে 'ফাসাদ' বলা যায় না। সুন্নাহর বিপরীতে শিরক ও বিদআত হল ফাসাদ, কিন্তু দ্বিতীয় সুন্নাহ কখনো ফাসাদ নয়। কেননা দুটোই সুন্নাহ। অতএব রাফয়ে ইয়াদাইন না-করাও যখন সুন্নাহ, তো কোথাও এই সুন্নাহ অনুযায়ী আমল হতে থাকলে, সেখানে রাফয়ে ইয়াদাইনের সুন্নাহ 'জীবিত' করে উপরোক্ত ছওয়াবের আশা করা ভুল। এটা ওই হাদীসের ভুল প্রয়োগ। কেননা এতে পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় সুন্নাহকে 'ফাসাদ' বলা হয়, যা কোনো মতেই সঠিক নয়।

এই ঘটনাটি আমি বিশদ করে বললাম। মূল ঘটনা মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত খ. ১ পৃ. ৫৪০-৫৪১, মালফূয : ১১১২৬ (১০ যিলহজ্জ, ১৩৫০ হিজরীর মজলিস) খ. ৪ পৃ. ৫৩৫, মালফূয : ১০৫৬ (২৩ শাবান, ১৩৫১ হিজরীর মজলিস) এবং মাজালিসে হাকীমুল উম্মত পৃ ৬৭-৬৯ তে উল্লেখিত হয়েছে।

সারকথা এই যে, সালাফে সালেহীন বিদআত থেকে দূরে থাকতেন এবং বিদআতের বিরোধিতা করতেন। আর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতেন এবং সুন্নাহকে জীবিত করতেন। কিন্তু কখনো তাদের নীতি 'ইবতালুস সুন্নাহ বিসসুন্নাহ' বা 'ইবতালুস সুন্নাহ বিল হাদীস' ছিল না। অর্থাৎ তারা এক সুন্নাহকে অন্য সুন্নাহর মোকাবেলায় দাঁড় করাতেন না। তদ্রূপ 'সুন্নাতে মুতাওয়ারাছা' দ্বারা প্রমাণিত আমলের বিপরীতে কোনো রেওয়ায়েত পেশ করে তাকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করতেন না। এক সুন্নতের সমর্থনে অন্য সুন্নাহকে খণ্ডন করা আর একে 'মুর্দা সুন্নত জিন্দা করা' বলে অভিহিত করা তাদের নীতি ছিল না। এটা একটা ভুল রীতি, যা খাইরুল কুরূনের শত শত বছর পরে জন্ম লাভ করেছে।

২. যেসব মাসআলার ভিত্তি হল ইজতিহাদ কিংবা দলীলে নকলী বিদ্যমান থাকলেও তা থেকে বিধান আহরণের জন্য ইজতিহাদের প্রয়োজন হয় সেগুলোকে 'মুজতাহাদ ফীহ' বিষয় বলে। এ ধরনের বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এজন্য যেসব 'মুজতাহাদ ফীহ' বিষয়ে জায়েয-নাজায়েযের মতভেদ হয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছে যে, এই বিষয়গুলো 'নাহি আনিল মুনকার'-এর বিষয় নয়। অর্থাৎ যেভাবে কোনো মুনকার

বা গর্হিত বিষয়ের প্রতিবাদ করা হয় এবং তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখা হয় এই ধরনের মাসআলায় তা করা যাবে না। এক মুজতাহিদ অন্য মুজতাহিদের উপর কিংবা অন্য মুজতাহিদের অনুসারীদের উপর আপত্তি করবেন না। মুজতাহাদ ফীহ মাসাইল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা হতে পারে, মতবিনিময় হতে পারে, কিন্তু একে বিভেদ-বিভক্তির বিষয় বানানো যাবে না। তদ্রূপ এর ভিত্তিতে কাউকে গোমরাহ বলা, ফাসিক বা বিদআতী আখ্যা দেওয়াও বৈধ নয়। সাহাবা-তাবেয়ীন যুগ অর্থাৎ খাইরুল কুরূন থেকেই এই নীতি অনুসৃত হয়েছে এবং এতে কারো কোনো দ্বিমত ছিল না। তো জায়েয-নাজায়েযের বিতর্ক যেসব মাসআলায় তাতেই যদি নীতি এই হয় তাহলে যেখানে শুধু উত্তম-অনুত্তমের প্রশ্ন, তার বিধান কী হবে? বলাবাহুল্য যে, এ ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে বিদ্বেষ ছড়ানো, বিভক্তি সৃষ্টি করা, একে অন্যকে ফাসেক, গোমরাহ, বিদআতী আখ্যা দেওয়া ইত্যাদির কোনো অবকাশ শরীয়তে নেই। তদ্রূপ এ কারণে একজন অন্যজনকে হাদীস বিরোধী বা সুন্নাহ-বিরোধী বলারও কোনো সুযোগ নেই।

স্বয়ং আইম্মায়ে হাদীস এই ইখতিলাফকে 'ইখতিলাফুল মুবাহ' বা 'ইখতিলাফু তা'আদ্দুদিস সুন্নাহ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ এমন কিছু পদ্ধতি সেখানে প্রত্যেক পদ্ধতিই 'মুবাহ' অথবা 'মাসনূন'। তাহলে এখানে গোমরাহ বলা, ফাসিক বলা কিংবা হাদীস-বিরোধিতার অভিযোগ দায়ের করার কী অর্থ?

আজকাল রুকূতে যাওয়ায় সময়, রুকূ থেকে ওঠার সময় এবং তৃতীয় রাকাতের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইন করা নিয়ে, আমীন জোরে বা আস্তে বলা নিয়ে এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয় নিয়ে কোনো কোনো মহলে কত যে ঝগড়া-বিবেদ, চ্যালেঞ্জবাজি হতে থাকে তার হিসাব কে রাখে? অথচ এইসব মাসআলায় যে মতভেদ তা হল সুন্নাহর বিভিন্নতা, সেখানে ঝগড়া-বিবাদের প্রশ্নই অবান্তর।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু 'রাফয়ে ইয়াদাইনকে 'আহাব্বু ইলাইয়া' বলেছেন এবং তার কিছু হিকমতও বয়ান করেছেন। এরপরও লিখেছেন যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রাফয়ে ইয়াদাইন করেছেন, কখনো করেননি। উভয় পদ্ধতিই সুন্নাহ। এবং সাহাবা, তাবেয়ীন ও পরবর্তীদের মধ্যে উভয় পদ্ধতিরই অনুসারী ছিলেন। এটা ওইসব মাসআলার অন্যতম যাতে আহলে মদীনা (মদীনার ফকীহবৃন্দ) ও আহলে কূফা (কূফার ফকীহবৃন্দ)-র মধ্যে মতভেদ হয়েছে। আর প্রত্যেকের

কাছেই রয়েছে শক্তিশালী দলীল। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা খণ্ড :২, পৃ. ১০)

অন্যদিকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর আগের ও পরের অসংখ্য মুহাক্কিক - গবেষক রাফয়ে ইয়াদাইন না করাকে উত্তম বলেছেন। (আমরাও দলীলের বিচারে এ কথাই বলে থাকি) কিন্তু এই পর্যন্তই। একে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ কেউ করেননি। সকলেই শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতো একে 'সুন্নাহর বিভিন্নতা' বলেই মনে করেছেন।

ইবনুল কাইয়েম রহ. (৭৫০ হি.) 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে ফজরের নামাযে কুনূত পড়া প্রসঙ্গে পরিষ্কার লেখেন-

وَهٰذَا مِنَ الْاِخْتِلَافِ الْمُبَاحِ الَّذِىْ لَايُعَنَّفُ فِيْهِ فَاعِلُهٗ وَلَامَنْ تَرَكَهٗ، وَهٰذَا كَرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الصَّلَاةِ وَتَرْكِهٖ، وَكَالْخِلَافِ فِىْ أَنْوَاعِ التَّشَهُّدَاتِ وَأَنْوَاعِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَأَنْوَاعِ النُّسُكِ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ

অর্থাৎ এটা ওইসব মতভেদের অন্তর্ভুক্ত যাতে কোনো পক্ষই নিন্দা ও ভৎর্সনার পাত্র নন। এটা ঠিক তেমনই যেমন নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করা বা না করা, তদ্রূপ আত্তাহিয়্যাতুর বিভিন্ন পাঠ, আযান-ইকামতের বিভিন্ন ধরন, হজ্বের বিভিন্ন প্রকার – ইফরাদ, কিরান, তামাত্তু বিষয়ে মতভেদের মতোই।

শায়েখ ইবনে তাইমিয়া রাহ (৭২৮ হি.) লেখেন, 'এ বিষয়ে আমাদের নীতি - আর এটাই বিশুদ্ধতম নীতি - এই যে, ইবাদতের পদ্ধতি বিষয়ে (যেসব ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে তাতে) যে পদ্ধতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আছর রয়েছে তা মাকরূহ হবে না; বরং তা হবে শরীয়তসম্মত। সালাতুল খওফের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানের দুই নিয়ম : তারজীযুক্ত বা তারজীবিহীন, ইকামতের দুই নিয়ম : বাক্যগুলো দুইবার করে বলা কিংবা একবার করে। তাশাহহুদ, ছানা, আউযু-এর বিভিন্ন পাঠ, কুরআনের বিভিন্ন কিরাআত, এই সবগুলো এই নীতিরই অন্তভুক্ত। এভাবে ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর-সংখ্যা (ছয় তাকবীর বা বারো তাকবীর), জানাযার নামাযের বিভিন্ন নিয়ম, সাহু সিজদার বিভিন্ন নিয়ম, কুনূত পাঠ, রুকূর পরে বা পূর্বে, রাব্বানা লাকাল হামদ 'ওয়া'সহ অথবা 'ওয়া'ছাড়া, এই সবগুলোই শরীয়তসম্মত। কোনো পদ্ধতি কখনো উত্তম হতে পারে কিন্তু অন্যটি মাকরূহ কখনো নয়। (মাজমূউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৪/২৪২-২৪৩ আরো দেখুন : আল-ফাতাওয়াল কুবরা ১/১৪০)

ইবনে তাইমিয়া রাহ 'মাজমূউল ফাতাওয়া'-র বিভিন্ন স্থানে এবং 'ইকতিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম' গ্রন্থে আরো বিস্তারিত ও প্রামাণিক আলোচনা করেছেন। তিনি পরিষ্কার লেখেন, ইখতিলাফে তানাউউ (অর্থাৎ পদ্ধতির বিভিন্নতার ক্ষেত্রসমূহে যে যেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে চায় (এই জন্য যে, তার শহরে এই পদ্ধতিটাই প্রচলিত, কিংবা তার মাশাইখ এই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন অথবা তার দৃষ্টিতে ওই পদ্ধতিটাই উত্তম) সে তা করতে পারে। এখানে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। নিজে যে পন্থা ইচ্ছা অবলম্বন করুক অন্যের অনুসৃত পদ্ধতিকে (যা শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত) প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নেই; বরং এটা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত।

এ বিষয়ে শায়খ ইবনে তাইমিয়ার বিভিন্ন পুস্তিকা ও ফতোয়ার সংকলন রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমীন নামে প্রকাশিত হয়েছে।

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ এর সম্পাদনায় তা বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়। রিসালাটি অবশ্যই পড়ার মতো। রাফয়ে ইয়াদাইন, আমীন ইত্যাদি বিষয়ের মতভেদ যে 'মুবাহ' বা 'সুন্নাহ'র বিভিন্নতা, তা শুধু উপরোক্ত ব্যক্তিদেরই কথা নয়; চার মাযহাবের বড় বড় ফকীহ তা বলেছেন। ইমাম আবু বকর আলজাস্সাস আলহানাফী (৩৭০হি.) আহকামুল কুরআনে (খণ্ড : ১ পৃষ্ঠা : ২০৩-২০৪) এ কথাই লিখেছেন। ইমাম ইবনে আব্দুল বার মালেকী 'আততামহীদ" ও 'আলইসতিযকার" দুই গ্রন্থেই একথা বলেছেন। তিনি রাফয়ে ইয়াদাইন এর আলোচনায় আহমদ ইবনে খালিদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে, 'আমাদের আলিমদের মধ্যে কেউ রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন আর কেউ তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। তবে তারা কেউই অন্যের নিন্দা করতেন না।

فَمَا عَابَ هٰؤُلَاءِ عَلٰى هٰؤُلَاءِ، وَلَا هٰؤُلَاءِ عَلٰى هٰؤُلَاءِ

তিনি তার উস্তাদ আবু উমার আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, আমাদের উস্তাদ আবু ইবরাহীম ইসলাক সকল ওঠা-নামায় হাত তুলতেন; ইবনে আব্দুল বার উস্তাদজীকে বললেন, তাহলে আপনি কেন রাফয়ে ইয়াদাইন করেন না তাহলে আমরাও আপনার অনুসরণে রাফয়ে ইয়াদাইন করতাম। তিনি বললেন, ইবনুল কাসিম ইমাম মালিক রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাফয়ে ইয়াদাইন শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হবে। আমাদের অঞ্চলে এই রেওয়ায়েত মোতাবেকই আমল হয়ে থাকে। আর মুবাহ বিষয়ে

(অর্থাৎ যেখানে দুই পদ্ধতিই বৈধ ও মুবাহ্, যদিও কারো দৃষ্টিতে একটির তুলনায় অন্যটি উত্তম) সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের পথ পরিহার করা আইম্মায়ে সালাফের নীতি ছিল না।

وَمُخَالَفَةُ الْجَمَاعَةِ فِيمَا قَدْ أُبِيحَ لَنَا لَيْسَتْ مِنْ شِيَمِ الْأَئِمَّةِ

(আততামহীদ খণ্ড : ৯ পৃষ্ঠা : ২২৩; আলইস তিযকার খণ্ড : ৪ পৃষ্ঠা : ১০১, ১০২)

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. আততামহীদের শুরুতে ভিন্ন এক প্রসঙ্গে এই মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কর্তব্য হল তাদের পূর্বসূরীদের তরীকা অনুসরণ করা। ভালো কাজের যে পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেছিলেন তাই অনুসরণ করা উচিত, যদিও অন্য কোনো মুবাহ পন্থা অধিক পছন্দনীয় বোধ হয়।

فَكُلُّ قَوْمٍ يَنْبَغِي لَهُمُ امْتِثَالُ طَرِيقِ سَلَفِهِمْ فِيمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْخَيْرِ، وَسُلُوكُ مِنْهَاجِهِمْ فِيمَا احْتَمَلُوهُ عَلَيْهِ مِنَ الْبِرِّ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مُبَاحًا مَرْغُوبًا فِيهِ

(আততামহীদ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০)

এই মনীষীগণ দলীল ভিত্তিক ফুরুয়ী ইখতিলাফ বিশেষত 'ইখতিলাফুল মুবাহ' -এর ক্ষেত্রে যে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন এটা তাদের ব্যক্তিগত মত নয়; বরং তা শরীয়তের দলীল ও ইজমায়ে সালাফের দ্বারা প্রমাণিত। শায়খ ওলিউল্লাহ্ রাহ. ও শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. এর প্রামাণিক আলোচনা করেছেন। তাদের উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে তা দেখা যেতে পারে। এ বিষয়ে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাকৃত "আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসাইলিল ইলমি ওয়াদ দ্বীন" এবং ত্বহা জাবির কৃত "আদাবুল ইখতিলাফ ফিল ইসলাম" অত্যন্ত চমৎকার ও প্রমাণিক গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থের শুরুতে শায়খ উমর উবাইদ হাসানার ভূমিকাটি বিশেষভাবে অধ্যয়নযোগ্য।

আমি পাঠকবৃন্দকে শুধু একটি বিষয়ে চিন্তা করতে বলব। আজকাল উপমহাদেশের অনেক অঞ্চলে এবং অনেক মসজিদে, আল্লাহ্ মাফ করুন, যে হৈ-হাঙ্গামা হচ্ছে, বিশেষ কিছু ফুরুয়ী মাসআলাকে কেন্দ্র করে চ্যালেঞ্জবাজি, লিফলেটবাজি এবং নির্বোধ-পথভ্রষ্ট ইত্যাদি কটুবাক্য ব্যবহারের রীতি যারা আরম্ভ করেছেন তাদের ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত যে, এইসব মতভেদ তো সাহাবা-তাবেয়ীন আমলেও ছিল. কিন্তু তাই বলে নাউযুবিল্লাহ এইসব চ্যালেঞ্জবাজি ও ফের্কাবাজি তো দূরের কথা, নিন্দা সমালোচনাও কখনো হয়নি।

আমাদের এই বন্ধুরা যদি একটু চিন্তা করতেন যে, নামাযের একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা যে একেই নবী-নামায ও হাদীসের নামায বলে আখ্যায়িত করছেন আর অন্য সব পন্থাকে হাদীস-সুন্নাহর বিরোধী সাব্যস্ত করছেন আর তাদের কট্টরপন্থী লোকেরা তো অন্য নামাযকে একেবারে বাতিলই বলে থাকে। তবে কি খোলাফায়ে রাশেদীন, আশরায়ে মুবাশশারা, ও অন্যান্য সাহাবীদের নামাযও সুন্নাহ বিরোধী ছিল? প্রশ্নটি এজন্য আসে যে, আমাদের এই বন্ধুরা নামাযের যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে উপরোক্ত সাহাবীদের কারো নামাযের সঙ্গে মিলে না। তাহলে কি পরোক্ষভাবে তাদের নামাযকেও খেলাফে সুন্নাত বলা হচ্ছে না।

কয়েক বছর আগের ঘটনা তখনও শায়খ আলবানী মরহুমের কিতাব 'ছিফাতুস সালাহ' পুরো নাম-

صِفَةُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّكْبِيْرِ إِلَى التَّسْلِيْمِ كَأَنَّكَ تَرَاهَا

-এর বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয়নি, আমার কাছে একজন জেনারেল শিক্ষিত ভাই এসেছিলেন, যাকে বোঝানো হয়েছিল কিংবা তাদের বোঝানোর দ্বারা তিনি একথা বুঝে নিয়েছিলেন যে, এখানকার অধিকাংশ মুসলমান যে পদ্ধতিতে নামায পড়ে তা হাদীস মোতাবেক হয় না। তিনি যখন আমার কাছে এলেন তো অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 'সুসংবাদ' দিলেন যে, আলবানী মরহুমের কিতাব বাংলায় অনুদিত হয়েছে। শীঘ্রই তা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, এ কিতাব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা আছে কি না? জানা নেই, তিনি মাসআলা জানার জন্য এসেছিলেন না 'হেদায়েত' করার জন্য এসেছিলেন। আমি শুধু এটুকু আরজ করেছিলাম যে, আপনি আপনার শিক্ষকদের কাছ থেকে তিন-চারজন সাহাবীর নাম নিয়ে আসুন যাদের নামায শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলবানী মরহুমের কিতাবে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী ছিল। তিনি ওয়াদা করে গিয়েছিলেন, কিন্তু সাত-আট বছর অতিবাহিত হল আজও তার দেখা পাইনি।

একটু চিন্তা করুন। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযের অন্য কিছু তাকবীরের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদাইন করা যদি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ও অন্য কিছু সাহাবীর আমল হয়ে থাকে তাহলে রফায়ে ইযাদাইন না-করা হল তাঁর পিতা খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আমল। তদ্রূপ চতুর্থ খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) ও প্রবীণ সাহাবীদের

মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সহ সাহাবীদের এক জামাত এই নিয়মেই নামায পড়েছেন। তো এঁদের মধ্যে কার নামাযকে খেলাফে সুন্নত বলবেন?

আমাদের যে বন্ধুরা শুধু রাফয়ে ইয়াদাইনকেই সুন্নত মনে করেন এবং রাফয়ে ইয়াদাইন না করাকে ভিত্তিহীন বা খেলাফে সুন্নত মনে করেন তারা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে বলে থাকেন যে, ইমামের পিছনে জোরে ও আস্তে সব কিরাতের নামাযে মুকতাদীর জন্য ফাতিহা পড়া ফরয, না পড়লে নামায হবে না। কোনো কোনো কট্টর লোক তো এমনও বলে যে, ফাতিহা ছাড়া যেহেতু মুকতাদীর নামায হয় না তো যারা ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়ে না তারা যেন বে-নামাযী। আর বে-নামাযী হল কাফির!! (নাউযুবিল্লাহ)

আমাদের এই বন্ধুরা যদি চিন্তা করতেন যে, যেই আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রাঃ) হাদীস মোতাবেক তারা রফয়ে ইয়াদাইন করে থাকেন তিনিও তো ইমামের পিছনে কুরআন (সেটা ফাতিহা হোক বা ফাতিহার সঙ্গে কিরাত) পড়তেন না। "মুয়াত্তা"য় সহীহ সনদে এসেছে যে, তিনি বলেন–

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ

'যখন তোমাদের কেউ ইমামের পিছনে নামায পড়ে তো ইমামের পড়াই তার জন্য যথেষ্ট। আর যখন একা পড়ে তখন সে যেন কুরআন পড়ে।'

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ নাফে রাহ. তাঁর এই ইরশাদ বর্ণনা করে বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইমামের পিছনে কিরাত পড়তেন না।' (আল-মুয়াত্তা পৃ. ৮৬)

আমাদের ওই বন্ধুদের 'নীতি' অনুযায়ী তো আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এরও নামায হত না। আর যখন তাঁর নামায হত না তাহলে রাফয়ে ইয়াদাইন বিষয়ে কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যাবে কি? কেননা (তাদের কথা অনুযায়ী, আল্লাহ মা'ফ করুন) বেনামাযীর হাদীস কীভাবে গ্রহণ করা যাবে। অথচ শরীয়তের দলীল দ্বারা ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁর হাদীস আবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তাহলে এটা কি প্রমাণ করে না যে, এ ধরনের বিষয়ে কারো নিন্দা-সমালোচনা করা কিংবা গোমরাহ ও ফাসেক আখ্যা দেওয়া নাজায়েয ও অবৈধ?

আমীন জোরে বলা হবে না আস্তে এ নিয়ে আমাদের এই বন্ধুরা ঝগড়া-বিবাদ করে থাকেন। হাদীস ও আছারের গ্রন্থসমূহ তারা যদি সঠিক পন্থায় অধ্যয়ন করতেন তবে জানতে পারতেন যে, সুফিয়ান ছাওরী রহ., যাঁর রেওয়ায়েতকৃত

হাদীসের ভিত্তিতে এঁরা জোরে আমীন বলে থাকেন স্বয়ং তিনিই আমীন আস্তে বলতেন। (আলমুহাল্লা, ইবনে হাযম, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯৫)

যদি বিষয়টা 'সুন্নাহর বিভিন্নতা' না হত কিংবা অন্তত 'মুজতাহাদ ফীহ' না হত তাহলে এই প্রশ্ন কি আসত না যে, যিনি নিজের রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের উপরই আমল করেন না তার রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ জায়েয হবে কি?

এভাবে অন্যান্য বিষয়েও যদি চিন্তা করতে থাকেন তাহলে ইনশাআল্লাহ এই সব ক্ষেত্রে সাহাবা যুগ থেকে চলে আসা মতভেদ আপনাকে বিচলিত করবে না। আর একে বিবাদ বিসংবাদের মাধ্যম বানানোর প্রবণতাও দূর হয়ে যাবে।

আমরা সবাই জানি যে, সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন ইসলামী শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যে সাহাবী যে শহরে অবস্থান করছিলেন তার নিকট থেকেই এই শহরের অধিবাসীরা দ্বীন ও ঈমান, কিতাব ও সুন্নাহ এবং ইবাদতের পদ্ধতি ও জীবন-যাপনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন। যেসব অঞ্চলে ইসলাম সাহাবায়ে কেরামের পরে প্রবেশ করেছে কিংবা ইসলামের ব্যাপক প্রচার সাহাবায়ে কেরামের পরে হয়েছে সেখানকার লোকেরা তাবেয়ীন তাবে তাবেয়ীনের কাছ থেকে এই বিষয়গুলো শিখেছেন। কিংবা ওইসব দায়ী ইলাল্লাহ, মুজাহিদীন ও মুয়াল্লিমীনের কাছ থেকে যাদের মাধ্যমে এই অঞ্চলে ইসলামের প্রচার প্রসার হয়েছে। শরীয়তের অনেক বিধিবিধানের মধ্যে যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের যুগেই মতভেদ হয়েছে, এবং ধারাপরম্পরায় পরবর্তীতেও তা বিদ্যমান ছিল তাই এটাই স্বাভাবিক যে, প্রত্যেক ইসলামী শহরে নামায ইত্যাদির পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিন্ন হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে উপরোক্ত ভিন্নতা বিদ্যমান থাকবে।

উপমহাদেশে যেই দায়ী ইলাল্লাহ, মুজাহিদীন, মুয়াল্লিমীন ও আওলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপক প্রচার হয়েছে তারা ফিকহে হানাফী অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করতেন, ফিকহে হানাফীর সহযোগিতায় কুরআন ও সুন্নাহর বিধিবিধান পালন করতেন। এজন্য এই অঞ্চলে নামাযের ওই পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে যা ইমাম আবু হানীফা ও তার ফকীহ ও মুহাদ্দিস শাগরিদগণ ফিকহের গ্রন্থাদিতে সংকলন করেছেন, যার ভিত্তি হল কুরআন ও সুন্নাহ, এরপর হাদীস ও আছার এবং যার ভিত্তি হল ওই 'আমলে মুতাওয়ারাছ' ব্যাপক কর্মধারা, যা ইরাকে অবস্থানকারী হাজারেরও অধিক সাহাবায়ে কেরামের সূত্রে তাঁদের নিকটে পৌছেছিল।

যেহেতু সালাফের নীতি এই ছিল যে, যেসব মাসআলায় একাধিক পন্থা দলীল দ্বারা প্রমাণিত তাতে যে এলাকায় যে পন্থা প্রচলিত, সে এলাকার জনগণকে ওই পন্থা অনুযায়ীই আমল করতে দেওয়া উচিত। এজন্য উলামায়ে কেরাম এসব অঞ্চলে অন্য কোনো পন্থা প্রচার করার প্রয়োজন বোধ করেননি; কিন্তু কিছু অপরিণামদর্শী মানুষ, দ্বীনের সাধারণ রুচি ও মেযাজের সঙ্গে যাদের পরিচয় ছিল না, রেওয়ায়েতের ইলম ছিল কিন্তু তাফাককুহ ফিদ্দীন পর্যাপ্ত ছিল না, তারা এই সূক্ষ্ম বিষয়টা অনুধাবন করতে পারেননি। তারা এক মাসনূন তরীকাকে অন্য মাসনূন তরীকার দ্বারা, এক মোবাহ তরীকাকে অন্য মোবাহ তরীকার দ্বারা এবং এক মুজতাহাদ ফীহ মতকে অন্য মুজতাবাদ ফীহ মতের দ্বারা খণ্ডন করার মধ্যে ছওয়াব অন্বেষণ করেছেন তদ্রূপ অন্য মতটিকে (যার ভিত্তিও দলীরের উপর) বাতিল বলে দেওয়াকে ছওয়াবের কাজ বলে মনে করেছেন। ফলে বিবাদ-বিসংবাদের সুত্রপাত হয়েছে যা নিশ্চিতভাবে হারাম। তখন ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী এই সুযোগের পূর্ণ 'সদ্ব্যবহার' করেছে, যার বিষফল আজও মুসলমানদেরকে ভুগতে হচ্ছে। অথচ আমরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিনি।

আহা! আমরা যদি এই বিভিন্নতার বিষয়গুলোতে 'ই' (এটাই) -এর পরিবর্তে 'ও' (এটাও) কে অবলম্বন করতে পারতাম! যেখানে রাস্তা শুধু একটি সেখানে তো আমরা 'ই' বলব যেমন 'ইসলামই আমার দ্বীন। ইসলামই হক্ব ও আল্লাহর কাছে মকবুল দ্বীন। 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর পথই সঠিক। কিন্তু যেখানে সুন্নাহর বিভিন্নতা, মুবাহের বিভিন্নতা এবং একাধিক সম্ভাবনার অবকাশযুক্ত মুজতাহাদ ফীহ বিষয়ের প্রশ্ন সেখানে 'ই' বলার কী অর্থ? এখানে তো বলতে হবে 'ও'। অর্থাৎ এটাও সঠিক ওটাও সঠিক। কোনোটাই খেলাফে সুন্নত নয়।

আজকাল বেমক্কা 'ই' ব্যবহারের ব্যাধি অত্যন্ত ব্যাপক হচ্ছে দ্বীনের প্রচার ও দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য নানা অঙ্গনে খিদমতের প্রয়োজন রয়েছে। এক ব্যক্তির পক্ষে সব খিদমত আঞ্জাম দেওয়া কখনো সম্ভব নয়। এজন্য কর্মবন্টনের বিকল্প নেই। এতদসত্ত্বেও দেখা যায় যে, খাদিমে দ্বীনের বিভিন্ন শ্রেণী যারা পরস্পর একে অন্যের সতীর্থ অথচ কমসমঝ্ লোকেরা পরস্পরকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ মনে করে থাকে। আমাদের আকাবির বলতেন, "সতীর্থ হও, প্রতিপক্ষ হয়ো না।" যেখানে সতীর্থতা কাম্য সেখানে যদি প্রতিপক্ষতার নীতি গ্রহণ করা হয় তবে তা বিবাদ ও বিসংবাদের সূত্রপাত ঘটায়।

তেরো

এখান থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হাদীস অনুযায়ী আমল করারও নির্ধারিত পন্থা রয়েছে। এই পন্থার বাইরে গেলে সেটা আর শরীয়ত সম্মত হাদীস অনুসরণ থাকে না। ইত্তেবায়ে সুন্নতেরও মাসনূন পদ্ধতি আছে। ওই পদ্ধতি পরিহার করে সুন্নতের অনুসরণ করতে গেলে তা একটা অসম্পূর্ণ ও সংশোধনযোগ্য বিষয় হয়ে দাড়ায়।

কেউ যদি রাফয়ে ইয়াদাইনের সুন্নত অনুযায়ী আমল করে তবে এতে অসুবিধার কী আছে? শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের লোকেরাও তো এই সুন্নত মোতাবেক আমল করে থাকেন। হারামাইনের অধিকাংশ ইমাম হাম্বলী মাযহাবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তারাও এই সুন্নতের উপর আমল করে থাকেন। কিন্তু তারা তো রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার সুন্নতকেও প্রত্যাখ্যান করেন না। যারা এই সুন্নত অনুযায়ী আমল করেন তাদের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হন না, তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জবাজি, লিফলেটবাজি করেন না। তারা অন্যের নামাযকে বাতিল বলা তো দূরের কথা খেলাফে সুন্নতও বলেন না। তারা হাদীস-অনুসরণের ক্ষেত্রে নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে 'আহ্লুয যিকর' আইম্মায়ে ফিকহের উপর নির্ভর করে থাকেন।

এখানে ওই ঘটনাটা উল্লেখ করা যায়, যা হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর মালফুযাতে রয়েছে। ঘটনার সারসংক্ষেপ এই যে, এক জায়গায় আমীন জোরে বলা নিয়ে হাঙ্গামা হয়ে গেল এবং বিষয়টা মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ল। ঘটনার তদন্তের জন্য যাকে দায়িত্ব দেওয়া হল তিনি তদন্ত শেষে রিপোর্ট লিখলেন যে, "আমীন বিলজাহ্র' অর্থাৎ আমীন জোরে বলা হাদীস শরীফে এসেছে এবং মুসলমানদের এক মাযহাবে তা অনুসরণ করা হয়। তদ্রূপ 'আমীন বিছছির' অর্থাৎ আস্তে আমীন বলা হাদীস শরীফে এসেছে আর মুসলমানের এক মাযহাবে তা অনুসৃত। তৃতীয় আরেকটি হল 'আমীন বিশশার' অর্থাৎ হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য উচ্চ আওয়াজে আমীন পাঠ। এটা উপরোক্ত দুই বিষয় থেকে ভিন্ন। প্রথম দুই প্রকার অনুমোদিত হওয়া উচিত আর তৃতীয়টা নিষিদ্ধ। (মালফুযাতে হাকীমুল উম্মত খণ্ড: ১; কিসত: ২; পৃষ্ঠা: ২৪০-২৪১; ২৬ রমযান, ১৩৫০ হি: খণ্ড: ২; কিসত: ৫; পৃষ্ঠা: ৫০৬, ২৫ শাওয়াল ১৩৫০ হি: প্রকাশনা মাকতাবা দানেশ, দেওবন্দ)

লোকেরা বোঝে না তারা আমীন বিশশার ও 'আমীর বিলজাহ্র' অর্থাৎ মাসনূন তরীকার জোরে আমীন বলা এবং হাঙ্গামার জোরে আমীনের মধ্যে পার্থক্য

করতে পারে না। বলাবাহুল্য যে, আস্তে আমীন বলাকে ভুল বা হাদীস পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে একমাত্র নিজেদেরকে সুন্নতের অনুসারী দাবি করে উচ্চস্বরে আমীন পাঠ করা বস্তুত ওই আমীন বিলজাহ্‌র নয় যা হাদীস শরীফে এসেছে এবং সালাফ যার অনুসরণ করতেন।

চৌদ্দ

ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য করণীয় বিষয় ছিল যারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে নামাযী বানানো এবং অজ্ঞতা বা উদাসীনতার কারণে যারা এমন সব ভুল করেন যার কারণে নামায মাকরূহ বা খেলাফে সুন্নত হয়ে যায় বরং কখনো কখনো ওয়াজিব পর্যন্ত ছুটে যায় এমন লোকদের সংশোধনের চেষ্টা করা। আমাদের পূর্বসূরীরা এদিকেই মনোযোগ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের এই বন্ধুদের চিন্তা ও মনোযোগের সিংহভাগ ব্যয় হয় নামাযীদেরকে পেরেশান করার কাজে। তাদের সকল কর্মকাণ্ড শুধু এমন কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে, যে বিষয়ে এ অঞ্চলের লোকেরাও সুন্নাহরই অনুসারী। যে পন্থায় তারা নামায আদায় করেন তাও শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং নবী-যুগ ও সাহাবা-যুগ থেকে অনুসৃত ও প্রচলিত। তারা এক সুন্নাহকে ভুল সাব্যস্ত করে লোকদেরকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন এবং একে এত বড় ছওয়াবের কাজ মনে করলেন যে, এর স্বার্থে সব ধরনের বিবাদ-বিসংবাদ এবং ফিতনা-ফাসাদকে খুশির সঙ্গে মঞ্জুর করে নিলেন। এদের ডাকে আমাদের যেসব ভাই, সাড়া দিয়ে থাকেন তাদের কর্তব্য ছিল আলিমদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যে, আপনাদের অনুসরণে আমরা যে নামায পড়ছি, কিছু লোক বলে, এটা হাদীস পরিপন্থী, সুন্নাহ পরিপন্থী, তাদের এইসব কথা সঠিক কিনা। অথচ এটা না করে তারা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করে নেন, নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করতে আরম্ভ করেন, আস্তে আমীন বলা ছেড়ে জোরে আমীন বলতে থাকেন। বিষয়টা শুধু এই পর্যন্তই সীমিত থাকলে বলার কিছু ছিল না। কেননা এগুলোও মাসনূন বা মোবাহ তরীকা। কিন্তু তারা পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অদ্ভুত ধ্যান-ধারণা ও কাজকর্মও আরম্ভ করেন। তারা রফয়ে ইয়াদাইন এজন্য আরম্ভ করেননি যে, এটাও মাসনূন বা মোবাহ; বরং এজন্য যে, এটাই সুন্নাহ এবং রফয়ে ইয়াদাইন না করা সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী! এতদিন তারা সুন্নাহ বিরোধী কাজ করে এসেছেন এবং এখন যারা রাফয়ে ইয়াদাইন ছাড়া নামায পড়ছে তারা

সুন্নাহবিরোধী কাজই করে চলেছে! অতএব তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে জিহাদ করা জরুরি! এমনকি তারা এই ধারণাও পোষণ করেন যে, নাউযুবিল্লাহ, এ অঞ্চলের আলিমরা হয়তো কুরআন হাদীসের কোনো জ্ঞান রাখে না কিংবা মাযহাবকে হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে!

বলাবাহুল্য এই কুধারণা তাদেরকে নিন্দা-সমালোচনা এমনকি কটুবাক্য পর্যন্ত ব্যবহার করিয়ে ছাড়ে। ফিকহ ফুকাহা ও আইম্মায়ে দ্বীনের অনুসারীদের সম্পর্কে কটুবাক্য ব্যবহার, গালিগালাজ, এবং গোমরাহ-ফাসিক, এমনকি কাফের পর্যন্ত আখ্যা দেওয়াও গোপন কোনো বিষয় নয়।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইসব ভ্রান্ত ধারণা গ্রহণ করা এবং এই ভুল পথ অবলম্বন করার ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বন্ধুরাই সবচেয়ে অগ্রগামী। হাদীসের দু'চারটে কিতাবের অনুবাদ পড়ে তারা ভাবতে আরম্ভ করেছেন যে, হাদীস ও সুন্নাহর সুপণ্ডিত হয়ে গেছেন। অতএব তাদের মধ্যে গবেষণার যোগ্যতাও এসে গেছে এবং অন্যদেরকে অজ্ঞ ও জাহিল আখ্যা দেওয়ারও অধিকার তারা অর্জন করেছেন। তারা যদি শুধু এটুকুও চিন্তা করতেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে অনুবাদকের উপর নির্ভর করছি। আমার তো এটুকুও বোঝার যোগ্যতা নেই যে, এই অনুবাদটা তিনি সঠিক করেছেন কি ভুল করেছেন। আর যেসব কিতাবের অনুবাদ হয়নি সেসব কিতাবের হাদীস সম্পর্কে আমি কী জানি। যেসব কিতাবের অনুবাদ হয়েছে সেগুলোও কি আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেছি? এক বিষয়ের সকল তথ্য কি সংগ্রহ করেছি? সংগ্রহ করলেও শুধু সেগুলোর তরজমা জানাই কি সঠিক বিষয় অনুধাবন ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট? যেখানে বিভিন্ন ধরনের দলীল রয়েছে সেখানে আমলের আগে কতগুলো পর্যায় অতিক্রম করে আসতে হয়, যা শুধু ইজতিহাদ ও তাফাককুহ-র মাধ্যমেই অতিক্রম করা সম্ভব! ওইসব ক্ষেত্রে ফকীহ ও মুজতাহিদের সহযোগিতা গ্রহণ না করার অর্থই হল, ওই বিষয়গুলো যাচ্ছে তাইভাবে ও নীতিহীনভাবে অতিক্রম করতে আগ্রহী কিংবা নিজের পছন্দের কোনো মৌলবীর তাকলীদ করে ফিকহের ইমাম ও খাইরুল কুরূনের ইমামদের যারা অনুসারী তাদের উপর আপত্তি করতে আগ্রহী।

এই ব্যক্তিদের প্রতি আমার অভিযোগ এই যে, আপনারা এই অসম্পূর্ণ জানার উপর ভিত্তি করে 'সিদ্ধান্ত' দেন কীভাবে? তদ্রূপ 'তাকলীদী ইলম' অর্থাৎ যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনি সম্পূর্ণরূপে অন্যের উপর নির্ভরশীল তার ভিত্তিতে

গবেষকসুলভ, মুজতাহিদসুলভ সিদ্ধান্ত দেন কীভাবে? আপনি এত অসংখ্য উলামা-মাশাইখের বিপরীতে এক নতুন দাওয়াতে এত সহজে সাড়া দিয়ে দিলেন, তাদের প্রতি আপনার এত আস্থা তাহলে আজ পর্যন্ত যাদের কাছ থেকে আপনি দ্বীন শিখেছেন, কিংবা যাদেরকে দেখে নামায শিখেছেন তাদের প্রতি এত বড় মন্দ ধারণা কেন?

তাদের মধ্যে কি এটুকু ঈমানী জাযবাও নেই যতটুকু আপনার মধ্যে আছে, এতটুকুও নবীপ্রেম নেই যতটুকু আপনার হৃদয়ে আছে? আপনি কি কখনো তাদের কাছে নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের দলীল জানার চেষ্টা করছেন, যাকে আপনি ভুল ঘোষণা দিচ্ছেন?

একবার আমার একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আমাকে ফোন করলেন। তিনি মূলত জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ কিন্তু একই সঙ্গে উলামা-মাশাইখের সোহবত-সাহচর্যও লাভ করেছেন। তিনি বললেন, 'অমুক (একজন জেনারেল শিক্ষিত উচ্চ পদস্থ) আসতে চান, কিছু বিষয়ের দলীল দেখার জন্য।' এরপর বললেন, "তিনি যদি 'দলীল শোনার জন্য' বা 'দলীল জানার জন্য' বলতেন তাহলেও একটা কথা ছিল, কিন্তু তিনি বলেছেন, 'দলীল দেখতে চান'!"

দেখুন, যিনি ফোন করেছেন তিনি তো এই দুই বাক্যের সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন কিন্তু যার কথা ফোনে উদ্ধৃত করলেন তার তো এ সম্পর্কে কোনো খবরই নেই। এরপরও সৌভাগ্য যে, 'দলীল দেখতে' চেয়েছেন, এর আগেই যদি কোনো 'সিদ্ধান্ত' দিয়ে দিতেন তাহলেই বা কী করার ছিল?

এই ভাইদের কাছে আমার শেষ কথা এই যে, আপনি যে প্রথম পদ্ধতিটা পরিত্যাগ করেছেন কেন পরিত্যাগ করেছেন? সেটা কি ভুল ছিল? ভুল হওয়ার দলীল কী? কিংবা উভয়টাই সঠিক তাহলে একটা ছেড়ে অন্যটা ধরার কী অর্থ? কিংবা একটি অগ্রগণ্য প্রশ্ন এই যে কীসের ভিত্তিতে আপনি এটা চিহ্নিত করেছেন?

পনেরো

যদি সাধারণ মানুষের কাছে উলামা-মাশায়েখের আমলের বিপরীত কোনো দাওয়াত পৌছে তাহলে তাদের জন্য যা করণীয় তা এই যে, তারা পরিষ্কার বলে দিবেন যে, ভাই আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের নিজেদের পক্ষে গবেষণা ও

পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব নয়। তোমাদের কথা যদি মানতে হয় তাহলে তোমাদের উপর নির্ভর করেই মানতে হবে তাহলে ওলামা-মাশায়েখের কথার উপর নির্ভর করতে অসুবিধা কী? আর যদি এ বিষয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতেই হয় তাহলে তার পদ্ধতি এই :

কেউ যদি আপনাকে বলে, (উদাহরণস্বরূপ) ভাই, তুমি রাফয়ে ইয়াদাইন করছ না এটা হাদীস বিরোধী! তাহলে আদবের সঙ্গে বলুন, সব হাদীসের বিরোধী না রফয়ে ইয়াদাইন না - করারও কোনো হাদীস আছে? তারা বলবে, হ্যাঁ, হাদীস তো কিছু আছে, কিন্তু সব জয়ীফ বা ভিত্তিহীন! আপনি প্রশ্ন করুন, এটা কি আপনার ব্যক্তিগত ধারণা, না হাদীস বিশারদদের ফায়সালা? এরপর সব হাদীসবিশারদদের ফায়সালা না তাদের কারো কারো? একজন ইমামও কি রফয়ে ইয়াদাইন না - করার হাদীসকে 'সহীহ' বলেননি? যদি তার মধ্যে সততা থাকে তাহলে বলতে বাধ্য হবে যে, জ্বী, একাধিক ইমাম ওই হাদীসকেও সহীহ বলেছেন। আপনি বলুন, আমার জন্য এই যথেষ্ট। যখন সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের একটি বিশিষ্ট জামাত রাফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস অনুসরণ করেছেন তো আপনি তার বিশেষ কোনো সনদকে জয়ীফ বললে কী আসে যায়? সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা এবং উম্মাহর উলামা-মাশায়েখের মাঝে স্বীকৃত বিষয়কে শুধ সংশ্লিষ্ট একটি হাদীসের সনদের দুর্বলতা দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ করা কতবড় ভুল!

আর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল, তাকে হিকমতের সঙ্গে কোনো পণ্ডিত আলিমের কাছে নিয়ে যাবেন, যার হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমুহ, এবং ফিকহে মুদাল্লাল ও ফিকহে মুকারানের কিতাবসমূহের উপর দৃষ্টি রয়েছে। ইনসাআল্লাহ্ সকল ভুল ধারণার অবসান ঘটবে এবং কটুকথা, নিন্দা-সমালোচনার ধারাও বন্ধ হয়ে যাবে। সমস্যা এই যে, আমাদের এই বন্ধুরা শুধু-সাধারণ মানুষকেই 'হেদায়েত' করে থাকেন, আলিমদের কাছে যান না। অথচ আলিমদেরকেই তো 'হেদায়েত' করার প্রয়োজন বেশি। তারা হেদায়েত পেলে গোটা জাতির হেদায়েতের সম্ভাবনা!

ষোলো

খতীব, মুদাররিস এবং সাধারণ মানুষ যাদের শরণাপন্ন হয় তাদের খিদমতে আবেদন এই যে, যদিও আম মানুষ ও জেনারেল শিক্ষিত মানুষের পক্ষে দলীল

ও দলীল দ্বারা দাবী প্রমাণের পদ্ধতি বোঝা কঠিন তবুও আপনারা এই প্রশ্ন করবেন না যে, দলীল জানতে চাওয়ার অধিকার তাদের আছে কি না। বরং রাহমাতান বিইবা দিল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করুন এবং তাদের কথাবার্তা, যদিও তা উল্টা-সিধা হোক না কেন, শুনুন, তারা যদি দলীল জানতে চায় তাহলে দু'একটা স্পষ্ট দলীল অন্তত তাদেরকে বলে দিন। এর জন্য আপনাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করতে হবে এবং সকল বিষয়ের সর্বাধিক সহজ ও সবচেয়ে বিশুদ্ধ দলীল সহজভাবে উপস্থাপন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

সতেরো

'সিফাতুস সালাহ'– নামাযের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে লিখিত বই পত্রের সংখ্যা অনেক। কিন্তু কুরআন ও হাদীস এবং সীরাত ও সুন্নাহ থেকে দলীল ও উদ্ধৃতিসহ বিস্তারিতভাবে নামাযের পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে এমন কিতাব বাংলা ভাষায় খুবই কম। দীর্ঘ দিন থেকে ইচ্ছা ছিল, এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র রচনা তৈরি করার এবং এর জন্য আমি কাজও আরম্ভ করেছিলাম কিন্তু আল্লাহর হুকুম, বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে কাজটি বিলম্বিতই হতে থাকল। ইতিমধ্যে স্নেহাস্পদ ভাই মাওলানা সায়ীদ আহমদ ইবনে গিয়াসুদ্দীন লাহোর থেকে 'নামাযে পয়াম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' শায়খ ইলিয়াস ফয়সল মুকীম মদীনা মুনাওয়ারা এর এটি নুসখা আমার জন্য নিয়ে আসেন। আমি সংক্ষিপ্তভাবে কিতাবটির উপর নজর বুলিয়েছি এবং সামগ্রিক বিচারে নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনবোধ্য বলে মনে হয়েছে। এজন্য মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে এর অনুবাদ প্রকাশ করার দরখাস্ত করি। তরজমার খিদমত স্নেহাস্পদ ভাই মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ আঞ্জাম দিয়েছে এবং তা যথারীতি প্রাঞ্জল ও মানসম্পন্ন হয়েছে।

আশা করি পাঠকবৃন্দ এ থেকে অনেক উপকৃত হবেন।

এই কিতাবটির দ্বারা অবশ্য ওই বিশদ কিতাবের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না যার কাঠামো আমার চিন্তায় রয়েছে এবং কয়েকবার যা প্রস্তুত করার ওয়াদা করে ফেলেছি। ইনশাআল্লাহ ওই কিতাবটিও একসময় সবার সামনে এসে যাবে। তবে নামাযের পদ্ধতি সংক্রান্ত মৌলিক মাসআলাগুলোর প্রসিদ্ধ দলীলসমূহ

পাঠকবৃন্দ এই কিতাবেই পেয়ে যাবেন। এর দ্বারা ইনশাআল্লাহ অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হবে এবং বিভিন্ন রটনা ও প্রচারণা থেকে উদ্ভূত দ্বিধা সংশয়ও দূর হয়ে যাবে।

আমি আগেই আরজ করেছি যে, নামাযের অনেক বিষয়ে সুন্নাহর বিভিন্নতা বা মোবাহের বিভিন্নতা রয়েছে। তদ্রূপ কোনো কোনো স্থানে নবী-পদ্ধতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বা নবী-পদ্ধতি বোঝার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে এই কিতাবে সাধারণত ওই পদ্ধতির দলীলসমূহই সংকলন করা হয়েছে যা আমাদের এ অঞ্চলে অনুসৃত।

এটা এজন্য নয় যে, অন্যান্য পদ্ধতি ভুল বা খেলাফে সুন্নাত; বরং এজন্য যে, এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ওই পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন এবং তা হাদীস-সুন্নাহ সম্মত।

এই কিতাবে যে মাসনূন পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়া আরো যেসব পদ্ধতি সাহাবা-যুগ থেকে প্রচলিত তা অস্বীকার করা বা বাতিল সাব্যস্ত করা এই কিতাবের উদ্দেশ্য নয় এবং তা হওয়া উচিতও নয়। কেননা, খণ্ডণ ও অস্বীকার তো দু ধরনের বিষয়ের হতে পারে : ১. সাহাবা-যুগ থেকে স্বীকৃত ও প্রচলিত নিয়মের বাইরে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াদি। যেমন কাতারে দাঁড়ানোর অত্যাশ্চর্য পদ্ধতি, কওমাতে হাত বাঁধা, তাশাহুদে শাহাদত অঙুলি সালাম পর্যন্ত নাড়াতে থাকা, তারাবীহ নামায আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ মনে করা ও বিশ রাকাআতকে খেলাফে সুন্নত মনে করা, দুই জলসা ব্যতীত তিন রাকাআত বিতর নামাযকে মাসনূন মনে করা ইত্যাদি।

২. দ্বিতীয় বিষয় এর চেয়েও মারাত্মক। তা এই যে, নিজের পদ্ধতি ছাড়া অন্যসকল স্বীকৃত ও প্রমাণিত পদ্ধতিকে খেলাফে সুন্নত বলা এবং সেগুলোকে বিদআত ও হাদীস-বিরোধী; বরং বাতিল ও ভিত্তিহীন আখ্যায়িত করা।

বলাবাহুল্য এ ধরনের কাজ যে কেউ করুক তা ভুল এবং শরীয়তের নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মোটকথা, আপত্তি শুধু উপরোক্ত দুই বিষয়েই হতে পারে। কোনো স্বীকৃত ও প্রমাণিত পদ্ধতির উপর আপত্তি হতে পারে না।

মনে রাখতে হবে যে, এই স্বীকৃত পদ্ধতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষয়, যথা 'রফয়ে ইয়াদাইন', কিরাআত খলফাল ইমাম ইত্যাদির প্রসিদ্ধ দলীলসমূহের উপর

গ্রন্থকার স্বরচিত টীকায় কোথাও কোথাও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, যা বাংলা অনুবাদে পরিশিষ্টে নেওয়া হয়েছে।

এই আলোচনা আরো শক্তিশালী হওয়া সম্ভব। তবে আহলে ইলমের কাছে অজানা নয় যে, আলোচনা যতই শক্তিশালী হোক তা হবে ইজতিহাদ-নির্ভর, অতএব অন্য ইজতিহাদের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনার উপরও পর্যালোচনা হতে পারে এবং প্রতি যুগে তা হয়েছেও বটে।

এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য কোনো স্বীকৃত ও অনুসৃত পদ্ধতিকে বাতিল বা ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করা নয় বরং যেক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি রয়েছে তাতে কোনো একটি পদ্ধতির অগ্রগণ্যতা এবং তা অনুসরণের যৌক্তিকতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য।

তবে এই পর্যালোচনাধর্মী আলোচনা সম্পূর্ণ ইলমী ও শাস্ত্রীয় বিষয়, যা আলিম ও তালিবে ইলমের জন্য উপযোগী। একজন সাধারণ পাঠকের জন্য এই সব বিষয়ে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই আর এতে কোনো সুফলও নেই। এই আলোচনাগুলো গ্রন্থের শেষে নিয়ে যাওয়ার এটিও একটি হিকমত বটে।

এই কিতাব অধ্যয়নের সময় পাঠকবৃন্দের অবশ্যই একটি বিষয় মনে রাখা উচিত। তা এই যে, আপনি এই কিতাব দ্বারা আপনার নিজের অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে দলীল জেনে প্রশান্তি অর্জন করুন কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। অবসর সময়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে শরীক হয়ে উদাসীন লোকদেরকে নামাযী বানানোর চেষ্টা করুন এবং দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন লোকদের মধ্যে দ্বীনের আগ্রহ ও চেতনা পয়দা করার চেষ্টা করুন।

কিতাব অধ্যয়নের আগে অনুবাদকের ভুমিকাও পড়ে নিন। তাতে মূল কিতাব ও অনুবাদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবের লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশক সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ খিদমতকে শুধু তাঁর একান্ত অনুগ্রহে কবুল করে নিন এবং এর দ্বারা পূর্ণ ও ব্যাপক সুফল দান করুন। এই নালায়েক বান্দার জন্যও একে নাজাত ও হেদায়েতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন।

هٰذَا وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
০৮-০২-১৪৩০ হিজরী

লেখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে 'নামাযে পয়াম্বর' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম সংস্করণ ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। এ গ্রন্থে নামাযের সুন্নত তরীকা উল্লেখিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, সুন্নত তরীকার ধ্যান-খেয়াল মনে রেখে নামায পড়া হলে তাতে খুশুখুযু সৃষ্টি হবে, যা নামাযের প্রাণ। এছাড়া কিতাবটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর নীতি ও আদর্শ অনুসারীদের এই বিশ্বাস আরো শক্তিশালী করেছে যে, তাদের নামায পুরোপুরি সুন্নত মোতাবেক হয়ে থাকে।

আজকাল এমন এক দলের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যাদের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার সারকথা হচ্ছে, নামায সংক্রান্ত বিশেষ কিছু মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন উত্তপ্ত আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো, যে আলোচনায় শরীয়ত-নির্দেশিত নিয়ম-নীতি, কায়েদা-কানুনের কোনোই তোয়াক্কা করা হবে না। অন্যদিকে তাদের কাছে রয়েছে সুন্নাহর এক অভিনব মাপকাঠি। তা এই যে, যে কাজ তারা করে থাকেন তা হল সুন্নাহ। আর অধিকাংশ মুসলিম যে কাজ করেন তা সুন্নাহ-বিরোধী।

এ দলের অধিকাংশই হচ্ছেন নিতান্ত আম মানুষ, যাদের দ্বীনী ইলম সামান্য। তারা মূলত এ ধারার কোনো ইমাম-খতীব বা ওয়ায়েজের মুকাল্লিদ বা অনুসারী মাত্র।

এদের আরেকটি শ্রেণী রয়েছে যারা প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু ভাসা-ভাসা জ্ঞান রাখেন এবং কোনো লেখক বা ওয়ায়েজের তাকলীদ করে এই ধারণা পোষণ করেন যে, এ চিন্তা-রীতিই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এরপর যারা দায়িত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছেন তারা এ চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধারদের নির্দেশনা ও নীতিমালাকেই শেষকথা মনে করেন। তবে সাধারণ মানুষের সামনে এগুলোকে প্রকাশ করেন হাদীস শরীফের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে। তাদের প্রচার-প্রচারণার সারকথা এই দাড়ায় যে, হাদীস

শরীফের সঙ্গে কেবল তাদেরই সম্পর্ক রয়েছে আর অন্য সব মুসলিম হাদীস মোতাবেক আমল করা থেকে বঞ্চিত।

এইসব বিভ্রান্তিকর প্রচার-প্রচারণা নিরসনের লক্ষ্যেই এ পুস্তক রচিত হয়েছে। এখানে কুরআন-হাদীস ও আছারে সাহাবার আলোকে নামাযের গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল সন্নিবেশিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষের উপর এই কিতাবের ইতিবাচক ও উপকারী প্রভাব পড়েছে এবং তারা তাদের পূর্বের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে সক্ষম হয়েছেন।

বর্তমান সংস্করণে এ মতবাদের কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বের গবেষণা ও সিদ্ধান্তও সন্নিবেশিত হল, যাতে তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাও উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করেন এবং শতধাবিভক্ত উম্মতকে নতুন বিভক্তি থেকে রক্ষা করার ফিকির করেন। আর মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় শামিল হন।

আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ যে, এ সংস্করণ কিছু প্রয়োজনীয় সংযোজনসহ নতুন কিতাবাতের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত অধ্যয়নের পাশাপাশি যদি মসজিদে মসজিদে জামাতের নামাযের পর পুস্তিকাটির হাদীসগুলো সম্মিলিত পাঠের ব্যবস্থা করা যায় তবে অনেক উপকার হবে।

পরিশেষে বন্ধুবর্গের প্রতি, বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় মাওলানা আবদুর রউফ ফারূকী সাহেবের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি এই সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন এবং শ্রদ্ধেয় শাব্বীর ইয়া'কূব সাহেব ও শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ যাহেদ হুসাইন সাহেবের জন্য দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে কিতাবটির ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেন, যার সূচনা তারা রিয়াজুল জান্নাহতে বসে করেছেন।

আল্লাহ তাআলা পুস্তকটি পাঠকের জন্য উপকারী করুন এবং আখেরাতের পাথেয় হিসেবে কবূল করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মদ ইলিয়াস ফয়সল
রিয়াজুল জান্নাহ, মসজিদে নববী,
মদীনাতুল মুনাওয়ারা
১৬ রজব ১৪০৫ হিজরী
শুক্রবার ৭টা ৩৫ মিনিট

কিতাব সম্পর্কে কিছু কথা

প্রয়োজনীয়তা

দীর্ঘদিন যাবৎ উর্দূ ভাষায় এমন একটি কিতাবের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল যাতে নামাযের মাসনূন পদ্ধতি বিষয়ক আয়াত ও হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত থাকবে। যেন এই কিতাবের মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রয়োজনগুলো পূরণ হয়।

১. সাধারণ দ্বীনদার ও বিশিষ্টজনদের মনে যেসব প্রশ্ন-সংশয় উদিত হয় কিংবা তাদের মনে সৃষ্টি করা হয় তা দূর হতে পারে।

২. নামাযের গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল ও দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে সকল নামাযী অবগত হতে পারেন।

৩. নামাযের প্রত্যেক রোকন আদায় করার সময় যেন এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল থাকে যে, পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণেই আমি এভাবে এ রোকন আদায় করছি। বলাবাহুল্য, এতে নামাযে খুশুখুযু বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে।

উপস্থাপনা

সম্পূর্ণরূপে ইলমী উপস্থাপনা অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গে দলীল উল্লেখিত হয়েছে। কিতাবটি সংকলন করতে গিয়ে তাফসীর, হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ের প্রায় একশত কিতাবের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইখতিলাফী মাসাইলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং দলীল-প্রমাণের তুলনামূলক আলোচনা পাদটীকায় সংযোজিত হয়েছে। (মূল আলোচনা সাবলীল রাখার উদ্দেশ্যে অনুবাদে এ বিশ্লেষণমূলক আলোচনাগুলো পরিশিষ্ট আকারে কিতাবের শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। –অনুবাদক) হাদীসের কিতাবের উদ্ধৃতির জন্য খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শিরোনাম (আরবীতে) উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে প্রয়োজনের সময় যেকোনো সংস্করণ থেকে হাদীসটি বের করে নেওয়া পাঠকের জন্য সহজ হয়। (অনূদিত সংস্করণে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরও সংযোজিত হয়েছে।) আরবী ইবারতের ভাবানুবাদ করা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে বিষয়বস্তুর সঙ্গে মূল ও শাখা শিরোনাম সংযোজন করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

পানি বিষয়ক মাসাইলের আলোচনার মধ্য দিয়ে মূল কিতাবের সূচনা। অযু-গোসলের মাসাইল, নামাযের ওয়াক্তের বিবরণ, আযান ও নামাযের গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামায ছাড়াও অন্যান্য ফরযে কিফায়া, মাসনূন ও নফল নামাযের আলোচনা স্থান পেয়েছে। মোটকথা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা হিসেবে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিতাবে উল্লেখিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে একটি কথা

এ কিতাবে কুরআন মজীদের মোট একত্রিশটি আয়াত এবং তিন শ দশটি হাদীস ও আছার উল্লেখিত হয়েছে। এক শ সাতচল্লিশটি হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম কিংবা কোনো একটিতে রয়েছে। আটাশিটি হাদীস কুতুবে সিত্তার অপর চার কিতাব (সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহ) থেকে নেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট পঁচাত্তরটি হাদীস অন্যান্য গ্রহণযোগ্য হাদীস-গ্রন্থ (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সুনানে বায়হাকী ও তহাবী ইত্যাদি) থেকে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অর্ধেকের কিছু কম হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও তা সহীহ হওয়ার প্রতি যত্নের সঙ্গে লক্ষ রাখা হয়েছে; বরং অধিকাংশ হাদীসের সঙ্গেই মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্বীকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর একটি উপকারিতা এই যে, কিতাবটি অধ্যয়নের সময় এতে উল্লেখিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে পাঠকের মন আশ্বস্ত থাকবে। দ্বিতীয়ত ওই ভুল ধারণারও জবাব হবে যা একশ্রেণীর মানুষ হাদীসে নববী সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার করে রেখেছে, যাদের নীতি হল কোনো ধরনের বিচার-বিবেচনা ছাড়াই ওইসব হাদীসকে জয়ীফ বলে দেওয়া যা তাদের কল্পনাপ্রসূত অবস্থানের বিপরীত মনে হয়।

মুহাম্মদ ইলিয়াস ফয়সল
মদীনাতুল মুনাওয়ারা

ভূমিকা

শায়খ মুহাম্মাদ শফীক আসআদ, মদীনা মুনাওয়ারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুসলমানের কর্তব্য

মুসলমানের কর্তব্য হল, 'তাওহীদ' ও 'রিসালাতে'র অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করে হৃদয়ের গভীর থেকে তা গ্রহণ করা এবং ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনার জ্ঞান অর্জন করে তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। মুসলমানের আরও কর্তব্য হল, চারপাশের মানুষকে এই আসমানী জীবন-ব্যবস্থার প্রতি দাওয়াত দেওয়া এবং জীবনের সকল অঙ্গনে একে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এককভাবে ও দলবদ্ধভাবে সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করা।

জীবনের পথ-নির্দেশক নীতি

মুসলমানের জীবন যে মূলনীতির অধীনে পরিচালিত হবে তা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا (النساء : ٥٩)

'হে মুমিনগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর। এটাই উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর।' (সূরা নিসা : ৫৯)

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম রাযী (রহ.) লেখেন, "আলিমগণ বলেছেন যে, 'শরীয়তের ভিত্তি চারটি : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। উপরের আয়াত

থেকে তা প্রমাণিত হয়। কেননা, أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ বলে কুরআন ও সুন্নাহর আনুগত্যকে বোঝানো হয়েছে। وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ থেকে জানা গেল যে, ইজমা শরীয়তের দলীল। আর فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ এ অংশ থেকে কিয়াসের প্রামাণ্যতা বোঝা গেল।[১]

আল্লামা ইবনে খালদুন বলেন–

وَاتَّفَقَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هٰذِهِ هِيَ أُصُولُ الْأَدِلَّةِ وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ إِلَّا أَنَّهُ شُذُوذٌ

আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, শরীয়তের দলীল মৌলিকভাবে এ চারটিই। কেউ কেউ ইজমা ও কিয়াস সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করলেও তা একটি বিচ্ছিন্ন মত ছাড়া আর কিছুই নয়।[২]

গায়রে মুকাল্লিদদের মাঝে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধীপ্রাপ্ত আলিম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী 'ব্যক্তি-তাকলীদ' শিরোনামের অধীনে লেখেন, 'অধিকাংশের মতে দ্বীনের মূলনীতি চারটি : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কুরআন-হাদীস বোঝার জন্য লুগাত, নাহব, সরফ, মাআনী, বয়ান, উসূলে ফিকহ্ ইত্যাদি বিষয়ের শাস্ত্রীয় জ্ঞান অপরিহার্য। এই শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সাহায্যেও যে বিষয়গুলোর সমাধান সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে আহরণ করা সম্ভব হবে না সে বিষয়গুলোতে 'ইজমায়ে উম্মত' অনুসরণীয় হবে। আর 'ইজমা'তেও যে মাসআলার সমাধান মিলবে না তাতে কোনো মুজতাহিদের কিয়াস (উসূলে ফিকহের শর্তাবলি মোতাবেক, যার আলোচনা সামনে আসছে) আমলযোগ্য হবে।'[৩]

নিচে প্রত্যেক দলীল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হল।

১. কুরআন মজীদ

কুরআন হল ওই কিতাব, যা আল্লাহ তাআলা মানবজাতির দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। যারা এই আসমানী কিতাবের নির্দেশনা

১. রাযী, তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ১৪৩–১৪৭।
২. ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, পৃ. ৪০৩, দারুল বয়ান।
৩. ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, আহলে হাদীস কা মাযহাব, পৃ. ৫৪।

গ্রহণ করে এবং ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনে তা অনুসরণ করে তাদেরকে আল্লাহ 'মুত্তাকীন' উপাধীতে ভূষিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

'এটাই ওই কিতাব। এতে কোনো সন্দেহ নেই। (এ কিতাব) মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত।' (সূরা বাকারা : ২)

মুসলিম-জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনে কারীম হল সর্বাধিক অগ্রগণ্য। وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ এবং তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন তার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। (সূরা শূরা : ১০)

২. হাদীস শরীফ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্মকে হাদীস বলা হয়। তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরাম যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপত্তি করেননি তাও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আর এই ব্যাপক অর্থেই হাদীসের সম্পর্ক ওহীর সঙ্গে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

'এবং তিনি নিজ চাহিদা থেকে কোনো কথা বলেন না। এ তো (আল্লাহ) প্রেরিত ওহী।' (সূরা নাজম : ৩-৪)

তাহলে কুরআন ও হাদীস উভয়ই আল্লাহ-প্রেরিত ওহী। তবে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কুরআনের শব্দ ও মর্ম দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, পক্ষান্তরে হাদীসের মর্ম ওহীর মাধ্যমে এলেও তা প্রকাশিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় এবং তাঁর কর্মের মাধ্যমে। এককথায় কুরআন হল প্রকাশ্য ওহী, আর হাদীস অপ্রকাশ্য ওহী।

কুরআন মজীদে কোনো বিষয় বিস্তারিতভাবে এসেছে, কোনো বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে। তদ্রূপ অনেক বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে, আবার অনেক বিষয়ের প্রতি শুধু ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বাস্তব দৃষ্টান্ত হাদীস শরীফে বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

'এবং আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।' (সূরা নাহল : ৪৪)

অন্য আয়াতে হাদীস শরীফের প্রামাণ্যতা এভাবে এসেছে–

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

'এবং রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।' (সূরা হাশর : ৭)

তাহলে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কুরআন ও হাদীস একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই মুসলিমজাতি কুরআন মজীদের মতো হাদীস শরীফকেও শরীয়তের দলীল বলে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসেই রয়েছে মুক্তি ও হিদায়েত। আর এর বিপরীত কোনো মত পোষণ করা হলে তা হবে নিঃসন্দেহে গোমরাহী।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا، كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِيْ

'আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধারণ করলে তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না। আল্লাহ তাআলার কিতাব ও আমার সুন্নাহ।'

(মুস্তাদরাকে হাকিম– হাদীস ৩২৪)

৩. ইজমা

কোনো বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর আলিম ও ফকীহগণ একমত হওয়াকে ইজমা বলে। ইজমার স্থান হল কুরআন ও সুন্নাহর পরে। ইজমা এমন বিষয়ে দলীল হিসেবে গৃহীত হয় যা কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আওতাভুক্ত হলেও তার বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধতি সেখানে বিদ্যমান নেই কিংবা পদ্ধতি উল্লেখিত থাকলেও এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের দলীল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এ দলীলগুলোর মধ্যে নাসিখ-মানসূখ নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তখন উম্মাহর আলিমগণ বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শনের সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। উদাহরণস্বরূপ জানাযার নামাযে তাকবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। জানাযার নামাযে কয় তাকবীর হবে– এ নিয়ে মতভেদ ছিল। হযরত উমর ফারূক (রা.)-এর যুগে চার তাকবীরের উপর সাহাবীদের ইজমা সম্পন্ন হয়েছে।[১]

ইজমার প্রামাণ্যতা

ইজমার প্রামাণ্যতা কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

---

১. ইজমার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। এখানে সংক্ষেপে শুধু বিশেষ একটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (–অনুবাদক)

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا (النساء : ١١٥)

'কারও নিকট হিদায়েতের পথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে তবে আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দিব যেদিকে সে ফিরে যায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা বড় মন্দ আবাস।' (সূরা নিসা : ১১৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ عَلٰى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ (ترمذى)

'আল্লাহ তাআলা কখনো আমার উম্মতকে গোমরাহীর বিষয়ে একত্র করবেন না। আল্লাহর হাত জামাতের উপর রয়েছে। যে দলছুট হয় সে দলছুট হয়ে জাহান্নামে নিপতিত হবে।' (জামে তিরমিযী : ২/৩৯)

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন—

وَلَمْ يَزَلْ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ عَلٰى تَقْدِيْمِ الْكِتَابِ عَلَى السُّنَّةِ، وَالسُّنَّةِ عَلَى الْإِجْمَاعِ، وَجُعِلَ الْإِجْمَاعُ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ

'ইসলামের ইমামগণের সম্মিলিত কর্মপদ্ধতি এই যে, কিতাবুল্লাহকে সুন্নাহর পূর্বে এবং সুন্নাহকে ইজমার পূর্বে স্থান দেওয়া হবে। আর ইজমার স্থান হবে তৃতীয়।'[১]

গায়রে মুকাল্লিদ আলিম মাওলানা ওয়াহীদুযযামান লেখেন,

وَالْإِجْمَاعُ الْقَطْعِيُّ حُجَّةٌ، وَمُنْكِرُهٗ كَافِرٌ.

'অকাট্য ইজমা শরীয়তের দলীল এবং তা অস্বীকারকারী কাফির'।[২]

৪. কিয়াস

দুই বিষয়ে বাহ্যিক বা অর্থগত সামঞ্জস্যবিধানকে কিয়াস বলে। যথা, এমন কোনো নতুন বিষয়ে সমাধানের প্রয়োজন হল যা কুরআন-সুন্নাহতে নেই, তবে

১. ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন খণ্ড ২, পৃ. ২৪৮, মাতাবিউল ইসলাম, মিসর।
২. ওয়াহীদুযযামান, নুযুলুল আবরার খ. ১, পৃ. ৬।

তার মতো অন্য একটি বিষয় ও তার সমাধান কুরআন-সুন্নাহতে রয়েছে। এখন উল্লেখিত বিষয়টির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকার কারণে অনুল্লেখিত বিষয়ের সমাধান সেখান থেকে আহরণ করা হলে একে কিয়াস বলা হবে। একটি দৃষ্টান্ত : কোথাও নতুন ধরনের একটি নেশাদার দ্রব্য উৎপাদিত হল। নতুন আবিষ্কৃত হওয়ায় এর উল্লেখ সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ্য় পাওয়া না গেলেও সেখানে 'খমর' (মদ) হারাম হওয়ার কথা রয়েছে। হারাম হওয়ার কারণ, এটি নেশা সৃষ্টি করে। তাহলে এই নতুন দ্রব্যটিও নেশা সৃষ্টির কারণে হারাম হবে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কিয়াস দ্বারা নতুন বিধান দেওয়া হয় না; বরং কুরআন-সুন্নাহ্য় পূর্ব থেকেই যে বিধান বিদ্যমান রয়েছে তা আলোচ্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয় মাত্র। এজন্য ফকীহগণ বলেছেন, 'কিয়াস বিধানদাতা নয়, বিধান-প্রকাশক।'

আরও বোঝা যাচ্ছে যে, কিয়াস কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়; বরং কুরআন-সুন্নাহর উপরই ভিত্তিশীল।

আরও জানা যাচ্ছে যে, যে মাসাইল কুরআন, সুন্নাহ কিংবা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত তাতে কিয়াস চলে না।

কিয়াসের প্রামাণ্যতা

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে কিয়াসের প্রামাণ্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ

'কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট উপস্থাপিত কর।' (সূরা নিসা : ৫৯)

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম রাযী (রহ.) বলেছেন, 'আয়াতের অর্থ এই যে, কোনো নতুন বিষয়ের মুখোমুখি হলে তার বিধান কুরআন-সুন্নাহ্য় উল্লেখিত অনুরূপ বিষয় থেকে আহরণ করতে হবে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, কিয়াস শরীয়তের একটি দলীল।'[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও কিয়াসের সূত্র বর্ণিত আছে এবং তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম কিয়াস করেছেন। এখানে শুধু একটি করে উদাহরণ পেশ করা হল।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেন, "বনু খাছআম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করল,

---

১. রাযী, তাফসীরে কাবীর, খণ্ড ১০, পৃ. ১৪৬

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, এখন তার সফরের শক্তি নেই, কিন্তু তার উপর হজ্জ ফরজ হয়েছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি তার সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান?' প্রশ্নকারী হাঁ-সূচক জবাব দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বল তো, যদি তোমার পিতা ঋণগ্রস্ত হতেন আর তুমি তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করতে তবে কি তার ঋণ পরিশোধ হত না?' লোকটি বলল, 'জ্বী হাঁ।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জও আদায় করতে পার'।" (সুনানে নাসায়ী : ২/৩)

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ আদায় হওয়াকে ঋণ পরিশোধ হওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায (রা.)কে ইয়ামানের শাসনকর্তারূপে প্রেরণকালে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুয়ায! কোনো বিষয়ে যখন ফয়সালা করতে হবে তখন কীসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে?' হযরত মুয়ায (রা.) উত্তরে বললেন, 'কিতাবুল্লাহর ভিত্তিতে ফয়সালা করব।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি কিতাবুল্লাহতে সমাধান না পাও?' হযরত মুয়ায (রা.) বললেন, 'সুন্নাতে রাসূল দ্বারা ফায়সালা করব।' 'যদি সুন্নাতে রাসূলে না পাও?' 'তাহলে চিন্তা-ভাবনা করে ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফয়সালা করব।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তর ও উত্তরের ধারাবাহিকতায় খুশি হয়ে তার বুকে চাপড় দিলেন এবং বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তার রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন, যাতে তার রাসূল সন্তুষ্ট রয়েছেন।'

(সুনানে আবু দাউদ : ২/৫০৫; জামে তিরমিযী : ১/১৫০)

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন—

اَلصَّحَابَةُ أَوَّلُ مَنْ قَاسُوْا وَاجْتَهَدُوْا، فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مَثَّلُوا الْوَقَائِعَ بِنَظَائِرِهَا، وَشَبَّهُوْهَا بِأَمْثَالِهَا، وَرَدُّوا بَعْضَهَا اِلٰى بَعْضٍ فِيْ اَحْكَامِهَا، وَفَتَحُوْا لِلْعُلَمَاءِ بَابَ الْاِجْتِهَادِ، وَنَهَجُوْا لَهُمْ طَرِيْقَهٗ.

'সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরাম কিয়াস ও ইজতিহাদ করেছেন। তাঁরা সমশ্রেণীর বিষয়গুলোর বিধান অনুরূপ বিষয় থেকে আহরণ করে আলিমদের

জন্য ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তাঁদের কর্মপদ্ধতি থেকে কিয়াসের নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে।'[১]

মোটকথা, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস–এই সবগুলোই হল শরীয়তের স্বীকৃত দলীল। এতদসত্ত্বেও মুতাযিলা, শীয়া ও জাহেরী সম্প্রদায়ের কিছু কিছু মানুষ (এবং জাহেরীদের বর্তমান যুগের অনুসারীরা) কিয়াসকে শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। ইবনে খালদুন (রহ.) মুসলিম উম্মাহর স্বীকৃত মত ও পথ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারী বলে এদের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

---

১. ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, মাতাবিউল ইসলাম, মিসর, খণ্ড ১, পৃ. ২১৭

ইলমে ফিকহের পরিচিতি

শরীয়তের দলীলসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার ইলমে ফিকহের পরিচিতি, ফিকহে হানাফীর উৎস, সংকলনের ইতিহাস এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ইলমী মাকাম সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। কেননা, এসব বিষয়ে একশ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আশা করি, এ আলোচনা থেকে বিভ্রান্তিগুলোর অবসান ঘটবে।

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে শরীয়তের স্বীকৃত দলীল চারটি! কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এই দলীলগুলো থেকে মুসলিম-জীবনের প্রয়োজনীয় মাসাইল আহরণ করে সুবিন্যস্তরূপে সংকলন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গে দলীল উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংকলিত ও সুবিন্যস্ত মাসাইলকেই 'ইলমে ফিকহ' বলা হয়। নিম্নে ফিকহের একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল।

اَلْفِقْهُ عِلْمٌ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

অর্থাৎ 'শরীয়তের দলীলসমূহ (কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস) থেকে মাসাইলের জ্ঞান অর্জন করাকে ইলমে ফিকহ বলে।'

(ফাওয়াতিহুর রাহামূত শরহে মুসাল্লামুছ ছুবূত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০-১১)

'ফিকহ' সম্পর্কে একশ্রেণীর মানুষের এই ধারণা রয়েছে যে, 'ফিকহ' হল কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিষয়। উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়।

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলিম জনাব ওয়াহীদুযযামান (রহ.) ইলমে ফিকহকে সর্বোত্তম ইলম বলে অভিহিত করেছেন। ফিকহ বিষয়ে তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'নুযুলুল আবরার'-এর ভূমিকায় তিনি লেখেন—

وَبَعْدُ فَإِنَّ أَعْلَى الْعُلُوْمِ قَدْرًا وَاَجَلَّهَا عِزًّا وَ فَخْرًا عِلْمُ الْفِقْهِ الْمُسْتَنْبَطُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنَّهٗ عَنْ مَكَائِدِ الشَّيْطٰنِ جُنَّةٌ.

১. ওয়াহীদুযযামান, নুযুলুল আবরার, খণ্ড ১, পৃ. ২

অর্থাৎ, সকল ইলমের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হল ইলমে ফিকহ, যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরিত। কেননা, এই ইলম মানুষকে শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করে।[১]

ফিকহে হানাফী : সংকলন ও নীতিমালা

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও অন্যান্য হানাফী ফকীহ ফিকহ সংকলনে যে নীতিমালা অনুসরণ করেছেন তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে অনুমান করা যায়। স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে যে নীতিমালা উল্লেখিত হয়েছে তা এই–

'মাসআলার সমাধানের জন্য আমি সর্বপ্রথম কিতাবুল্লাহর শরণাপন্ন হই। সেখানে পাওয়া না গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং তাঁর থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহ থেকে গ্রহণ করি, যেগুলো নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এখানেও না পেলে সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হই এবং তাদের সিদ্ধান্তের বাইরে নতুন মত সৃষ্টি করি না। মাসআলার সমাধান এখানেও না পেলে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধানে পৌছে থাকি।'[২]

খলীফা আবু জাফর ইমাম আবু হানীফা (রহ.)কে পত্র লিখলেন—

بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تُقَدِّمُ الْقِيَاسَ عَلٰى الْحَدِيْثِ.

'আমি জানতে পেরেছি, আপনি হাদীসের উপর কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন!'

ইমাম সাহেব উত্তরে লেখেন—

لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّمَا أَعْمَلُ أَوَّلاً بِكِتَابِ اللّٰهِ، ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُوْلِهٖ، ثُمَّ بِأَقْضِيَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، ثُمَّ بِأَقْضِيَةِ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ أَقِيْسُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا اخْتَلَفُوْا.

'আমীরুল মুমিনীন, আপনি যা শুনেছেন তা সঠিক নয়। আমি সর্বপ্রথম কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী আমল করি। অতঃপর সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুযায়ী। অতঃপর খুলাফায়ে রাশেদীনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

---

১. আশ-শা'রানী, আল-মীযান, আল-মাতবাআতুল আযহারিয়্যা, খণ্ড, ১, পৃ. ৬২

২. ইবনু আবদিল বার, আল-ইনতিকা, মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যা, হলব, পৃষ্ঠা ২৬৪–২৬৫

এরপর অন্য সাহাবীদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করি। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একাধিক মত থাকলে ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো একটিকে গ্রহণ করি।'[১]

একই অভিযোগ খণ্ডন করে ইমাম সাহেব অন্যত্র লেখেন—

كَذَبَ وَاللّٰهِ، وَافْتَرٰى عَلَيْنَا مَنْ يَقُوْلُ عَنَّا : إِنَّنَا نُقَدِّمُ الْقِيَاسَ عَلٰى النَّصِّ، وهل يُحْتَاجُ بَعْدَ النَّصِّ إِلٰى قِيَاسٍ؟

'আল্লাহর কসম! যারা বলে যে, আমরা 'নসে'র উপর (কুরআন-সুন্নাহর উপর) কিয়াসকে প্রাধান্য দেই তারা মিথ্যা বলে এবং আমাদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। 'নস' থাকা অবস্থায় কিয়াসের কী প্রয়োজন থাকতে পারে?'[১]

কুরআন-সুন্নাহর সামনে কারো কোনো মত চলতে পারে না– এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন—

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُوْلَ بِرَأْيِهٖ مَعَ كِتَابِ اللّٰهِ، وَلَا مَعَ سُنَّةِ رَسُوْلِهٖ، وَلَا مَعَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهٗ، وَأَمَّا مَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَنَتَخَيَّرُ مِنْ أَقَاوِيْلِهِمْ أَقْرَبَهٗ إِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ أَوْ إِلٰى السُّنَّةِ وَنَجْتَهِدُ، وَمَا جَاوَزَ ذٰلِكَ فَالْاِجْتِهَادُ بِالرَّأْيِ لِمَنْ عَرَفَ الْاِخْتِلَافَ وَقَاسَ.

'কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ অথবা সাহাবায়ে কেরামের ইজমা থাকা অবস্থায় কারো মত প্রদান করার অধিকার নেই। তবে যখন সাহাবায়ে কেরাম থেকেই বিভিন্ন মত বর্ণিত হয় তখন কিতাব ও সুন্নাহর অধিকতর নিকটবর্তী মত নির্ণয়ের জন্য ইজতিহাদ করা যায়। এর পরবর্তী পর্যায়ে (অর্থাৎ তাবেয়ীগণের মধ্যে) মতভেদ পাওয়া গেলে মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করতে পারেন।'[২]

ফিকহে হানাফীর সূত্র[৩]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জন্মস্থান কুফা নগরীতে পনেরো শ' সাহাবী আগমন করেছেন এবং ইলম বিতরণ করেছেন। ফলে কুফা ছিল কুরআন-সুন্নাহর

---

১. প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৬১।

২. ইবনে হাজার হাইতামী, আল-খাইরাতুল হিসান, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা। (পৃষ্ঠা ২৭)

৩. এ বিষয়ে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর একটি বিস্তারিত ও আকর্ষণীয় প্রবন্ধ মাসিক আলকাউসার জুন ও জুলাই ২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক তা সংগ্রহ করতে পারেন। –অনুবাদক

ইলমের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ইবনে সা'দ (রহ.) 'তবাকাত' গ্রন্থে কুফা অধিবাসী প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আলী ইবনে আবী তালিব (রা.), সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা.), আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.), আবু কাতাদা (রা.), আবু মূসা আনসারী (রা.), আবু মূসা আশআরী (রা.), সালমান ফারসী (রা.), বারা ইবনে আযিব (রা.), যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.), ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) প্রমুখ।

এই বিশিষ্ট সাহাবীগণের মাধ্যমে কুফা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে কুরআন-সুন্নাহর ইলম প্রচারিত হয়েছে। বিশেষত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর অবস্থান কুফা নগরীকে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেছিল। এ নগরীর বিশিষ্ট সাত ফকীহ তাঁরই শাগরিদ ছিলেন। এঁদের মধ্যে আলকামা ইবনে কায়েস নাখায়ী (রহ.)-এর অবস্থান ছিল সর্বশীর্ষে। তাঁর পরে ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) এই স্থান অধিকার করেন। তিনি কুফা নগরীর উলামা ও ফকীহগণের কণ্ঠস্বর উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)-এর পরে হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (রহ.) এই স্থান অধিকার করেন। সবশেষে ১৫০ হিজরী সময়কাল পর্যন্ত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ইলম ও ফিকহের এই ধারাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেন।

তৎকালীন ইসলামী বিশ্বে কুরআন-সুন্নাহর ইলমের কেন্দ্ররূপে কুফা নগরীর অবস্থান কীরূপ ছিল তা ইমাম হাকিমের 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থ থেকে অনুমান করা যায়। হাকিম (রহ.) সে গ্রন্থে শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী মনীষীদের আলোচনা করেছেন, যারা জ্ঞান-গরিমায় গোটা মুসলিম বিশ্বে স্বীকৃত ও সমাদৃত ছিলেন। এ পর্যায়ের মনীষীদের আলোচনা করতে গিয়ে হাকিম (রহ.) মদীনা মুনাওয়ারার ৪০ জন, মক্কা মুকাররমার ২১ জন এবং কুফা নগরীর ২০১ জন আলিমের নাম উল্লেখ করেছেন।[১]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ইলমী মাকাম

উপরের আলোচনা থেকে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান-কেন্দ্ররূপে কুফা নগরীর অবস্থান এবং সে নগরীর খ্যাতিমান মনীষীদের সম্পর্কে কিছু ধারণা অর্জিত হয়। এই জ্ঞানকেন্দ্রের অন্যতম প্রদীপ ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আদম (রহ.) বলেন, 'কুফা নগরীর ইলম ইমাম আবু হানীফার আত্মস্থ ছিল। তাঁর বিশেষ মনোযোগ ওইসব হাদীসের দিকে

---

১. মুহাম্মাদ আওয়ামা, আছারুল হাদীসিশ শরীফ, মাতবাআ মুহাম্মাদ হাশিম, পৃ. ৮৭ (নতুন সংস্করণে ১৭৮ পৃ.)

নিবদ্ধ ছিল, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী আমল[১] সংরক্ষিত হয়েছে।[২]

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, "আমি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট থেকে কোনো বিষয়ে শরীয়তের সিদ্ধান্ত জানার পর কুফার অন্যান্য আলিমদের কাছে যেতাম এবং তাঁদের কাছে এ বিষয়ে আর কী কী দলীল রয়েছে তা তালাশ করতাম। আরো কিছু হাদীস পাওয়া গেলে ইমাম ছাহেবের নিকটে আসতাম এবং হাদীসগুলো তাঁর সামনে পেশ করতাম। তিনি তখন সেই হাদীসগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বলতেন, 'এই হাদীসটি শাস্ত্রীয় বিচারে 'সহীহ' নয়, ওই হাদীসটি 'গায়রে মারূফ'। তাই আমি এগুলো উল্লেখ করিনি।' একবার আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই হাদীসগুলো সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান আপনি কীভাবে অর্জন করেছেন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'কুফা নগরীর জ্ঞান-ভাণ্ডার আমার কাছে রক্ষিত আছে'।"[৩]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) শুধু কুফা নগরীর আলিমগণের জ্ঞানই আত্মস্থ করেছেন এমন নয়, তিনি মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার আলিমদের নিকট থেকেও ইলম অর্জন করেছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি জীবনে ৫৫ বার হজ্জ করেছেন।[৪]

তাঁর উস্তাদগণের সংখ্যাধিক্যের তাৎপর্য এখান থেকে বোঝা যায়। আল্লামা সালেহী (রহ.) 'উকূদুল জুমান' কিতাবে এবং ইবনে হাজার হায়তামী (রহ.) 'আলখায়রাতুল হিসান' কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উস্তাদ-সংখ্যা চার হাজার।'[৫]

আলোচনার এই পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে কৃত একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। মন্তব্যটি এই যে, 'ইমাম আবু হানীফা (রহ.) মাত্র সতেরোটি হাদীস জানতেন।' বলাবাহুল্য, এ জাতীয় মন্তব্য মন্তব্যকারীর ভাবমূর্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

---

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় শরীয়তের বিধানাবলি, ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদিতে 'নাসখ' বা রহিতকরণের বিষয়টি চলমান ছিল। শরীয়তের অনেক বিধান ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই যেসব বিষয়ে হাদীস শরীফে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায় সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী আমল কোন হাদীসে সংরক্ষিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করার গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। 'পরবর্তী আমল' বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। –অনুবাদক

২. মুহাম্মাদ আওয়ামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬, ৮৮; নতুন সংস্করণে পৃষ্ঠা ১৭৯

৩. মুহাম্মাদ আওয়ামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮; নতুন সংস্করণে পৃষ্ঠা ১৭৭

৪. মুহাম্মাদ আওয়ামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫, ৮৯; নতুন সংস্করণে পৃষ্ঠা ১৮০

৫. মুহাম্মাদ আওয়ামা, প্রাগুক্ত, নতুন সংস্করণে পৃষ্ঠা ১৭৬; আস সিবায়ী, আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীইল ইসলামী, আল-মাকতাবুল ইসলামী, পৃ. ৪১৩

সামান্য কিছু তথ্য জানা থাকলে এবং স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করলে এ জাতীয় বক্তব্য দ্বারা কারো বিভ্রান্ত হওয়ার কথা নয়। কেউ যদি ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে ইমাম ছাহেবের জীবনী অধ্যয়ন করে তবে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এটি একটি হাস্যকর কথা।

ইমাম ছাহেবের সাহচর্য-ধন্য মনীষীগণ ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ মুসনাদু 'আবী হানীফা' নামে স্বতন্ত্র হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেছেন, যেগুলোতে বিশেষভাবে ইমাম ছাহেবের বর্ণনাকৃত হাদীসগুলো সনদসহ সংকলন করা হয়েছে। এ ধরনের মুসনাদের সংখ্যা বিশেরও অধিক। তন্মধ্যে পনেরোটি মুসনাদ একত্র করে ৬৬৫ হিজরীতে খুওয়ারাযমী (রহ.) 'জামিউল মাসানীদ' নামে একটি বৃহৎ সংকলন প্রস্তুত করেন। সংকলনটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উস্তাদ-সংখ্যা চার হাজার। যদি প্রত্যেক উস্তাদ থেকে একটি করেও হাদীস সংগ্রহ করে থাকেন তবুও তাঁর চার হাজার হাদীস জানা থাকার কথা।

ইমাম ছাহেব একজন মুজতাহিদ ছিলেন– এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম মাত্র সতেরোটি-হাদীস-জানা মানুষকে 'মুজতাহিদ' হিসেবে স্বীকৃতি দিবেন– একথা চিন্তা করাও বাতুলতা।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফিকহ-মজলিস

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি উচ্চাঙ্গের ফিকহ-গবেষণা-বোর্ডকে 'ফিকহ-মজলিস' শিরোনামে উল্লেখ করা হল। এই মজলিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অনেকেই করেছেন। ড. মুস্তফা সিবায়ী (রহ.)-এর 'আসসুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত্ তাশরীইল ইসলামী', আবু যাহরা (রহ.)কৃত 'আবু হানীফা' ও ড. মুস্তফাকৃত 'আলআইম্মাতুল আরবায়া' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে, যার সারকথা এই যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ফিকহ-সংকলনে তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করেননি; বরং চল্লিশজন শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ও মুহাদ্দিসের সমন্বয়ে একটি মজলিস গঠন করেছিলেন, যেখানে এক এক মাসআলার উপর দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা হত। সবশেষে যে সিদ্ধান্ত দলীলের আলোকে স্থির হত তা লিপিবদ্ধ করা হত। কখনো এক মাসআলাতে তিন দিন পর্যন্ত আলোচনা অব্যাহত থাকত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এতটাই সাবধানতা অবলম্বন করা হত যে, মজলিসের একজন সদস্যও অনুপস্থিত থাকলে তাঁর অপেক্ষা করা হত এবং তাঁর মতামত উপস্থাপিত

হওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। সে সময়ের বড় বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ এই ফিকহ-মজলিসের সদস্য ছিলেন।[১]

তাই একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, যে ফিকহ পরিপূর্ণভাবে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের উপর ভিত্তিশীল এবং যা ইসলামের স্বর্ণযুগে যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত হয়েছে এরপর আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন তার স্থায়ীত্ব ও উপযোগিতা প্রশ্নাতীত এবং তা পরবর্তী যুগের লোকদের স্বীকৃতি ও সমর্থনের মুখাপেক্ষী নয়। অতএব কিছু মানুষের অস্বীকৃতি ও বিরোধিতা এর গ্রহণযোগ্যতাকে কিছুমাত্রও হ্রাস করবে না।

১. আবু যাহরা, আবু হানীফা, দারুল ফিকরিল আরাবী, পৃ. ২১৩; আস-সিবায়ী, আস্-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ...., আল-মাকতাবুল ইসলামী পৃ. ৪২৭; ড. মুসতফা, আল-আইম্মাতুল আরবাআ, দারুল কুতুবিল মিসরিয়া, পৃ. ৬৫

ইজতিহাদ ও তাকলীদ

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সংক্ষিপ্তভাবে হলেও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। এখানে ইজতিহাদের সংজ্ঞা, শর্তাবলি এবং তাকলীদের পরিচয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করব। এর সঙ্গে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং যুক্তি-বিবেচনা ও সালাফে সালেহীনের বক্তব্যের আলোকে সাধারণ মানুষের করণীয় এবং সে করণীয় পরিত্যাগের ক্ষতি ও পরিণাম সম্পর্কেও আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

ইজতিহাদের সংজ্ঞা

ইজতিহাদ শব্দটি ج-ه-د এই মূলধাতু থেকে উদগত। আরবী ভাষায় جَهْدٌ বা جُهْدٌ শব্দ শক্তি, চেষ্টা, পরিশ্রম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা যাবীদী (রহ.) বলেন—

اَلْاِجْتِهَادُ بَذْلُ الْوُسْعِ فِيْ طَلَبِ الْأَمْرِ، وَالْمُرَادُ بِهٖ رَدُّ الْقَضِيَّةِ مِنْ طَرِيْقِ الْقِيَاسِ اِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

'ইজতিহাদ বলা হয়, কোনো কিছুর অন্বেষণে সর্বশক্তি ব্যয় করা। পরিভাষায় কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে কোনো মাসআলার সম্পৃক্তি কিয়াসের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে ইজতিহাদ বলে।'[১]

ইজতিহাদের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন–

اَلْاِجْتِهَادُ بَذْلُ الْمُجْتَهِدِ وُسْعَهٗ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ بِاَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ.

'শরীয়তের বিধি-বিধান আহরণ করার জন্য মুজতাহিদের প্রচেষ্টাকে ইজতিহাদ বলে।'[২]

ইজতিহাদের শর্তাবলি

সালাফের সময় থেকে এ পর্যন্ত অনেক আলিম এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লামা আমিদী (রহ.) 'ইহকাম' গ্রন্থে, ইমাম গাযালী

১. আয-যাবীদী, তাজুল আরূস, খণ্ড, ২, পৃ. ৩৩০

২. আল-গাযালী, আল-মুসতাসফা, মাকতাবাতুল জুনদী, মিসর, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭৮

(রহ.) 'আল-মুসতাসফা' গ্রন্থে এবং ইবনে খালদুন (রহ.) 'আল-মুকাদ্দিমা'য় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ইজতিহাদ প্রসঙ্গে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও একশ্রেণীর মানুষ এর কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। অথচ এ শর্তগুলো পূর্ণ করা ছাড়া কারো জন্য ইজতিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অযু হল নামাযের শর্ত। কেউ যদি অযু ছাড়া নামায পড়ে তবে তার নামায হওয়া তো দূরের কথা, এ নামাযই তার ধ্বংসের কারণ হবে। তদ্রূপ যোগ্যতা অর্জন না করে যে লোক ইজতিহাদে লিপ্ত হয় তারও ধ্বংস অনিবার্য।

আল্লামা শাওকানী (রহ.) ইজতিহাদের যে শর্তাদি বর্ণনা করেছেন তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

প্রথম শর্ত : আরবী ভাষায় বুৎপত্তি। নাহব, সরফ, বালাগাত ইত্যাদি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি আরবী ভাষার রীতি ও উপস্থাপনা সম্পর্কেও বুৎপত্তি থাকা জরুরি। কেননা, কুরআন ও সুন্নাহ, যা ইজতিহাদের মূল সূত্র তা আরবী ভাষায়।[১]

দ্বিতীয় শর্ত : উলূমুল কুরআন বিষয়ে পারদর্শিতা। বিশেষত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও তাবেয়ীন থেকে বর্ণিত কুরআন মজীদের তাফসীর, আসবাবে নুযূল ও নাসিখ-মানসূখ সম্পর্কে বুৎপত্তি থাকা অপরিহার্য।[২]

তৃতীয় শর্ত : উলূমুল হাদীস বিষয়ে পারদর্শিতা। উলূমুল হাদীসের পরিভাষা ও ইলমু আসমাইর রিজাল সম্পর্কে অবগতি এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া বিদ্যমান উপকরণাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মাসআলার যত হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব তা পরিপূর্ণভাবে থাকাও ইজতিহাদের জন্য জরুরি।[৩]

চতুর্থ শর্ত : যেসব মাসআলায় আলিমগণের ইজমা রয়েছে তাও জানা থাকা জরুরি।[৪]

ইজতিহাদের জন্য উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হওয়া এজন্য প্রয়োজন যে, কুরআন-সুন্নাহ্য় স্পষ্টভাবে উল্লেখিত মাসাইল ও ইজমা-সম্পন্ন-হওয়া মাসাইলে ইজতিহাদ চলে না। এখন কোন কোন মাসআলা কুরআন-সুন্নাহ্তে

---

১. শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল, পৃ. ২৫১ [আল মাকসিদুস সাদিস ফিল ইজতিহাদ]
২. প্রাগুক্ত পৃ. ২৫০ [আল-মাসসিদুস সাদিস ফিল ইজতিহাদ]
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১
৪. প্রাগুক্ত

স্পষ্টভাবে রয়েছে এবং কোনগুলিতে ইজমা রয়েছে– এটা জানা না থাকলে এ জাতীয় মাসআলাতেও ইজতিহাদ আরম্ভ করার আশঙ্কা থেকে যায়। তদ্রূপ উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদীস বিষয়ে পারদর্শিতা না থাকলে দেখা যাবে যে, কোথাও জয়ীফ হাদীসকে ইজতিহাদের ভিত্তি বানানো হয়েছে, আবার কোথাও মানসূখ বিধান মোতাবেক ফতোয়া দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি।

পঞ্চম শর্ত : ইজতিহাদের নিয়ম-পদ্ধতি অর্থাৎ উসূলে ফিকহ বিষয়ে পারদর্শিতা। ইজতিহাদের সঙ্গে এই শাস্ত্রের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে ইমাম গাযালী ও ইবনে খালদুন এই শাস্ত্রের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

ষষ্ঠ শর্ত : ইজতিহাদ যেহেতু চিন্তা ও মেধার গভীর ব্যবহার, তাই মুজতাহিদকে উচ্চ পর্যায়ের মেধা ও সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির অধিকারী হতে হবে। পাশাপাশি তাকে খোদাভীরু ও পরহেজগার হতে হবে, যাতে তার ইজতিহাদ চাহিদা ও প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রভাবিত না হয়।

তাকলীদের পরিচয়

তাকলীদের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কোনো সংজ্ঞায় শাব্দিক অর্থের প্রাধান্য দেখা যায়, আবার কোনো সংজ্ঞায় সংজ্ঞা-দানকারীর ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাই ওইসব সংজ্ঞার দিকে না গিয়ে তাকলীদকারীরা যে অর্থে ইমামের তাকলীদ করে থাকেন তা-ই উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মূসার সংজ্ঞায় ওই অর্থের প্রতিফলন রয়েছে। তিনি বলেন—

وَالتَّقْلِيدُ أَنْ يَعْتَمِدَ الْإِنْسَانُ فِي فَهْمِ الْحُكْمِ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى نَفْسِهِ.

'শরীয়তের দলীল থেকে বিধান বোঝার ক্ষেত্রে নিজের উপর নির্ভর না করে অন্যের (শরীয়তের পারদর্শী ইমামের) উপর নির্ভর করাকে তাকলীদ বলে।'[১]

এই সংজ্ঞায় তাকলীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া হয়েছে, যার সারকথা এই যে,

১. তাকলীদ অবশ্যই কোনো মুজতাহিদের করতে হবে।

২. প্রকৃতপক্ষে তিনিই হলেন মুজতাহিদ, যিনি শরীয়তের দলীলের আলোকে ইজতিহাদ করেন।

---

১. মুহাম্মদ মূসা, আল-ইজতিহাদ, পৃ. ৫৬৭

৩. মুকাল্লিদ যেহেতু ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী নয় তাই সে মুজতাহিদের গবেষণা ও সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা রাখে।

সাধারণ মানুষের প্রতি তাকলীদের নির্দেশ

যে আলিম নয় তার কর্তব্য হল আলিমকে জিজ্ঞাসা করে আমল করা। তদ্রূপ যে মুজতাহিদ নয় তার কর্তব্য হল মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

'তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।' (সূরা নাহল : ৪৩)

আল্লামা আমিদী (রহ.) 'আল-ইহকাম' গ্রন্থে লেখেন, সকল বালিগ মুসলমান এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অতএব কোনো বিষয়ে কারো জানা না থাকলে তা অন্যের কাছ থেকে জেনে নিবে।[১]

ইবনে আবদুল বার (রহ.) বলেছেন, 'আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, এই আয়াতে সাধারণ মানুষকে (মুজতাহিদ নয় এমন লোকদেরকে) সম্বোধন করা হয়েছে।'[২]

২. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

اَلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ.

(ابو داود، باب المجدور يتيمم)

'যখন তাদের জানা ছিল না তখন কেন জিজ্ঞাসা করল না? নিশ্চয়ই অজ্ঞতার সমাধান হল জিজ্ঞাসা করা।' (সুনানে আবু দাউদ : ১/৪৯)

যারা ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী নয় তারা মুজতাহিদের তাকলীদ করবে– এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে। আল্লামা আমিদী (রহ.) বলেন—

اَلْعَامِّيُّ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ وَإِنْ كَانَ مُحَصِّلًا بَعْضَ الْعُلُومِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الِاجْتِهَادِ، يَلْزَمُهُ اِتِّبَاعُ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَالْأَخْذُ بِفَتْوَاهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ الْأُصُولِيِّيْنَ، وَمَنَعَ ذٰلِكَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّيْنَ.

১. আমিদী, আল-ইহকাম, দারুল ফিকর, খণ্ড ৩, পৃ. ১৯৮

২. ইবনে আবদুল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, খণ্ড ১, পৃ. ১৪০

وَالْمُخْتَارُ إِنَّمَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ وَالْمَعْقُولُ، ... أَمَّا الْإِجْمَاعُ فَهُوَ أَنَّهُ لَمْ تَزَلِ الْعَامَّةُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ قَبْلَ حُدُوْثِ الْمُخَالِفِيْنَ يَسْتَفْتُوْنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَيَتَّبِعُوْنَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ يُبَادِرُوْنَ إِلَى إِجَابَةِ سُؤَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةٍ إِلَى ذِكْرِ الدَّلِيْلِ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ، فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى جَوَازِ اتِّبَاعِ الْعَامِّيِّ لِلْمُجْتَهِدِ مُطْلَقًا.

'সাধারণ মানুষ ও (এমন আলিম) যারা ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী নয়, যদিওবা ইজতিহাদ-সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহের কিছু জ্ঞান তার রয়েছে, তাদের জন্য মুজতাহিদের ফতোয়া অনুসারে চলা অপরিহার্য। মুহাক্কিক উসূলবিদগণ এই মতই পোষণ করেন। বাগদাদের মুতাযিলা সম্প্রদায়ের কিছু লোক এই তাকলীদের বিরোধিতা করত, কিন্তু এ বিষয়ে প্রথমোক্ত মতটিই সঠিক। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মত ও যুক্তি-বিবেচনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত।

'... ইজমায়ে উম্মতের বিবরণ এই যে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের যুগ থেকেই সাধারণ মানুষ মুজতাহিদদেরকে মাসাইল জিজ্ঞাসা করত এবং তাদের নির্দেশনা মতো কাজকর্ম করত। আলিমগণও যথারীতি মাসআলা বয়ান করতেন এবং মাসআলার সঙ্গে দলীল উল্লেখ করা জরুরি মনে করতেন না। এটাই সে সময়ের প্রচলিত রীতি ছিল এবং এ বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি ছিল না।

'মোটকথা, এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা সম্পন্ন হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ নিঃশর্তভাবে মুজতাহিদের অনুসরণ করতে পারবে।'[১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মত

وَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيْرُ الْأُمَّةِ أَنَّ الْاِجْتِهَادَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَالتَّقْلِيْدَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، لَا يُوْجِبُوْنَ الْاِجْتِهَادَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَيُحَرِّمُوْنَ التَّقْلِيْدَ، وَلَا يُوْجِبُوْنَ التَّقْلِيْدَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، وَيُحَرِّمُوْنَ الْاِجْتِهَادَ، وَإِنَّ الْاِجْتِهَادَ جَائِزٌ لِلْقَادِرِ عَلَى الْاِجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيْدَ جَائِزٌ لِلْعَاجِزِ عَنِ الْاِجْتِهَادِ، فَأَمَّا الْقَادِرُ

১. আমিদী, আল-ইহকাম, দারুল ফিকর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫০

عَلَى الاجْتِهَادِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ هٰذَا فِيهِ خِلَافٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ حَيْثُ عَجَزَ عَنِ الاجْتِهَادِ، إِمَّا لِتَكَافُؤِ الأَدِلَّةِ، وَإِمَّا لِضِيقِ الْوَقْتِ عَنِ الاجْتِهَادِ، أَوْ لِعَدَمِ ظُهُورِ دَلِيلٍ لَهُ، فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَجَزَ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ مَا عَجَزَ عَنْهُ، وَانْتَقَلَ إِلَى بَدَلِهِ، وَهُوَ التَّقْلِيدُ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ.

"উম্মাহর আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও তাকলীদ দুটোই বৈধ। সবার জন্য ইজতিহাদ ওয়াজিব, তাকলীদ হারাম কিংবা সবার জন্য তাকলীদ ওয়াজিব, ইজতিহাদ হারাম বিষয়টি এমন নয়। ইজতিহাদের যোগ্যতা যার আছে সে ইজতিহাদ করবে, আর যার যোগ্যতা নেই সে মুজতাহিদের তাকলীদ করবে। এরপর যে প্রশ্ন থেকে যায় তা হল, ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির পক্ষেও তাকলীদ বৈধ কি না। এ বিষয়ে আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। সঠিক মত এই যে, যেসব ক্ষেত্রে মুজতাহিদের পক্ষে ইজতিহাদ করা সম্ভব হয় না সেসব ক্ষেত্রে তার জন্যও তাকলীদ বৈধ। বিভিন্ন কারণে ইজতিহাদ সম্ভব না হতে পারে। যেমন কোনো বিষয়ে উভয় দিকেই সমান মাপের দলীল রয়েছে কিংবা এ মুহূর্তে মুজতাহিদের সময়স্বল্পতা রয়েছে কিংবা এ মাসআলার দলীল তার জানা নেই ইত্যাদি।

"মোটকথা, যেসব ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইজতিহাদে অপারগ সেখানে তার জন্যও ইজতিহাদ ওয়াজিব থাকে না। তখন এর বিকল্প ব্যবস্থা অর্থাৎ তাকলীদ তার জন্যও প্রযোজ্য হয়। এর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, কেউ যদি পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনে অপারগ হয় তবে তার জন্য তায়াম্মুমের বিধান কার্যকর হয়।"[১]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর মত

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) 'ইক্বদুল জীদ' পুস্তিকায় বলেন, "তাক্বলীদ দুই প্রকার। ওয়াজিব তাক্বলীদ ও হারাম তাক্বলীদ। যে কুরআন-সুন্নাহতে পারদর্শী নয় তার পক্ষে যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ থেকে মাসাইল খুঁজে বের করা কিংবা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোনোটাই সম্ভব নয়, তাই তার কর্তব্য হল, কোনো ফকীহর কাছ থেকে কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা জেনে তা অনুসরণ করা। সে নির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহ্‌তে স্পষ্টভাবে থাকতে পারে, কিংবা কুরআন-সুন্নাহ থেকে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আহরিত হতে পারে অথবা কুরআন-সুন্নাহ্‌তে উল্লেখিত সমশ্রেণীর

১. ইবনে তাইমিয়া, ফাতাওয়া, মাকতাবাতুল মাআরিফ, আলমাগরিব, খণ্ড ২০ পৃষ্ঠা ২০৩

মাসআলার উপর কিয়াস করাও হয়ে থাকতে পারে। এটা হল ওয়াজিব তাক্বলীদ। এভাবে আমল করা হলে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেরই অনুসরণ করা হয়। আর এ পদ্ধতি সঠিক হওয়ার বিষয়ে সকল যুগের আলিমগণ একমত।

"এই সঠিক তাকলীদের আলামত এই যে, তাকলীদকারী মুজতাহিদের সুন্নাহ্‌ভিত্তিক সিদ্ধান্তই তাকলীদযোগ্য বলে বিশ্বাস পোষণ করবে। যদি কোথাও কোনো মাসআলা সুন্নাহ্‌র খেলাফ প্রমাণিত হয় তবে সেক্ষেত্রে সুন্নাহ অনুসারেই আমল করবে। মুজতাহিদ ইমামগণও এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

"অন্যদিকে হারাম তাক্বলীদ এই যে, মুজতাহিদকে সকল ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে করা। এমনকি তার কোনো সিদ্ধান্ত হাদীস-পরিপন্থী হলেও তা পরিত্যাগ না করা।"[১]

আল্লামা ওহীদুযযামান (রহ.)-এর মত

তিনিও সাধারণ মানুষের জন্য তাক্বলীদকে অপরিহার্য বলেছেন। হাঁ, যদি কোনো মাসআলায় মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত অনুসরণীয় হবে না। তিনি লেখেন,

"সাধারণ মানুষের জন্য কোনো মুজতাহিদ বা মুফতীর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা অপরিহার্য।"[২]

সারকথা : উপরের আলোচনায় শরীয়তের দলীলসমূহের আলোকে 'ইজতিহাদ' ও 'তাক্বলীদের' হাকীকত উল্লেখিত হয়েছে। আলোচনার মূল কথাগুলো এই–

ক. ইজতিহাদের বৈধতা শরীয়তের দলীলসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত।

খ. ইজতিহাদের অধিকার শুধু তারই রয়েছে যিনি ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী।

গ. কুরআন-সুন্নাহ্‌য় যার পারদর্শিতা নেই তাকে অবশ্যই মুজতাহিদগণের প্রতি আস্থাশীল হয়ে তাকলীদ করতে হবে।

ঘ. ইজতিহাদের জন্য যেসব শাস্ত্র ও যে সকল বিষয়ে বুৎপত্তি থাকা জরুরী সেসব শাস্ত্রের কিছু পড়াশোনা রয়েছে কিন্তু মুজতাহিদের সকল যোগ্যতা নেই এমন ব্যক্তিদের জন্যও মুজতাহিদের তাকলীদ অপরিহার্য।

১. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইক্বদুলজীদ, আল মাতবাআতুস সালাফিয়া, কায়রো, পৃ. ৪২
২. ওহীদুযযামান, নুযুলুল আবরার, খণ্ড ১, পৃ. ৭

ঙ. যদি কোনো ব্যক্তি ইজতিহাদের মাকামে পৌঁছা সত্ত্বেও ইজতিহাদ না তবে তার জন্যও অন্য মুজতাহিদের তাক্বলীদ করা জায়েয।

চ. সাধারণ আলেম এবং সাধারণ মানুষকে মুজতাহিদের তাকলীদ থেকে বিরত রাখা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ।

ছ. মুজতাহিদগণের তাকলীদ এজন্যই করা হয় যে, তাঁরা যে সিদ্ধান্ত দেন তা কুরআন সুন্নাহর আলোকেই দিয়ে থাকেন।

তাকলীদ-বিরোধিতা

ইতোপূর্বে শরীয়তের দলীল-প্রমাণাদির আলোকে দেখানো হয়েছে যে, ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য ইজতিহাদ বৈধ এবং ইজতিহাদের যোগ্যতাহীন লোকদের জন্য মুজতাহিদের তাকলীদ অপরিহার্য। এটি শরীয়তের নির্দেশনা এবং মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ এ বিষয়ে একমত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটি বিশেষ শ্রেণী এ প্রসঙ্গে যা কিছু বলে থাকে তার সারকথা দাড়ায়– যোগ্য-অযোগ্য সকলের জন্যই ইজতিহাদ অপরিহার্য এবং তাকলীদ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ!

তাকলীদ-পরিহারের মর্ম

ইজতিহাদের শর্তাদি পূরণ না করে ইজতিহাদ করা বিনা অযুতে নামায পড়ার মতো। আরও সহজ করে বললে, অযোগ্য লোককে ইজতিহাদের আসন দেওয়ার দৃষ্টান্ত হল অজ্ঞ লোককে শিক্ষামন্ত্রী বানানো কিংবা বকলমকে সুপ্রীম কোর্টের জজ বানানো। বস্তুত এটা একটা অসম্ভব বিষয়। এজন্য দেখা যায়, তাকলীদ পরিহারের মৌখিক দাবিদাররা প্রত্যেকেই তাকলীদকারী, তবে সে তাকলীদ কোনো মুজতাহিদ ইমামের নয়, লা-মাযহাবী শ্রেণীভুক্ত সাধারণ কোনো আলেমের কিংবা কোনো মসজিদের ইমামের।

তাহলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং উপরোক্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শুধু এটুকু পার্থক্য থাকে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর পর্যায়ের মুজতাহিদদের তাকলীদ করেন, যারা ছিলেন ইসলামের সোনালী যুগের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব এবং কুরআন-সুন্নাহ্য় যাদের পারদর্শিতা ও ইজতিহাদের যোগ্যতা সর্বজনস্বীকৃত। অন্যদিকে শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা এমন কিছু লোকের তাকলীদ করে, যাদের মধ্যে ইজতিহাদের শর্তাবলী অনুপস্থিত। এই মতবাদের এটি একটি মৌলিক ভুল যে, ইজতিহাদের যোগ্যতাহীন সাধারণ আলেম কিংবা মসজিদের ইমাম খতীবরা 'ইজতিহাদ' করে থাকে আর অন্যরা তাদের 'তাকলীদ' করে। বলাবাহুল্য, না এই ইজতিহাদ শুদ্ধ, না তাকলীদ শুদ্ধ।

এরূপ ইজতিহাদ ও তাকলীদ সম্পর্কেই সাইয়্যেদ মুসা বলেন–

وَأَمَّا اعْتِمَادُ الشَّخْصِ عَلَى نَفْسِهِ، وَفَهْمِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِلْاِجْتِهَادِ، كَمَا هُوَ دَأْبُ بَعْضِ النَّاسِ، فَأَخْذٌ بِالتَّشَهِّي، وَاعْتِمَادٌ عَلَى الْهَوَى، وَلَيْسَ بِتَقْلِيدٍ، وَلَا اجْتِهَادٍ.

"ইজতিহাদের যোগ্যতা না-থাকা সত্ত্বেও নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির উপর নির্ভর করা, যা আজকাল একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেখা যায়— এটা প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তির অনুসরণ। এটা না শুদ্ধ তাকলীদ আর না শুদ্ধ ইজতিহাদ।"[১]

তাকলীদ পরিহারের পরিণতি

যখনই মুসলিম উম্মাহর কোনো শ্রেণী কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনাকে অবলম্বন করেছে তখন তারা শুধু বিভিন্ন ফিতনাই জন্ম দিয়েছে। যুক্তি-তর্কে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের সীমাতিরিক্ত আস্থা যে ফিতনার জন্ম দিয়েছিল তা ইসলামী ইতিহাসের সচেতন পাঠকের কাছে অস্পষ্ট নয়। একইভাবে 'লা-মাযহাবী' সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা থেকে এই উপমহাদেশে কী কী সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে তা খোদ এই সম্প্রদায়ের কর্ণধারগণও অনুভব করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে তা ব্যক্তও করেছেন। এখানে তাদের কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত হল।

১. মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বিটালবী (রহ.)-এর পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা

তিনি বলেন, 'পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যারা ইলম না-থাকা সত্ত্বেও মুজতাহিদ বনে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে তাকলীদ পরিহার করে তারা পরিশেষে ইসলামকেই বিদায়-সম্ভাষণ জানায়। মুরতাদ বা ফাসেক হওয়ার বহু কারণ পৃথিবীতে রয়েছে, কিন্তু দ্বীনদার মানুষের বেদ্বীন হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল, ইলম না-থাকা সত্ত্বেও তাকলীদ পরিহার করা। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের যে সব ইলমহীন বা স্বল্প ইলমের অধিকারী লোক তাকলীদ পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেয়, তাদের উচিত নিজেদের শেষ পরিণাম সম্পর্কে ভীত হওয়া। এই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকেরা দিন দিন মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে।'[২]

২. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (রহ.)-এর অনুভূতি

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব অত্যন্ত কঠিন ভাষায় তার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তার পুরো বক্তব্য উদ্ধৃত করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু একটি

১. সাইয়্যেদ মুসা, আল-ইজতিহাদ, পৃ. ৫৬৮, ৫৭১

২. মুহাম্মাদ হুসাইন বিটালবী, রিসালা ইশাআতুস সুন্নাহ, খণ্ড ১১, সংখ্যা ২, ১৯৮৮ ই.

বিশেষ প্রয়োজনে তা উদ্ধৃত করতে হল। নওয়াব সাহেব লেখেন, "ইমাম গাযালী (রহ.) একবার যায়েদ ইবনে আহমদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে এই হাদীসটি শুনতে পান–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

অর্থাৎ 'পূর্ণাঙ্গ মুসলিমের নিদর্শন হল অহেতুক বিষয়াদি পরিহার করা।'

"হাদীসটি শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'আপাতত এই হাদীসটিই আমার জন্য যথেষ্ট। এ অনুযায়ী আমল করে তারপর আরো হাদীস শুনব।"

"এটা ছিল সে সময়ের মনীষীদের অবস্থা, কিন্তু বর্তমান সময়ের মূর্খ লোকগুলোর হাদীস-চর্চার সারকথাই হল– মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, তার মধ্য থেকে ইবাদত-সংক্রান্ত কিছু হাদীস নির্বাচন করা আর দৈনন্দিন জীবনের অন্যসব বিষয়কে একদম পরিত্যাগ করা।

"আর তাদের হাদীস অনুসরণের অর্থ হল ইমামগণের মধ্যে মতভেদপূর্ণ সেই মাসআলাগুলোকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা উসকে দেওয়া। বলাবাহুল্য যে, এসব লোক আহলে হাদীসের প্রকৃত পথ থেকে বিচ্যুত। লেন-দেন বিষয়ক হাদীসসমূহের কিছুমাত্র ধারণাও এদের নেই। তাদের জ্ঞান-গরিমার অবস্থা এই যে, হাদীসশাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী একটি মাসআলাও হাদীস থেকে বের করতে সক্ষম নয়। ফলে হাদীস অনুযায়ী চলার তাওফীক তাদের নসীব হয় না।

আর হবেই বা কীভাবে। এরা তো শয়তানের কুমন্ত্রণা ও চক্রান্তের কারণে হাদীস অনুযায়ী চলার পরিবর্তে শুধু (আহলে হাদীস হওয়ার) মৌখিক দাবিতেই ক্ষান্ত থাকে। তাদের ধারণায় প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন এটুকুই। এরা যেন মুসলিম জাতির পশ্চাৎপদ দলসমূহের সঙ্গে পেছনেই থাকতে আগ্রহী। আমি বহুবার এদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি। এদের ছোট-বড় সবারই এক অবস্থা। তাদের কাউকেই আমি দেখিনি, যে ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমদের পথ অনুসরণ করতে, কিংবা পুণ্যবান লোকদের অনুগামী হতে আগ্রহী। বরং তাদেরকে দেখেছি দুনিয়ার ধন-সম্পদ সংগ্রহের পিছনে মগ্ন থাকতে এবং পদ-পদবীর জন্য লোভাতুর হতে।

"হালাল-হারামের কোনো ভেদাভেদ এদের মধ্যে নেই। ইসলামের মিষ্টতা থেকে হৃদয় এদের শূন্য। স্বল্পবুদ্ধি ও অবাধ্যচারী মানুষের মতো এরাও মুসলিম উম্মাহর সমস্যা ও সম্ভাবনার ব্যাপারে অতিশয় নির্লিপ্ত।

"আমি তাদের সম্পর্কে বড় আশায় বুক বেঁধেছিলাম, কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখার পর এটাই প্রকাশিত হল যে, এদের মধ্যে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা নেই। বলাবাহুল্য যে, যে সম্প্রদায়ের দাবি ও কর্ম সম্পূর্ণরূপে বিপরীতমুখী তারা কখনো সফলতা অর্জন করতে পারে না। এরা জগতের সর্বোত্তম মানুষের বাণী

উদ্ধৃত করে কিন্তু নিজেরা হল জগতের সর্বনিকৃষ্ট প্রাণী। বলার সময় সঠিক মাসআলা বলে কিন্তু কাজের বেলায় তার কোনো পরোয়া করে না।

عَجِبْتُ مِنْ شَيْخِي وَمِنْ زُهْدِهِ - وَمِنْ ذِكْرِ النَّارِ وَأَهْوَالِهَا

يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي فِضَّةٍ - وَيَسْرِقُ الْفِضَّةَ إِنْ نَالَهَا

'আমার বড় আশ্চর্য হয় শায়খের বৈরাগ্য দেখে এবং তার মুখে জাহান্নামের শাস্তির বিবরণ শুনে। তিনি রৌপ্য-পাত্রে পান করতে অপছন্দ করেন, কিন্তু সুযোগ পেলে রৌপ্য চুরি করেন।'

"আমার বড় আশ্চর্য হয়, কীভাবে এরা নিজেদেরকে খাঁটি তাওহীদপন্থী বলে দাবি করে আর অন্যদের মুশরিক ও বিদআতী আখ্যা দেয়! এরা বড়ই একগুঁয়ে এবং দ্বীনী বিষয়ে চরম কট্টরপন্থী। তাদের সকল পরিশ্রম অর্থহীন কাজে ব্যয়িত হয়। এরা নিজেরাও সংকীর্ণতায় পতিত এবং অন্যদেরও পেরেশানীর কারণ। এরা যেহেতু স্বাভাবিক নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিহার করেছে তাই তাদের সত্যগ্রহণের যোগ্যতাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এরা রিসালাত থেকে বিমুখ হয়েছে ফলে গোমরাহীর গহ্বরে পতিত হয়েছে। এদের মুখ-দর্শন এতটাই পীড়াদায়ক যেন চোখে বালি পড়ল অথবা গলায় কাঁটা বিঁধল। চিন্তা ও হৃদয় এদের দর্শনে বিপর্যস্ত হয়। এদের সঙ্গে ইনসাফের আচরণ করা হলে তা তাদের সহ্য হয় না। আর তাদের পক্ষ থেকে ইনসাফের আশা, সে তো আকাশের ধ্রুব তারায় হাত ছোঁয়ানোর মতো। তাদের অন্তর উল্টোমুখী, জীবনের লক্ষ্য দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত। এরা বাস করে কল্পনার জগতে। তাই কল্পনাই এদের চিরসাথী।

"এদের জ্ঞান-গভীরতার দাবি বড় উচ্চকিত, নিরন্তর বাক্যচালনায় মুখের উভয় পার্শ্ব লালা-সিক্ত, কিন্তু খোদার কসম এদের পদতলও জ্ঞানের জলে সিক্ত হয়নি। এই অত্যল্প জ্ঞানে না তাদের বুদ্ধির জং দূর হয়েছে, না অন্ধকার পথসমূহ আলোকিত হয়েছে, আর না হৃদয়জগৎ ইলমের নূরে নূরানী হয়েছে। এদের সংস্পর্শে কাগজের ললাট জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল হয়নি; বরং কলমের কালিতে তা যেন আরো বেদনা-বিধুর হয়েছে।

"এরা যা কিছু করছে তা দ্বীন নয়, বরং ভূ-পৃষ্ঠে এক বড় ফিতনা। যদি তারা কথা ও কাজে ন্যায়নিষ্ঠ হত, যদি তাদের অন্তরে ইলমে নাফে'র আগ্রহ থাকত এবং আল্লাহর ভয় ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে শ্রদ্ধা-সমীহের অনুভূতি থাকত তবে কখনো দুনিয়ার ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহে লিপ্ত হত না। পরহেজগারীর বেশ ধারণ করে জ্ঞানী ও মূর্খ উভয় শ্রেণীকে তাদের জালে আবদ্ধ করত না, মুসলমানের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করত না, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিত না, কুরআন মোতাবেক আমল করার পরিবর্তে

শুধু তার মৌখিক আলোচনায় এবং ইলমে হাদীসের কিছু রেওয়াজী ও অগভীর চর্চায় নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখত না, মূল্যবান সময় ও যোগ্যতাকে নেক কাজে ব্যয় করত, দিন-রাত দুনিয়াদারদের সংশ্রবে কাটাত না। জীবনের সকল বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করত না। বক্তৃতা ও ফতোয়া-দানের পর্ব আসলে তা সঠিকভাবে সম্পন্ন করত যেভাবে পূর্বসূরী আহলে হাদীস ও তাওহীদপন্থীগণ বাস্তবে করে দেখিয়েছেন। ফলে তারাই ছিলেন কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসরণ ও তার প্রতি অন্যকে দাওয়াত দেওয়ার অধিকারী। বলাবাহুল্য, কুরআন সুন্নাহ তাঁদের মতো মানুষদের জন্যই জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম ছিল, না ওইসব ভণ্ডদের জন্য যাদের সম্পর্ক কুরআন-সুন্নাহ্র সঙ্গে শুধু মৌখিক দাবির সীমানাতেই আবদ্ধ এবং যা সম্পূর্ণরূপে লোক দেখানো।

"আমরা এমন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর আশ্রয় চাই যারা বৃদ্ধ হওয়ার আগেই বার্ধক্যের ভান করেছে। এরা অন্যকে দেখানোর জন্য বাঁকা ও কুঁজো হয়ে চলে। অতএব সাবধান! বড়শির মাথা শিকার আটকাবার জন্যই বাঁকা হয়ে থাকে!

"খোদার কসম! আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হওয়ার ভয় যার আছে সে কখনো এমন দুঃসাহস করে না। আর এদের কাজ-কর্মকে কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই ভালো নজরে দেখতে পারে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের বাহানায় দুনিয়া সংগ্রহকারীদের অকল্যাণ থেকে হেফাযত করুন এবং আমাদেরকে শিথিলতা ও মুনাফেকী থেকে এবং মূর্খ লোকের সংশ্রব থেকে দূরে রাখুন।[১]

আগেও বলেছি, নওয়াব সাহেবের এই কথাগুলো একটি বিশেষ কারণে উল্লেখ করতে হল। কারণ এই যে, **নামাযে পয়াম্বর** এর বিগত সংস্করণে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের অভিব্যক্তির হুবহু উদ্ধৃতি না করে শুধু সারকথাটুকু উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে কোনো কোনো গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুর এই সন্দেহ দেখা দেয় যে, নওয়াব সাহেবের মূল বক্তব্য ভিন্নতর হতে পারে। তাই এই সংস্করণে তার কথাগুলো হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, অনেকটা তাদের আদেশ পালনার্থেই নওয়াব সাহেবের আরবী কথাগুলো উর্দূ ভাষায় পেশ করার দুঃসাহস করেছি।

৩. প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম কাযী আঃ ওয়াহিদ খানপুরী (রহ.)

বর্তমান সময়ের বিদআতী ও সালাফ-বিরোধী ভ্রষ্ট আহলে হাদীস, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা

১. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্ সিহাহিস সিত্তাহ, ইসলামী একাডেমী, লাহোর, পৃ. ১৫৩-১৫৫

রাফেজীদেরই উত্তরসূরী। অর্থাৎ অতীতে যেমন শীয়াদের মাধ্যমে কুফরী ও মুনাফেকী বিস্তার লাভ করেছে এবং বেদ্বীন ও যিন্দীক শ্রেণীর লোকজন মুসলিম পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছে তেমনি বর্তমান যুগের মূর্খ ও বিদআতী 'আহলে হাদীস'রাও বেদ্বীন ও যিন্দীকদের মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে।

বিষয়টি আরো খোলাসা করে বলছি, আগের যুগে বেদ্বীন লোকেরা রাফেজী সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে এসে যদি নিজেদেরকে 'রাফেযী' সম্প্রদায়ভুক্ত বলে পরিচয় দিত এবং হযরত আলী (রা.) ও হযরত হুসাইন (রা.)-এর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করে সালাফ (যথা হযরত আবু বকর রা., হযরত উমর রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম)কে জালিম বলে গালি দিত, তবে তাদের সাত খুন মাফ হয়ে যেত। এটুকু করার পর তারা যত ধরনের বেদ্বীনী প্রচার করুক, রাফেযীদের তাতে কোনোই মাথাব্যথা থাকত না। তদ্রূপ এই 'আহলে হাদীস' নামধারী লোকদের মধ্যে এসে একবার 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করে তাকলীদকে অস্বীকার করলে এবং সালাফ-এর সাথে (যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ফিকহ শাস্ত্রে যার 'ইমাম' হওয়ার বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত) বেআদবী করলে তারা বেজায় খুশি হয়ে যায়। এরপর এই বেদ্বীন লোকেরা যত বেদ্বীনী আর বদ দ্বীনীই তাদের মধ্যে প্রচার করুক তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না এবং এদের সবক তারা অত্যন্ত খুশি মনে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সচেতন আলিমগণ তাদেরকে অসংখ্যবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা এদিকে মোটেই কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করে না।

مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ

গত রাতের আঁধার আর আজ রাতের আঁধারে কত সাদৃশ্য!

বলাবাহুল্য হবে না যে, এসবের কারণ হল, তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মাযহাব ও আকাঈদ পরিত্যাগ করেছে এবং সালাফের অনুসরণকে নিজেদের জন্য মানহানীকর বিবেচনা করেছে।'[১]

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তিগুলোতে অনেক কঠিন কথা এসেছে। এগুলোর সঙ্গে আমরাও একমত–এটা অপরিহার্য নয়। শুধু আমানতদারী রক্ষার জন্য উদ্ধৃতিগুলো হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ শফীক আসআদ
ফাযেল, মদীনা ইউনিভার্সিটি
মদীনা মুনাওয়ারা

---

১. কাযী আবদুল ওয়াহিদ, ইজহারু কুফরি ছানাউল্লাহ বিজামীয়ি উসূলি আমানতু বিল্লাহ, পৃ. ২৬২

নবীজীর নামায

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَمَّا بَعْدُ

তহারাত-পবিত্রতা

শরীয়ত-নির্দেশিত পন্থায় পানি বা মাটি ব্যবহার করার দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জিত হয় তাকে "তহারাত" বলে। তহারাত হাসিলের পদ্ধতিগুলো হল অযু, গোসল, তায়াম্মুম।

পানি

পানি তিন প্রকার : ১. সাধারণ পানি; ২. নাপাক পানি; ৩. ব্যবহৃত পানি।

সাধারণ পানি ও তার বিধান

সাধারণ পানি বলতে এমন পানি বোঝায়, যার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ স্বাভাবিক রয়েছে। যেমন, সমুদ্রের পানি, নদী-নালার পানি, ঝরনা, কুঁয়া ও বৃষ্টির পানি। এই পানি পবিত্র এবং পবিত্রকারী।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ

এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন যাতে এর মাধ্যমে তোমাদেরকে পবিত্র করেন। (সূরা আনফাল : ১১)

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا

এবং আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়। (সূরা ফুরকান : ৪৮)

হাদীস শরীফে এসেছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি ইরশাদ করেন–

هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ

'সমুদ্রের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়'। (জামে তিরমিযী : ১/১১)

নাপাক পানি

নাপাক বস্তুর মিশ্রণের কারণে পানির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বর্ণ, গন্ধ কিংবা স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে সে পানি নাপাক। এ বিষয়ে উম্মাহর আলিমগণের ইজমা রয়েছে। আল্লামা শাওকানী লেখেন—

اَلْإِجْمَاعُ عَلٰى أَنَّ الْمُتَغَيِّرَ بِالنَّجَاسَةِ رِيحًا أَوْ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا نَجِسٌ

নাপাকী মিশ্রিত হওয়ার কারণে যে পানির বর্ণ কিংবা গন্ধ কিংবা স্বাদ পরিবর্তিত হয়েছে তা নাপাক হওয়ার বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে।

(নায়লুল আওতার : ১/৩৫)

এই মাসআলা বেশি পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন নদী, ঝিল, কিংবা বড় হাউযের পানি। নাপাকীর সংমিশ্রণে উপরোক্ত তিন বৈশিষ্ট্যের কোনো একটি পরিবর্তিত হলে এই পানি নাপাক বলে গণ্য হয়। কিন্তু স্বল্প পানি যথা বালতি, কলস ইত্যাদিতে সংরক্ষিত পানি নাপাক হওয়ার জন্য এটা শর্ত নয়; বরং সামান্য নাপাকী মিশ্রিত হলেই তা নাপাক হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

(مسلم : كراهة غمس المتوضئ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হও তখন পাত্রে হাত দেওয়ার আগে তিনবার হাত ধুয়ে নিবে। কেননা তোমাদের জানা নেই যে, ঘুমন্ত অবস্থায় হাত কোথায় কোথায় স্পর্শ করেছে।' (সহীহ মুসলিম : ১/১৩৬)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, অল্প পানি এতটুকু নাপাকীর দ্বারাই নাপাক হয়ে যায় যা হাতে লেগে থাকতে পারে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, হাতে লেগে থাকা সামান্য নাপাকীতে পানির বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ পরিবর্তিত হয় না।

ব্যবহৃত পানি

যে পানি দ্বারা একবার অযু বা গোসল করা হয়েছে তা হল 'ব্যবহৃত' পানি। এ পানি নিজে পাক (যদি তার সাথে কোনো নাপাকী মিশ্রিত না হয়ে থাকে) কিন্তু এর দ্বারা দ্বিতীয়বার পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। হযরত আবু মূসা (রা.) বলেন—

دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَهُ وَوَجْهَهُ فِيْهِ، وَمَجَّ فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا : اِشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلٰى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا.

(بخارى : الغسل والوضوء في المخضب، واستعمال فضل وضوء الناس)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্রে পানি আনতে বললেন। এরপর তিনি তাতে হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং তাতে কুলি করলেন। এরপর তাদেরকে [আবু মূসা (রা.) ও বিলাল (রা.)কে] বললেন, 'এখান থেকে কিছু পানি পান কর এবং অবশিষ্ট পানি চেহারা ও সীনার উপর ঢেলে দাও"।' (সহীহ বুখারী : ১/৩১–৩২)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَالُوْا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ : يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

{مسلم : النهي عن الاغتسال}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে ফরয গোসল না করে।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আবু হুরায়রা! তাহলে কীভাবে গোসল করবে? তিনি উত্তরে বললেন, প্রয়োজন পরিমাণ পানি তুলে নিয়ে আসবে। (সহীহ মুসলিম : ১/১৩৮)

প্রথম হাদীস থেকে জানা গেল যে, 'ব্যবহৃত' পানি পাক, তা পান করা যায় এবং শরীরে প্রবাহিত করা যায়। দ্বিতীয় হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, 'ব্যবহৃত' পানি দ্বিতীয়বার পবিত্রতা অর্জনের উপযুক্ত থাকে না। অতএব এই পানি নিজে পাক, কিন্তু অন্যকে পাক করে না। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.), হাসান বসরী (রহ.), ইমাম যুহরী (রহ.) এবং অন্যান্য ফকীহ এই মত পোষণ করেন।

ইস্তিঞ্জার আদব

১. বাথরুমে এমন কিছু নিয়ে প্রবেশ করবে না, যাতে আল্লাহর নাম বা কোনো বরকতপূর্ণ কথা লিখিত থাকে।

২. মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাবে। খোলা প্রান্তরে থাকা অবস্থায় ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন হলে সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবে। বসতিতে হলে বাথরুম ব্যবহার করবে।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتّٰى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ. {ابو داود : كتاب الطهارة}

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন সারার জন্য এত দূরে চলে যেতেন যে, কেউ তাঁকে দেখতে পেত না।' (সুনানে আবূ দাউদ : ১/২)

৩. বাথরুমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং প্রবেশের আগে এই দুআ পড়বে—

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. {بخارى : ما يقول عند الخلاء، مسلم : ما يقول إذا اراد الخلاء}.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল খালায় প্রবেশের আগে এই দুআ পড়তেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি মন্দ শয়তান থেকে এবং মন্দ অভ্যাসসমূহ থেকে।' (সহীহ বুখারী : ১/২৬; সহীহ মুসলিম : ১/১৬৩)

৪. বাথরুম থেকে ডান পা দিয়ে বের হবে এবং এই দুআ পড়বে—

غُفْرَانَكَ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ : غُفْرَانَكَ. {ترمذى : ما يقول إذا خرج}

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বায়তুল খালা' থেকে বের হওয়ার পর বলতেন— غفرانك 'হে আল্লাহ! আমি তোমার মাগফিরাত কামনা করি।' (তিরমিযী : ১/৩)

৫. গোসলখানায় প্রস্রাব করা অনুচিত। কেননা, এতে পাকী-নাপাকী সম্পর্কে সন্দেহের স্বভাব সৃষ্টি হতে পারে। তবে যদি গোসলখানায় প্রস্রাবের নির্দিষ্ট স্থান থাকে তাহলে অসুবিধা নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ. {ابو داود : البول فى المستحم}

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন এমন না করে যে, গোসলখানায় প্রস্রাব করল, এরপর সেখানে অযু করল। কেননা, এতে সন্দেহগ্রস্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে।' (আবু দাউদ : ১/৫)

৬. আবদ্ধ কিংবা প্রবহমান পানিতে প্রস্রাব করবে না।

হযরত জাবির (রা.) বলেন—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. {مسلم : النهي عن البول في الماء، بخارى : النهي عن الماء الدائم} وفي رواية عنه : في الماء الجارى {طبرانى}

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।' (সহীহ বুখারী : ১/৩৭; মুসলিম : ১/১৩৮)

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, প্রবহমান পানিতেও প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। (আল-মু'জামুল আওসাত তবারানী : ২/৪৪৬)

৭. চলাফেরার রাস্তায় বা গাছের ছায়ায় প্রস্রাব করবে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ، قَالُوا : وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ. {مسلم : كراهة التبرز في الطريق}

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুটি অভিশাপের কাজ থেকে বেঁচে থাকবে।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই কাজ দুটি কী?' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মানুষের চলাচলের রাস্তায় কিংবা গাছের ছায়ায় মলত্যাগ করা।' (সহীহ মুসলিম : ১/১৩২)

৮. কীট-পতঙ্গের গর্তে প্রস্রাব করবে না। সেখানে কোনো বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে এবং দংশন করতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) বলেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ {ابو داود : النهي عن البول في الجحر}

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্তের মুখে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।' (সুনানে আবু দাউদ : ১/৫)

৯. ইস্তিঞ্জারত অবস্থায় কথাবার্তা বলবে না। সালামের জওয়াব দিবে না। হাঁচি দিলে মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। বায়তুল খালায় প্রবেশের সময় দুআ পড়তে ভুলে গেলে তা-ও মনে মনে পড়বে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন—

إِنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. {ترمذی : كراهية رد السلام وقال : حسن صحيح}.

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিঞ্জারত ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জওয়াব দিলেন না।' (জামে তিরমিযী : ২/৯৬)

হযরত আবু সাঈদ (রা.) বলেন—

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَايَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِيهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ ...

(ابو داود : كراهية الكلام)

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যখন দুই ব্যক্তি সতর খুলে প্রয়োজন সারতে থাকে এবং পরস্পর কথা বলতে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রুষ্ট হন।' (আবু দাউদ : ১/৩)

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, ইস্তিঞ্জারত অবস্থায় কথাবার্তা বলা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের কারণ। অতএব এই মন্দ অভ্যাস অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

১০. শরীর এবং কাপড়-চোপড় নাপাকী থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এ বিষয়ে অবহেলা করা কবর-আযাবের অন্যতম কারণ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—

مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ. {مسلم : الدليل على نجاسة البول}

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে গমন করলেন এবং বললেন, 'দেখ, এদের দু'জনের আযাব হচ্ছে এবং আযাবের কারণ কঠিন কিছু ছিল না। এদের একজন চোগলখোরী করত, অন্যজন প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাকত না।' (সহীহ মুসলিম : ১/১৪১)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহ.) থেকে বর্ণিত—

قِيلَ لِسَلْمَانَ : قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. {مسلم : الاستطابة}

"সাহাবী সালমান (রা.)কে বলা হয়েছিল, 'তোমাদের নবী কি তোমাদের সবকিছুই শেখায়, এমনকি পেশাব-পায়খানা পর্যন্ত!' হযরত সালমান (রা.)

বললেন, 'অবশ্যই শেখান। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমরা যেন পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ না করি, ডান হাতে ঢিলা বা পানি ব্যবহার না করি, তিন ঢিলার কম ব্যবহার না করি এবং গোবর বা হাড্ডি দ্বারা ঢিলা না করি।' (সহীহ মুসলিম : ১/১৩০)

১১. এই হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, কিবলার সম্মান করতে হবে। ইস্তিঞ্জার সময় কিবলামুখী হয়ে কিংবা কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসা যাবে না।

১২. ইস্তিঞ্জার পর ঢিলা, পানি ইত্যাদি বাম হাতে ব্যবহার করতে হবে।

হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত—

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِيْنِهِ ... {بخارى : لا يمسك ذكره بيمينه، مسلم : النهي عن الاستنجاء باليمين}

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পেশাব-পায়খানার সময় বিশেষ অঙ্গে ডান হাত লাগাবে না এবং পরিচ্ছন্নতা অর্জনের কাজেও ডান হাত ব্যবহার করবে না।' (সহীহ বুখারী : ১/২৭ সহীহ মুসলিম : ১/১৩১)

১৩. ইস্তিঞ্জার পর তিনটি ঢিলা ব্যবহার করবে কিংবা প্রয়োজনে অধিক সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে। এরপর পানি ব্যবহার করবে। কুরআন মজীদে এসেছে—

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

সেখানে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা পছন্দ করে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা তাওবা : ১০৮)

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, পবিত্রতা অর্জনের জন্য তোমরা কী করে থাক? তাঁরা বললেন, আমরা ঢিলা ব্যবহার করার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করি।

১৪. ঢিলা হিসাবে হাড্ডি, গোবর ইত্যাদি ব্যবহার করবে না।

দুধের শিশুর পেশাব নাপাক

দুধের শিশুর প্রস্রাবও নাপাক। এ বিষয়ে সালাফের[১] "ইজমা" রয়েছে। অতএব তা কোথাও লাগলে নির্ধারিত নিয়মে ধৌত করতে হবে।

১. পূর্ববর্তী অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ। –অনুবাদক

قَالَ النَّوَوِيُّ : اِعْلَمْ أَنَّ هٰذَا الْخِلَافَ إِنَّمَا هُوَ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ الشَّيْءِ الَّذِي بَالَ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ، وَلَا خِلَافَ فِي نَجَاسَتِهِ، وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِ الصَّبِيِّ.

(شرح مسلم : باب حكم بول الطفل الرضيع)

আল্লামা নববী (রহ.) বলেছেন, 'শিশু যে জিনিসের উপর প্রস্রাব করেছে তা পাক করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে বটে, তবে শিশুর প্রস্রাব যে নাপাক– এ বিষয়ে কারো মতভেদ নেই। কোনো কোনো আলেম এ বিষয়ে উম্মাহর 'ইজমা' বর্ণনা করেছেন।' (শরহে মুসলিম, নববী : ১/১৩৯)

মাসআলা : কন্যাশিশু যদি কাপড় ইত্যাদিতে পেশাব করে, তবে তা খুব ভালোভাবে ধুতে হবে, ছেলেশিশুর পেশাবের বেলায় বাড়তি গুরুত্বের প্রয়োজন নেই।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত—

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّضِيْعِ : يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ. {طحاوى : حكم بول الغلام}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুগ্ধপোষ্য শিশুর ব্যাপারে বলেছেন, 'কন্যাশিশুর পেশাব ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে, আর ছেলে-শিশুর পেশাব হালকাভাবে ধোয়া যথেষ্ট হবে।' (তহাবী : ১/৭২)

অন্য বর্ণনায় এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ، فَبَالَ فِيْ حَجْرِهٖ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهٗ عَلَيْهِ. {مسلم : حكم بول الطفل الرضيع}

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি দুগ্ধপোষ্য ছেলেশিশুকে আনা হল। শিশুটি নবী

টীকা : শিশুর পেশাব পরিষ্কার করার বিষয় হাদীস শরীফে যে বাক্যগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পরিশিষ্টে রয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা ২৭৯

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে পেশাব করে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনতে বললেন এবং তার উপরে ঢাললেন।

(মুসলিম : ১/১৩৯)

মাসআলা : শিশু যখন সাধারণ খাবার গ্রহণ করতে আরম্ভ করে তখন তার পেশাবও অন্যান্য নাপাকীর মতো ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করা জরুরি। এ বিষয়ে আলিমগণের ইজমা রয়েছে।

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন—

أَمَّا إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ عَلٰى جِهَةِ التَّغْذِيَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغَسْلُ بِلَا خِلَافٍ.

'শিশু যখন সাধারণ খাবার গ্রহণ করে তখন তার পেশাব ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই।' (শরহে মুসলিম : ১/১৩৯)

গোসল

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهٖ عَلٰى شِمَالِهٖ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى إِذَا رَأٰى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلٰى رَأْسِهٖ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهٖ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهٖ شَعْرَهُ حَتّٰى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوٰى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. {مسلم : صفة غسل الجنابة، بخارى : تخليل الشعر}

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসলে প্রথমে দুই হাত ধৌত করতেন। তারপর ডান হাতে পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে বিশেষ স্থান ধৌত করতেন। এরপর নামাযের অযুর মতো অযু করতেন। তারপর পানি ঢেলে আঙুলদ্বারা চুলের গোড়া ভেজাতেন। চুল ভালোভাবে ভিজে যাবার পর তিন আঁজলা পানি শির মোবারকে দিতেন। এরপরে গোটা শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন। সবশেষে দুই পা ধৌত করতেন।'

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে– 'আঙুল দ্বারা চুলের গোড়া ভিজাতেন। চুলের গোড়া ভালোভাবে ভিজে যাবার পর শির মোবারকে তিনবার পানি ঢালতেন।'

(সহীহ বুখারী : ১/৪১; সহীহ মুসলিম : ১/১৪৭)

গোসলের ফরয

গোসলের ফরযগুলো এই–

১. কুলি করা, ২. নাকে পানি দেওয়া, ৩. গোটা শরীরে এমনভাবে পানি প্রবাহিত করা, যাতে সামান্য স্থানও শুকনা না থাকে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...

'আর যদি তোমরা গোসল ফরয অবস্থায় থাক তাহলে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে।' (সূরা মায়েদা : ৬)

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. [ابو داود : الغسل من الجنابة]

'কেউ যদি ফরয গোসলের মধ্যে শরীরের এক চুল পরিমাণ স্থানও শুকনা রাখে তাহলে তা জাহান্নামের আগুনে এই এই শাস্তি ভোগ করবে।'

(সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৩)

মাসআলা : যেসব কারণে গোসল ফরয হয় তা নিম্নরূপ :

১. স্ত্রী মিলন, ২. বীর্যপাত, ৩. হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব), ৪. নিফাস (সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব)।

মাসআলা : স্ত্রী মিলনে বীর্যপাত হোক বা না হোক গোসল ফরয হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ. [مسلم : بيان أن الغسل .... بخارى : إذا التقى الختانان...]

'যখন পুরুষ স্ত্রীর চার অঙ্গের মাঝখানে বসে এবং শক্তি ব্যয় করে তো গোসল ফরয হয়ে যায়। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে— 'যদিও বীর্যপাত না হয়।' (সহীহ বুখারী : ১/৪৩; সহীহ মুসলিম : ১/১৫৬)

মাসআলা : উত্তেজনার সঙ্গে দ্রুতবেগে বীর্য স্খলিত হলে গোসল ফরয হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় হোক বা জাগ্রত অবস্থায়। পুরুষের হোক বা মহিলার।

টীকা- **'মনী', 'মযী' ও 'ওদী'র পরিচয়**

মনী– সাদা রংয়ের গাঢ় পিচ্ছিল পদার্থ, যা চরম উত্তেজনার মুহূর্তে স্খলিত হয় এবং তা বের হওয়ার পর বিশেষ অঙ্গ শিথিল হয়ে যায়।

মযী– রংহীন পিচ্ছিল পদার্থ, যা স্ত্রী সহবাসের সময় কোনো ঢেউ ছাড়াই বের হয়। কখনো শুধু যৌন চিন্তার কারণেও নির্গত হয়। তবে এর দ্বারা শারীরিক উত্তেজনা প্রশমিত হয় না। এটা নির্গত হলে অযু বিনষ্ট হয়।

ওদী– সাদা রংয়ের পদার্থ, যা মনীর (বীর্যের) মতোই গাঢ় হয়ে থাকে। এটা কখনো প্রস্রাবের আগে বা পরে নির্গত হয়। এর মাধ্যমে অযু বিনষ্ট হয়।

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত—

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ : مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ. (الترمذى : ما جاء في المني والمذي. وقال : حسن صحيح)

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ‘মযীতে অযু নষ্ট হয়, মনীতে গোসল ফরয হয়’।”

(জামে তিরমিযী : ১/১৬)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ. {بخارى : اذا احتلمت، مسلم : وجوب الغسل على المرأة}

হযরত উম্মে সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না। আমার প্রশ্ন এই যে, মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদের উপর গোসল ফরয হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, হাঁ যদি পানি (স্বপ্নদোষের নিদর্শন) দেখতে পায়।

(সহীহ বুখারী : ১/৪২; সহীহ মুসলিম : ১/১৪৬)

ইহতিলামের (স্বপ্নদোষের) তিনটি ধরন

১. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যদি কাপড়ে স্বপ্নদোষের নিদর্শন দেখে এবং স্বপ্নের কথাও মনে থাকে তাহলে গোসল ফরয হবে।
২. স্বপ্ন মনে নেই, কিন্তু কাপড়ে বীর্যপাতের চিহ্ন রয়েছে তাহলেও গোসল ফরয হবে।
৩. স্বপ্নের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু কাপড়ে বা শরীরে কোনো চিহ্ন নেই তাহলে গোসল ফরয হবে না।

হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বলেন—

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا، فَقَالَ : يَغْتَسِلُ. وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً، فَقَالَ : لاَغُسْلَ عَلَيْهِ. {ترمذى : فيمن يستيقظ فيرى}

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ (কাপড়ে) আর্দ্রতা পেল, কিন্তু স্বপ্নের কথা মনে নেই (তার বিধান কী?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে গোসল করতে হবে।' আবার এটাও জিজ্ঞাসা করেছি যে, কেউ স্বপ্ন দেখল, কিন্তু (কাপড়ে) আর্দ্রতা পেল না? তিনি উত্তরে বললেন, 'তাকে গোসল করতে হবে না।' (জামে তিরমিযী : ১/১৬)

বীর্য নাপাক

হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় যে, মনী (বীর্য) নাপাক পদার্থ। কাপড়ে বা শরীরে লাগলে পরিষ্কার করতে হবে, অন্যথায় নামায হবে না।

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلٰوةِ فِيْ ذٰلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلٰى أَثَرِ الْغُسْلِ فِيْهِ. {مسلم : باب حكم المني...}

وَفِيْ رِوَايَةٍ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كُنْتُ أَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلٰوةِ وَأَثَرُ الْغُسْلِ فِيْ ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

{بخارى : باب غسل المني وفركه}

আমর ইবনে মায়মূন (রহ.) হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসারকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কাপড়ে বীর্য লাগলে শুধু সেই স্থানটুকু ধুলেই চলবে, না গোটা কাপড় ধুতে হবে? হযরত সুলায়মান (রহ.) উত্তরে বললেন, আমাকে আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় থেকে মনী ধুয়ে ফেলতেন এবং সে কাপড় পরেই নামাযের জন্য যেতেন। আমি তার কাপড়ের ভেজা অংশটুকু স্পষ্ট দেখতে পেতাম।' (সহীহ মুসলিম : ১/১৪০)

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে মনী ধুয়ে দিতাম। তিনি সেই ভেজা-দাগযুক্ত কাপড় পরেই নামাযের জন্য যেতেন।'

(সহীহ বুখারী : ১/৩৬)

অধিকাংশ সাহাবী ও ফকীহ এ বিষয়ে একমত যে, মনী (বীর্য) নাপাক। এমনকি আল্লামা শাওকানীও বলেছেন—

فَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ، وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهُ بِإِحْدَى الْأُمُورِ الْوَارِدَةِ.

'অতএব সঠিক কথা এই যে, মনী (বীর্য) নাপাক। তা পরিষ্কার করার জন্য (নির্ধারিত) পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনো একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে।'

(নায়লুল আওতার : ২/৬৭)

আল্লামা মুবারকপুরী (রহ.) বলেছেন—

كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ هٰذَا حَسَنٌ جَيِّدٌ.

'শাওকানী (রহ.)-এর এই বক্তব্য উত্তম ও সঠিক।'

(তুহফাতুল আহওয়াযী : ১/৩৭৫)

কাপড় পাক করার পদ্ধতি

বীর্য যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায় এবং নখ দিয়ে খুটে পুরোপুরি তোলা যায়, তাহলে এভাবে তুলে ফেলাই যথেষ্ট হবে। আর তা সম্ভব না হলে কিংবা ভেজা হলে কাপড় ধৌত করতে হবে। এটা এ বিষয়ক সকল হাদীসের সারকথা। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এ মতই পোষণ করেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন—

وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفُرِي

{مسلم : باب حكم المني}

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে শুকনা মনী খুটে তুলে ফেলতাম।' (সহীহ মুসলিম : ১/১৪০)

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلٰوةِ. {مسلم : باب حكم المني}

উম্মুল মুমিনীন থেকে অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনী ধুয়ে ফেলতেন। এরপর নামাযে যেতেন।'

(সহীহ মুসলিম : ১/১৪০)

অন্য হাদীসে এসেছে, উম্মুল মুমিনীন বলেন—

كُنْتُ أَفْرُكُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا. {دارقطنى}

'শুকনা হলে আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে খুটে ফেলতাম আর ভিজা হলে ধুয়ে ফেলতাম।'

(সুনানে দারাকুতনী : ১/১২৫)

উল্লেখ্য যে, গাঢ় মনী খুটে তোলার দ্বারা কাপড় পাক হওয়ার যে কথা হাদীস শরীফ থেকে বোঝা গেল তা থেকে এ ধারণা করার সুযোগ নেই যে, মনী পাক। কেননা, মনী অবশ্যই নাপাক, তবে তা থেকে কাপড় পাক করার একটি পদ্ধতি হল খুব গাঢ় হলে খুটে তুলে ফেলা।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মুবারকপুরী (রহ.) বলেন—

مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ الْمَنِيِّ مُسْتَدِلًّا بِرِوَايَةِ الْفَرْكِ أُجِيْبَ بِأَنَّ ذٰلِكَ لَايَدُلُّ عَلٰى طَهَارَةٍ، إِنَّمَا يَدُلُّ عَلٰى كَيْفِيَّةِ التَّطْهِيْرِ.

'মনী খুটে তোলার হাদীসগুলো থেকে মনী পাক হওয়া প্রমাণিত হয় না; বরং কাপড় পাক করার পদ্ধতি জানা যায়।'

(তুহফাতুল আহওয়াযী সংক্ষেপিত : ১/৩১৮)

হায়েয (ঋতুস্রাব) প্রসঙ্গ

নারীগণ হায়েয বন্ধ হওয়ার পর গোসল করবেন এবং পুনরায় নামায পড়া আরম্ভ করবেন। হায়েয চলাকালীন যে নামাযগুলো পড়া হয়নি তা কাযা করা ওয়াজিব নয়।

কুরআন মজীদে এসেছে—

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ

'আর যতক্ষণ তারা পবিত্র না হয় তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। যখন তারা পবিত্র হয়ে যায় তখন তাদের কাছে এস যে স্থান দিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।' (সূরা বাকারা : ২২২)

বোঝা গেল, মহিলাদের এ অবস্থাটি হল নাপাকীর অবস্থা। অতএব এ সময় নামায পড়ার সুযোগ নেই।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي. {بخارى : إقبال المحيض}

"ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ 'ইসতিহাযা'য় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটা হল শিরার রক্ত, হায়েযের রক্ত নয়। যখন তোমার হায়েয আসবে তখন নামায ছেড়ে দিবে। যখন হায়েয বন্ধ হবে তখন গোসল করবে এবং নামায পড়বে'।" (সহীহ বুখারী : ১/৪৬)

হায়েয অবস্থার বিধি-নিষেধ

মাসিক ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে মহিলাগণ নামায পড়বেন না, রোযা রাখবেন না। স্রাব বন্ধ হওয়ার পর রোযার কাযা করতে হবে, নামাযের কাযা লাগবে না। এ অবস্থায় কুরআনে কারীম পড়া বা স্পর্শ করা, মসজিদে প্রবেশ করা, কাবা শরীফের তাওয়াফ করা ইত্যাদি সবকিছুই নিষিদ্ধ। স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়াও জায়েয নয়।

হযরত মুআযা (রা.) বলেন—

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلٰكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. {مسلم : وجوب قضاء الصوم لا الصلاة}

"আমি হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুমতী মহিলাকে রোযা কাযা করতে হয় কিন্তু নামায কাযা করতে হয় না কেন? তিনি বললেন, তুমি কি 'হারূরিয়া'[১] না কি? আমি বললাম, জ্বি না, আমি 'হারূরিয়া' নই, তবে আমি বিষয়টি বুঝতে চাচ্ছি। তিনি তখন বললেন, 'আমরা এই অবস্থার সম্মুখীন হতাম তো আমাদেরকে (সে সময়ের) রোযাগুলো আদায় করার আদেশ করা হত, নামাযগুলো আদায়ের আদেশ করা হত না'।" (সহীহ মুসলিম : ১/১৫৩)

ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর বিধান

পূর্ণ দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যার রক্ত বন্ধ হয় না তার জন্য মাসআলা হল, দশ দিন পর গোসল করে নামায আরম্ভ করবে এবং প্রতি নামাযের জন্য শুধু অযু করবে। প্রতিবার গোসল করার প্রয়োজন নেই

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন—

جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ : لَا، إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي. قَالَ : وَقَالَ أَبِي : تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتّٰى يَجِيءَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ. {بخارى : باب غسل الدم الترمذى : باب المستحاضة}

"ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরয করেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ইজতিহাযাগ্রস্ত। আমার রক্ত কখনো বন্ধ হয় না। আমি কি একেবারেই নামায পড়ব না?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

১. হারূরিয়া মু'তাযেলা সম্প্রদায়কে বলে।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না। এটা শিরার রক্ত, হায়েযের রক্ত নয়। তাই যখন তোমার হায়েযের সময় আরম্ভ হয় তখন নামায পড়বে না। আর যখন তা শেষ হয় তখন গোসল করে নামায পড়া আরম্ভ করবে। এরপর প্রতি নামাযের জন্য অযু করবে'।" (সহীহ বুখারী : ১/৩৬; জামে তিরমিযী : ১/১৮)

নিফাস

সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত আসে তাকে নিফাস বলে। নিফাসের দিনগুলোতে সেই বিধি-নিষেধই আরোপিত হয় যা মাসিকের দিনগুলোতে হয়। নিফাসের সর্বনিম্ন সময় নির্ধারিত নেই। তাই রক্ত বন্ধ হলেই গোসল করে নামায পড়তে হবে। নিফাসের সর্বোচ্চ সময় হল চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি রক্ত বন্ধ না হয় তাহলে বাড়তি দিনগুলো নিফাসের মধ্যে গণ্য হবে না।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন—

كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ، وَكُنَّا نَطْلِيْ وُجُوْهَنَا مِنَ الْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ. (ترمذى : كم تمكث النفساء)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে প্রসূতিরা (সর্বোচ্চ) চল্লিশ দিন পর্যন্ত (শরীয়তের নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত থেকে) মুক্ত থাকত। আমরা (এ সময়) চেহারার দাগ ইত্যাদি দূর করার জন্য 'ওয়ার্স' (এক ধরনের হলুদ ঘাস, যা ইয়ামানে উৎপন্ন হত এবং চেহারার দাগ দূর করার জন্য ব্যবহৃত হত) দ্বারা চেহারায় প্রলেপ দিতাম।' (জামে তিরমিযী : ১/২০)

ইজমায়ে উম্মত

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন—

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلٰى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ. (ترمذى : باب كم تمكث النفساء)

'সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং পরবর্তী যুগের আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, প্রসূতি সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায পড়বে না। তবে এর আগেই কারো রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে সে গোসল করবে এবং নামায পড়া শুরু করবে।' (জামে তিরমিযী : ১/২০)

অযু

অযুর গুরুত্ব ও ফযীলত

শরীয়তে অযুর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অযু ছাড়া নামায হয় না। অযুকারীর অযুর অঙ্গগুলো কিয়ামতের দিন ঝলমল করতে থাকবে।

হযরত মুসআব ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ. {مسلم : وجوب الطهارة}

'অযু ছাড়া নামায হয় না এবং আত্মসাতের সম্পদ থেকে সাদাকাহ হয় না।' (সহীহ মুসলিম : ১/১১৯)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَاتُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. {بخارى : لا تقبل صلاة بغير طهور}

'যার অযু নষ্ট হল অযু করার আগ পর্যন্ত তার নামায হয় না।' (সহীহ বুখারী : ১/২৫)

নুয়াইম মুজমির বলেন—

رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. {بخارى : فضل الوضوء، مسلم : استحباب إطالة الغرة}

'আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে মসজিদের ছাদে উঠলাম। তিনি অযু করলেন এবং বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, তাদের অযুর অঙ্গগুলো ঝলমল করতে থাকবে। অতএব তোমাদের কেউ যদি তার

উজ্জ্বল স্থানকে দীর্ঘ করতে চায় সে যেন তা করে। (অর্থাৎ অযুর অঙ্গগুলো নির্ধারিত স্থান থেকে বেশি করে ধৌত করতে পারবে।)

(সহীহ বুখারী : ১/২৫; সহীহ মুসলিম : ১/১২৬)

অযুর ফরয

অযুর ফরযগুলো নিম্নরূপ–

১. চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত গোটা মুখ ধৌত করা।

২. দুই হাত কনুইসহ ধৌত করা।

৩. মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা।

৪. দুই পা টাখনুসহ ধৌত করা।

অযু করার সময় এই কাজগুলো যত্নের সঙ্গে করতে হবে। কেননা, এগুলোতে ত্রুটি হলে অযু হবে না। কুরআন মজীদে এসেছে—

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِيـنَ آمَـنُـوا إِذَا قُـمْـتُـمْ إِلَى الصَّـلٰوةِ فَـاغْـسِـلُـوا وُجُـوهَـكُـمْ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের উদ্দেশ্যে ওঠ তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং মাথা মাসেহ কর এবং পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর। (সূরা মায়েদা : ৬০)

অযুর সুন্নত

১. অযুর শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া।

২. মিসওয়াক করা।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. {مسلم :باب السواك}

'যদি আমার এই আশঙ্কা না হত যে, উম্মতের জন্য কঠিন হবে তাহলে তাদেরকে প্রতি নামাযের সময় মিসওয়াকের আদেশ করতাম।'

(সহীহ মুসলিম : ১/১২৮)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন—

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. {نسائى : الترغيب في السواك}

'মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার হয় এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।' (সুনানে নাসাঈ : ১/৩)

মাসআলা : রোযার হালতেও মিসওয়াক করা সুন্নত।

হযরত আমের ইবনে রাবীআ (রা.) বলেন—

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَا أُحْصِيْ يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(الترمذى : ما جاء في السواك للصائم. وقال : حسن)

'আমি অসংখ্যবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করতে দেখেছি।' (সুনানে তিরমিযী : ১/৯১)

৩. তিনবার হাত ধোয়া

فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ {مسلم : باب صفة الوضوء}

হযরত উসমান (রা.) সুন্নত তরীকায় উযু করে দেখিয়েছেন। তিনি প্রথমে তিন বার কব্জি পর্যন্ত হাত ধৌত করলেন। (সহীহ মুসলিম : ১/১২০)

৪. তিনবার কুলি করা।

ثُمَّ مَضْمَضَ

এরপর তিনবার কুলি করলেন। (সহীহ মুসলিম)

৫. তিনবার নাকে পানি দেওয়া।

وَاسْتَنْثَرَ

এরপর নাকে পানি দিলেন। (সহীহ মুসলিম)

৬. অযুর সকল অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া

ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهٗ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ.

এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। এরপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিন বার ধৌত করলেন। প্রথমে ডান হাত, তারপর বাম হাত। এরপর মাথা মাসেহ করলেন। এরপর দুই পা তিন বার ধৌত করলেন। প্রথমে ডান পা এরপর বাম পা ধৌত করলেন। (সহীহ মুসলিম)

৭. দাড়ি খিলাল করা।

হযরত উসমান (রা.) বলেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. (ترمذى : ما جاء في تخليل اللحية. وقال : حسن صحيح)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি খিলাল করতেন।' (জামে তিরমিযী : ১/৬)

৮. আঙুল খিলাল করা।

হযরত আসিম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন—

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ. (ترمذى : ما جاء في تخليل الأصابع. وقال : حسن صحيح)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা অযু করার সময় (হাত ও পায়ের) আঙুলসমূহ খিলাল করবে।' (জামে তিরমিযী : ১/৭)

৯. প্রথমে ডান অঙ্গ ধোয়া।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন—

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. {بخارى : التيمن في الوضوء، مسلم : حبه للتيامن}

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা পরতে, চুল আঁচড়াতে, অযু-গোসলে এবং অন্য সকল কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।' (সহীহ বুখারী : ১/২৫; মুসলিম : ১/১৩২)

১০. অযুর অঙ্গগুলো ডলে ডলে ধোয়া।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُولُ هٰكَذَا يَدْلُكُ.

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করলেন এবং অযুর অঙ্গগুলো এভাবে ডললেন।'

১১. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগেই অন্য অঙ্গ ধৌত করা অর্থাৎ অযুর কাজগুলোর মধ্যে বিরতি না দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উম্মাহর ধারাবাহিক আমল দ্বারা তা সুন্নত প্রমাণিত হয়।

১২. কান মাসেহ করা।

মাথা মাসেহ করার পর ভেজা হাত দিয়ে কান মাসেহ করা সুন্নত। কান মাথারই অংশ হওয়ায় এর জন্য নতুন পানির প্রয়োজন নেই। হাদীস শরীফে বিষয়টি এভাবেই এসেছে—

عَنِ الرُّبَيِّعِ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، قَالَتْ : مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

{ترمذى : ان المسح مرة. وقال : حسن صحيح}

রুবাইয়ি (রা.) বলেন, 'তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করতে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার সম্মুখ ভাগ ও পিছন ভাগ এবং মাথার উভয় পার্শ্ব ও কান একবার মাসেহ করেছেন।' (জামে তিরমিযী : ১/৭)

এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ {ترمذى : مَا جَاءَ أَنَّ الأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ، وقَالَ : حَدِيْثُ حَسَنٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ القَائِمِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

অর্থাৎ কান মাথার অংশবিশেষ। (জামে তিরমিযী : ১/৭)

১৩. গর্দান মাসেহ করা।

মাথা ও কান মাসেহ করার পর ভেজা হাত দিয়ে গর্দান মাসেহ করবে।

মুসা ইবনে তলহা বলেন–

مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وَقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : هٰذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، لِأَنَّ هٰذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، فَهُوَ عَلٰى هٰذَا مُرْسَلٌ.

'যে গর্দানসহ মাথা মাসেহ করবে সে কিয়ামতের দিন গলায় বেড়ি পরানো থেকে মুক্ত থাকবে।'

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, 'বর্ণনাটি সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, যদিও তা একজন তাবেয়ীর কথা হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা রাসূলুল্লাহর হাদীস হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, তিনি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এমন সংবাদ দেওয়া সম্ভব নয়।' (আত-তালখীছুল হাবীর : ১/৯২)

আল্লামা বাগাভী (রহ.), ইবনে সাইয়িদুন্নাস (রহ.), শাওকানী (রহ.) প্রমুখও অযুতে গর্দান মাসেহ করার কথা বলেছেন। (নায়লুল আওতার : ১/২০৪)

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এই মতকে সমর্থন করে লিখেছেন যে, 'গর্দান মাসেহ করাকে বিদআত বলা ভুল। আত-তালখীছুল হাবীর গ্রন্থের উপরোক্ত রেওয়ায়েত এবং এ বিষয়ের অন্যান্য রেওয়ায়েত দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া এর বিপরীত বক্তব্য কোনো হাদীসে আসেনি।' (বুদূরুল আহিল্লাহ পৃ. ২৮)

১৪. অযু শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া।

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. {مسلم : باب الذكر المستحب عقب الوضوء}

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উত্তমরূপে অযু করে, তারপর বলে—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

তাহলে জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।" (সহীহ মুসলিম : ১/১২২)

তাহিয়্যাতুল অযু

অযুর পরের দুই রাকাআত নফল নামাযকে তাহিয়্যাতুল অযু বলে।

হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) বলেন—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ، وَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بِقَلْبِهٖ وَوَجْهِهٖ عَلَيْهِمَا اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

{مسلم : الذكر المستحب عقب الوضوء}

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে উত্তমরূপে অযু করে তারপর পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে দুই রাকাআত নামায আদায় করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে'।" (সহীহ মুসলিম : ১/১২২)

যেসব কারণে অযু ভেঙ্গে যায়

মাসআলা : মলমূত্র ত্যাগ করলে অযু নষ্ট হয়। কুরআন মজীদে এসেছে–

أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ ...

'অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে (পেশাব-পায়খানা করে) আসে...।' (সূরা মায়েদা : ৬)

মাসআলা : বায়ু ত্যাগ করা দ্বারা অযু নষ্ট হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ، فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ : مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ : الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ. {بخارى : من لم ير الوضوء}

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে অবস্থানকারী নামাযের ছওয়াব পেতে থাকে যতক্ষণ না সে 'হাদাস' করে।' একজন অনারব আবু হুরায়রা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করল, 'হাদাস' কী? তিনি বললেন, আওয়াজ অর্থাৎ বায়ু বের হওয়া।' (সহীহ বুখারী : ১/৩০)

মাসআলা : 'মযী' বা 'অদী' নির্গত হলে অযু নষ্ট হয়। এ দুই অবস্থায় গোসল ফরয হয় না, শুধু অযু করাই যথেষ্ট। 'মযী' ও 'অদী'র বিবরণ ১০২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) বলেন—

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ : عَنِ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ. {الترمذى : ما جاء في المني والمذي}

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মযী'র বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, 'মযী'র কারণে অযু এবং 'মনী'র কারণে গোসল জরুরি হয়।' (সুনানে তিরমিযী : ১/১৬)

মাসআলা : নিদ্রা গেলে অযু নষ্ট হয়।

হযরত সাফওয়ান ইবনে 'আসসাল (রা.) বলেন—

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই নির্দেশনা দিতেন যে, সফরের হালতে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত চামড়ার মোযা খোলার প্রয়োজন নেই। তবে গোসল ফরয হলে মোযা খুলবে (এবং গোসল করবে) প্রস্রাব, পায়খানা এবং ঘুমের কারণে মোযা খুলতে হবে না (অযুর সময় মোযার উপর মাসেহ করাই যথেষ্ট হবে)।' (সুনানে তিরমিযী : ১/১৪)

এই হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রস্রাব-পায়খানার মতো নিদ্রাও অযু বিনষ্ট করে।

মাসআলা : দাড়ানো অবস্থায় কিংবা কোনো কিছুতে ঠেস না দিয়ে অথবা নামাযের কোনো অবস্থায় ঘুমালে অযু নষ্ট হয় না।

হযরত আনাস (রা.) বলেন—

كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّؤُوْنَ. (ابو داود : باب الوضوء من النوم)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ইশার নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে থাকতেন। এমনকি নিদ্রার কারণে তাদের মাথা ঝুঁকে যেত। এরপর তারা নামায পড়তেন, (নতুন) অযু করতেন না।'

(সুনানে আবু দাউদ : ১/২৬)

মাসআলা : বমি হলে কিংবা নাক দিয়ে রক্ত পড়লে অযু নষ্ট হয়।

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّأَ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ الْوُضُوءَ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ. {ترمذی : باب الوضوء من القيء والرعاف}

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বমি হল, তিনি এরপর অযু করলেন।'

ইমাম তিরমিযী বলেন, 'অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মত হল, বমি হলে কিংবা নাক দিয়ে রক্ত পড়লে অযু নষ্ট হয়।' (জামে তিরমিযী : ১/১৩)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ لِيُعِدْ وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি নামাযরত অবস্থায় কারো নাক দিয়ে রক্ত আসে তাহলে সে যেন নামায ছেড়ে দেয় এবং রক্ত ধুয়ে ফেলে। তারপর অযু করে এবং নতুন করে নামায আদায় করে'।"

(মুজামে তবারানী : ১১/১৩২, হাদীস নং ১১৩৭৪)

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান লেখেন—

وقئے ورعاف وقلس ناقض وضوست وحديث "قَاءَ فَتَوَضَّأَ" حسن ست

'বমি এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়ার দ্বারা অযু নষ্ট হয়। "قَاءَ فَتَوَضَّأَ" হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।' (বুদূরুল আহিল্লাহ : ৩০)

মাসআলা : ইসতিহাযার রক্ত আসলে অযু নষ্ট হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা.)কে, যিনি ইসতিহাযাগ্রস্ত ছিলেন, আদেশ করেছেন–

ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلٰوةٍ {بخاری : باب غسل الدم}

"প্রতি নামাযের জন্য নতুন অযু করবে।" (সহীহ বুখারী : ১/৩৬)

চামড়ার মোজায় মাসেহ

চামড়ার মোজা যদি টাখনুর উপর পর্যন্ত পা আবৃত করে তাহলে অযুতে এর উপর মাসেহ করা জায়েয। যে সুতি মোজায় চামড়া লাগানো থাকে কিংবা যা চামড়ার মতো শক্ত মোটা কাপড়ের তৈরি তাও পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরামের মতে চামড়ার মোজার স্থলাভিষিক্ত এবং তার উপর মাসেহ করা জায়েয। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করেছেন।

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বলেন—

إِنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ : إِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. (مسلم : المسح على الخفين، بخاری : إذا أدخل رجليه)

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করলেন এবং চামড়ার মোজায় মাসেহ করলেন। মুগীরা (রা.) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অযু অবস্থায় এই মোজা পরিধান করেছি।
(সহীহ বুখারী : ১/৩৩; সহীহ মুসলিম : ১/১৩৪)

আল্লামা মুবারকপুরী বলেন—

اِشْتَرَطُوا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِتِلْكَ الْقُيُوْدِ، لِيَكُوْنَا فِيْ مَعْنَى الْخُفَّيْنِ، وَيَدْخُلَا تَحْتَ أَحَادِيْثِ الْخُفَّيْنِ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا مُجَلَّدَيْنِ كَانَا فِيْ مَعْنَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّهُمَا إِذَا كَانَا مُنَعَّلَيْنِ كَانَا فِيْ مَعْنَاهُمَا، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ إِذَا كَانَا صَفِيْقَيْنِ ثَخِيْنَيْنِ كَانَا فِيْ مَعْنَاهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا مُجَلَّدَيْنِ وَلَا مُنَعَّلَيْنِ.

"ফকীহগণ কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার জন্য ওই বৈশিষ্ট্যগুলোকে শর্ত করেছেন যার মাধ্যমে কাপড়ের মোজা চামড়ার মোজার

স্থলাভিষিক্ত হয় এবং চামড়ার মোজায় মাসেহের অনুমোদনের আওতায় প্রবেশ করে।

"তাঁদের কেউ বলেছেন, 'কাপড়ের মোজায় উপরে-নিচে চামড়া লাগানো থাকলে তা চামড়ার মোজার স্থলাভিষিক্ত হবে।' কারও মত হল, শুধু নিচে চামড়া লাগানো থাকলে তা চামড়ার মোজার স্থলবর্তী হবে। আবার কেউ বলেছেন, শক্ত মোটা কাপড়ের মোজাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

(তুহফাতুল আহওয়াযী : ১/২৮৪)

অন্য স্থানে আল্লামা মুবারকপুরী ফুকাহায়ে কেরামের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত—

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. {بخارى : المسح على الخفين}

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার মোযার উপর মাসেহ করেছেন।' (সহীহ বুখারী : ১/৩৩)

আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বলেছেন, 'চামড়ার মোজায় মাসেহ জায়েয হওয়ার বিষয়ে সকল সাহাবী একমত। এই বিষয়টি সত্তরজনেরও অধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীগণের মধ্যে যাদের সম্পর্কে দ্বিমত পোষণের কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে অন্য সব সাহাবীর সঙ্গে ঐকমত্য পোষণের কথাও বর্ণিত আছে।' (ফাতহুল বারী : ১/৩৫; বাবুল মাসেহ আলাল খুফফাইন)

মাসহের সময়সীমা

মুসাফিরের জন্য প্রতিবার মোজা পরিধানের পর তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত পর্যন্ত মাসেহ করা জায়েয।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত—

جَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. {مسلم : التوقيت في المسح على الخفين}

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য মাসহের সময়সীমা তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন।' (সহীহ মুসলিম : ১/১৩৫)

মাসহের পদ্ধতি

হাতের আঙ্গুলগুলো পানিতে ভেজাবে এবং তিন আঙ্গুল মোজার অগ্রভাগে রেখে উপর দিকে টেনে আনবে।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন—

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. {ابو داود : كيف المسح} قال في التلخيص : إسناده صحيح.

'যদি নিছক যুক্তির ভিত্তিতে দ্বীনী মাসাইল নির্ধারিত হত তাহলে মোজার উপরের অংশে নয়, নিচের অংশে মাসেহ করা হত। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোজার উপরের অংশে মাসেহ করতে দেখেছি।' (সুনানে আবু দাউদ : ১/২২; তালখীস : ১/১৬০)

সাধারণ মোজার উপর মাসহের আলোচনা

সুতি, নাইলন বা উলেন মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নয়। হাদীস শরীফে কিংবা আছারে সাহাবায় কোথাও এ জাতীয় মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি বিদ্যমান নেই। তাই এরূপ মোজার উপর মাসেহ করলে অযু হবে না। অতএব নামাযও হবে না। আল্লামা মুবারকপুরী (রহ.) লেখেন—

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيْ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ حَدِيْثٌ مرفوع صَحِيْحٌ خَالٍ عَنِ الْكَلَامِ، هٰذَا مَا عِنْدِيْ.

'বিচার-বিশ্লেষণের পর আমার সিদ্ধান্ত এই যে, সাধারণ মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে এমন কোনো মারফূ হাদীস পাওয়া যায় না, যাতে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি নেই।' (তুহফাতুল আহওয়াযী : ১/২৮১)

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলিম মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সুতি মোজার উপর মাসেহ জায়েয আছে কি? তিনি উত্তরে বলেন, "এ ধরনের মোজার উপর মাসেহ জায়েয নয়। কেননা এর পক্ষে কোনো দলীল নেই। যারা এর পক্ষে দলীল দিয়েছেন তাদের দলীলগুলো ত্রুটিমুক্ত নয়।" এরপর সে ত্রুটি আলোচনা শেষে লেখেন—

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَةِ الْمَسْئُولَةِ (كَذَا) عَنْهُ دَلِيلٌ : لَا مِنَ الْكِتَابِ وَلَا مِنَ السُّنَّةِ وَلَامِنَ الْإِجْمَاعِ وَلَا مِنَ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ كَمَا عَرَفْتَ.

"মোটকথা, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস তথা শরীয়তের কোনো দলীল দ্বারা এ জাতীয় মোজার উপর মাসহের বৈধতা প্রমাণিত হয় না।"

(মুহাম্মদ নাযীর হুসাইন, ফাতাওয়া নাযীরিয়্যাহ : ১/৩২৭, ৩৩৩)

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সতর্কবাণী অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অযুকারীকে দেখলেন তার পায়ের গোড়ালি শুকনা রয়েছে। তিনি তখন সতর্ক করে বললেন—

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

'এমন শুকনা গোড়ালির জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।'

(সহীহ মুসলিম : ১/১২৪)

শরীয়তের দলীল দ্বারা যেহেতু পাতলা মোজায় মাসহের বৈধতা প্রমাণিত নয় তাই এতে মাসহ করা পা না-ধোয়ার শামিল। অতএব তা হাদীসের উপরোক্ত সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে।●

টীকা : অযুতে সাধারণ মোজার উপর মাসেহ প্রসঙ্গে যেসব রেওয়ায়েত পেশ করা হয় সেগুলো প্রয়োজনীয় আলোচনাসহ পরিশিষ্টে উল্লেখিত হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা ৩১৮

তায়াম্মুম

অযু বা গোসলের জন্য পানি পাওয়া না গেলে কিংবা পানি ব্যবহারে অসুস্থ হওয়ার বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আর তোমরা অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে, অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসলে কিংবা তোমরা স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে অতঃপর পানি না পেলে পবিত্র ভূমিতে তায়াম্মুম করবে। (এটা এভাবে যে,) চেহারা ও হাতে তা থেকে মাসেহ করবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর কষ্ট আরোপ করতে চান না, তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন কর। (সূরা মায়েদা : ৬)

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

তায়াম্মুমের নিয়ত করে দুই হাত (খোলা অবস্থায়) মাটিতে চাপড় দিবে অতঃপর হাত ঝেড়ে মুখমণ্ডল এমনভাবে মাসেহ করবে যেন কোনো জায়গা স্পর্শহীন না থাকে। এরপর পুনরায় দুই হাত দিয়ে মাটিতে চাপড় দিবে এবং হাত ঝেড়ে বাম হাতের তর্জনী থেকে কনিষ্ঠা এই চার আঙ্গুলের ভিতরের অংশ ডান হাতের আঙ্গুলগুলির নিচে রেখে আঙ্গুলের মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসবে। তারপর বাম হাতের তালু ডান হাতের উপরে রেখে কনুই থেকে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে। একই নিয়মে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের আঙ্গুলের মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত এবং কনুই থেকে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত মাসেহ করবে। এরপর দুই হাতের আঙ্গুল পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে খিলাল করবে। আংটি পরা থাকলে তার নিচেও আঙ্গুলের স্পর্শ লাগতে হবে। কেননা হাতের কোথাও চুল পরিমাণ জায়গা স্পর্শহীন থাকলে তায়াম্মুম দুরস্ত হবে না।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত—

جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِضْرِبْ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ، فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. (بيهقى : باب كيف التيمم. و قال : إسناده صحيح).

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার গোসল ফরয হয়েছিল। (কিন্তু পানি না থাকায় আমি) মাটিতে গড়াগড়ি করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এভাবে হাত দিয়ে চাপড় দাও এবং নিজেই দুই হাত দিয়ে ভূমিতে চাপড় দিলেন ও চেহারা মাসেহ করলেন। পুনরায় দুই হাত দিয়ে চাপড় দিলেন এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন।" (সুনানে বায়হাকী : ১/২০৭)

নামাযের ওয়াক্ত

ফজর : সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

জোহর : সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

আসর : জোহরের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

মাগরিব : সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের শুভ্রতা বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত।

ইশা : পশ্চিমাকাশের শুভ্রতা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত।

হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন, "এক ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি দু'দিন আমাদের সঙ্গে নামায পড়বে।' প্রথম দিন মধ্যাহ্নের সূর্য কিছুটা পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর হযরত বিলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে আযান দিলেন অতঃপর ইকামত দিলেন। এরপর সূর্য সাদা থাকা অবস্থায়ই হযরত বিলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে আসরের আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। এরপর সূর্যাস্তের পর মাগরিব এবং পশ্চিমাকাশের আলোক-আভা অস্তমিত হওয়ার পর ইশার নামায পড়লেন।

"দ্বিতীয় দিন হযরত বিলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে জোহরের আযানে বিলম্ব করলেন। রৌদ্রের তাপ অনেকটা ঠাণ্ডা হওয়ার পর জোহরের নামায আদায় করা হল। এরপর আসরের নামাযও বিলম্বিত করা হল এবং সূর্য কিছুটা উচ্চতায় থাকা অবস্থায় নামায আদায় করা হল। এরপর মাগরিব পশ্চিমাকাশের আলোক-আভা অস্তমিত হওয়ার কিছু আগে আদায় করা হল এবং ইশা রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করা হল। ফজরের নামায চারদিক ভালোভাবে ফর্সা হওয়ার পর আদায় করা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই প্রশ্নকারীকে ডাকলেন। সাহাবী উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই দুই সময়ের মধ্যেই তোমাদের নামাযের সময় নির্ধারিত'।"

(সহীহ মুসলিম : আওকাতুস সালাওয়াতিল খাম্‌স)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাফে' থেকে বর্ণিত—

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا أُخْبِرُكَ، صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ يَعْنِي الْغَلَسَ. {موطا مالك : باب وقوت الصلاة}

"তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.)কে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, 'হাঁ, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে অবহিত করব। তুমি জোহরের নামায আদায় করবে যখন তোমার ছায়া তোমার সমান হয়। এরপর যখন ছায়া তোমার দ্বিগুণ হবে তখন আসরের নামায পড়বে। সূর্য অস্ত গেলে মাগরিব এবং রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার আগে ইশার নামায পড়বে। আর ফজরের নামায আঁধার থাকতেই আদায় করবে'।" (মুয়াত্তা মালেক : পৃষ্ঠা ৩)

জোহরের নামাযের মাসনূন ওয়াক্ত

নামাযের পুরো সময়ের আলোচনার পর এবার নামাযের উত্তম সময় উল্লেখিত হল। ঠাণ্ডা মওসুমে জোহরের নামায সূর্য ঢলার পর তাড়াতাড়ি আদায় করা এবং গরমকালে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস পাওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা সুন্নত।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গরমকালের নামায

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) বলেন—

أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، فَقَالَ : أَبْرِدْ، أَبْرِدْ، أَوْ قَالَ : اِنْتَظِرْ، اِنْتَظِرْ، وَقَالَ : شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، حَتّٰى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ. {بخارى : باب إبراد الظهر في شدة الحر}

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন জোহরের আযান দিতে প্রস্তুত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'গরম কমুক গরম কমুক অথবা বললেন, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর।' আরো বললেন, 'গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের প্রভাবে হয়। তাই যখন গরম বৃদ্ধি পায় তখন শীতল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।' (সাহাবী বলেন, আমরা এ নিয়মেই নামাযকে বিলম্বিত করতাম) টিলাসমূহের ছায়া প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত।" (সহীহ বুখারী : ১/৭৬)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. {مسلم : استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر}

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন গরমের তীব্রতা বেড়ে যায় তখন নামাযকে বিলম্বিত কর। কেননা, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের প্রভাবে হয়'।" (সহীহ মুসলিম : ১/২২৪)

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, "এ বিষয়ক হাদীস হযরত আবু সাঈদ (রা.), হযরত আবু যর (রা.), হযরত ইবনে উমর (রা.), হযরত মুগীরা (রা.), হযরত সাফওয়ান (রা.), হযরত আবু মূসা (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত আনাস (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।"

(জামে তিরমিযী : তাখীরুয যোহর ১/২৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঠাণ্ডা মওসুমের নামায

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ- قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ . {ترمذى : ما جاء في التعجيل بالظهر}

"যখন সূর্য ঢলে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায আদায় করলেন।" (জামে তিরমিযী : ১/২২)

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আনাস (রা.) বলেন—

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. {نسائى : تعجيل الظهر في البرد}

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের নিয়ম এই ছিল যে, গরম কালে গরমের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ার পর আদায় করতেন আর ঠাণ্ডায় তাড়াতাড়ি আদায় করতেন।" (সুনানে নাসায়ী : ১/৫৮)

জোহর নামাযের ওয়াক্ত বিষয়ক সকল হাদীস সামনে রাখলে পরিষ্কার হয় যে, ঠাণ্ডা মওসুমে জোহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা এবং গরমকালে

বিলম্ব করা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। কিন্তু ইলমে হাদীসের সঙ্গে সম্পর্কের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও কিছু মানুষ ঠাণ্ডা-গরম সব মওসুমেই জোহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায়ের পক্ষপাতী।

অনেক গায়রে মুকাল্লিদ আলিমও তাদের এই মতের সঙ্গে একমত হননি। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের পুত্র প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ লেখক মাওলানা নূরুল হাসান খান লেখেন—

وافضل اوقات اول وقت هر نمازست مگر آنچه دليل بتخصيص پرداخته مثل تاخير عشاء و ابراد ظهر درحر.

"সব নামায ওয়াক্তের প্রথমাংশে আদায় করা উত্তম, তবে যে নামাযে ব্যতিক্রমের দলীল রয়েছে তা এই মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ইশার নামায বিলম্বিত করা এবং গরমকালে জোহরের নামায বিলম্বে আদায় করা।"

(আন-নাহজুল মাকবূল : ২৩)

আল্লামা ওহীদুযযামান (রহ.) লেখেন—

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إِلَّا صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا عِنْدَ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ، وَإِلَّا صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَيُبْرِدُ بِهَا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ.

"ওয়াক্তের প্রথমাংশেই নামায আদায় করা উত্তম। তবে ইশার নামায বিলম্বে পড়া যদি কষ্ট না হয় এবং গরমকালে পরিবেশ ঠাণ্ডা হলে জোহর আদায় করা উত্তম।" (নুযুলুল আবরার : ১/৫৭)

আসরের নামাযের মাসনূন ওয়াক্ত

প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতীত (অর্থাৎ সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকা অবস্থায় যে ছায়া থাকে) দ্বিগুণ হলে আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে। তবে সূর্য নিচু হয়ে হলদে বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত আসরের নামায বিলম্বিত করা মাকরূহ।

হযরত আলী ইবনে শায়বান (রা.) বলেন—

قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَادَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً. (أبو داؤد : باب وقت العصر)

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মদীনায় আগমন করলাম। তিনি আসরের নামায বিলম্বিত করতেন যে পর্যন্ত সূর্য পরিষ্কার সাদা থাকে।" (সুনানে আবু দাউদ : ১/৫৯)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন—

صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ.

{موطا مالك : وقوت الصلاة}

"যখন তোমার ছায়া তোমার সমান হয় তখন জোহরের নামায পড় আর যখন তা তোমার দ্বিগুণ হয় তখন আসরের নামায পড়।" (মুয়াত্তা মালিক : ৩)

হযরত আনাস (রা.) বলেন—

كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلٰى قُبَاءَ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. {مسلم : استحباب التبكير بالعصر}

"আমরা আসরের নামায পড়তাম। এরপর কেউ কুবা পল্লীতে গেলে সে সূর্য উপরে থাকা অবস্থায়ই তাদের কাছে পৌছতে পারত।" (সহীহ মুসলিম : ১/২২৫)

মাগরিবের নামাযের মাসনূন ওয়াক্ত

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিবের নামায আদায় করা মাসনূন। বিনা ওজরে বিলম্ব করা মাকরূহ।

হযরত সালামা (রা.) বলেন—

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. {بخاری : وقت المغرب}

"সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথেই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মাগরিবের নামায আদায় করতাম।" (সহীহ বুখারী : ১/৭৯)

ইশার নামাযের মাসনূন ওয়াক্ত

রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইশার মুস্তাহাব সময়। এর মধ্যে যতটা বিলম্বিত করা যায়, তা-ই মাসনূন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ. (ترمذى : تاخير صلاة العشاء. وقال : حسن صحيح)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "উম্মতের কষ্ট হওয়ার ভয় যদি আমার না হত তাহলে আমি তাদেরকে আদেশ করতাম, তারা যেন ইশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক পর্যন্ত বিলম্বিত করে।"

(সুনানে তিরমিযী : ১/২৩)

ফজরের নামাযের মাসনূন ওয়াক্ত

ফজরের নামাযের ওয়াক্ত সুবহে সাদিক থেকে আরম্ভ হয় এবং সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত থাকে। এই সময়টুকুকে দুই ভাগে ভাগ করা হলে শরীয়তের পরিভাষায় প্রথম ভাগকে 'গালাস' এবং দ্বিতীয় ভাগকে 'ইসফার' বলা হবে। অধিকাংশ সময়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইসফারে' নামায পড়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, 'ইসফারে' নামায পড়ার ছওয়াব বেশি।

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ. {ترمذى : ما جاء في الإسفار بالفجر وقال : حديث حسن صحيح)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা ফজরের নামায ফর্সা করে পড়। কেননা এর ছওয়াব অনেক বেশি।"

(জামে তিরমিযী : ১/২২)

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান লিখেছেন—

پس بدرستیکه اسفار به فجر بزرگ ترست برائے فرد و ثواب شما زیراکه ثواب نماز بقدر ثواب جماعت ست وجماعت در اسفار زیاده می باشد از تغلیس غالبا

"ফজরের নামায ফর্সা করে আদায় করা উত্তম। কেননা, নামাযের ছওয়াব জামাত অনুপাতে হয়। আর ফর্সা করে নামায পড়লে জামাতে মুসল্লী বেশি হয়ে থাকে।" (মিসকুল খিতাম : ১/২৪৩)

উম্মাহর পূর্বসূরীদের আমল

ইমাম তিরমিযী বলেন—

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِىِّ، وَجَابِرٍ، وَبِلَالٍ، وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ الْإِسْفَارَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ.

"হযরত রাফে (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস হযরত আবু বারযা আসলামী (রা.), জাবির (রা.) ও বিলাল (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী ফজরের নামায ফর্সা করে পড়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।" (জামে তিরমিযী : ১/২২)

মাকরূহ ওয়াক্ত

নিম্নোক্ত সময়গুলোতে নামায পড়া মাকরূহ।

১. ফজরের নামায পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত সব ধরনের নফল নামায পড়া মাকরূহ, তবে পিছনের কাযা নামায আদায় করা যাবে।

২. সূর্যোদয়ের পর থেকে আনুমানিক বিশ মিনিট পর্যন্ত নফল নামায পড়া মাকরূহ। এ সময় ফরজ নামাযের কাযা আদায় করাও জায়েয নয়।

৩. সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকা অবস্থায় সব ধরনের নফল ও ফরজ নামায পড়া মাকরূহ।

৪. আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য হলুদ হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের নফল নামায পড়া মাকরূহ।

৫. সূর্য পশ্চিমাকাশে হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের নফল ও ফরয নামায পড়া মাকরূহ।

হযরত আমর ইবনে আবাসা আসসুলামী (রা.) বলেন—

فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ. قَالَ : صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلٰوةِ، فَإِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ

الصَّلوٰةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. {مسلم : الأوقات التي نهي عن الصلوة فيها}

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, আল্লাহর রাসূল! আমি যা জানি না এবং আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন এমন বিষয় থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। আমাকে নামায সম্পর্কে শিক্ষা দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ফজরের নামায আদায় করবে। তারপর সূর্য পূর্বাকাশে উঁচু হওয়া পর্যন্ত নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যখানে উদিত হয় এবং সে সময় কাফেররা সূর্যকে সিজদা করে।

'যখন সূর্য উঁচু হয় তখন নামায পড়বে। কেননা, নামায আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। এরপর যখন বর্শার ছায়া সংক্ষিপ্ত হয় (অর্থাৎ সূর্য মধ্যগগনে উঠে আসে) তখন নামায পড়বে না। কেননা, এ সময় জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয়। এরপর যখন ছায়া দীর্ঘ হতে আরম্ভ করে তখন *নামায পড়বে। মনে রাখবে,* সকল নামায আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হয়। আসরের নামায পড়া হলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামায পড়বে না। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যে অস্ত যায় এবং সে সময় (সূর্যপূজারী) কাফেররা সূর্যকে সিজদা করে'।"

(সহীহ মুসলিম : ১/২৭৬)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন—

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

{بخاری : لا يتحرى الصلاة قبل الغروب}

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, ফজরের নামাযের পর সূর্য উঁচু হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো নামায নেই এবং আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্তও কোনো নামায নেই।" (সহীহ বুখারী : ১/৮২)

টীকা : সূর্যোদয়ের সময় প্রত্যেক জনপদের বড় শয়তান এমনভাবে দাড়ায় যে, সূর্য তার দুই শিংয়ের মধ্যখান দিয়ে উদিত হতে দেখা যায়। তখন সে অন্যান্য জিন ও শয়তানদের কাছে অহংকার করে যে, সূর্যপূজারীরা তাকেই সিজদা করছে।

আযান

আযানের গুরুত্ব ও ফযীলত

হযরত তালহা ইবনে ইয়াহইয়া তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে—

كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. {مسلم : باب فضل الأذان}

"আমি মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় মুয়াজ্জিন এসে তাঁকে নামাযের বিষয়ে অবহিত করল। মুয়াবিয়া (রা.) বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আযান দানকারীদের গ্রীবা (শির) কিয়ামতের দিন সবচেয়ে উঁচু হবে'।" (সহীহ মুসলিম : ১/১৬৭)

আযানের ইতিহাস

মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, কীভাবে নামাযের সময় সবাইকে একত্র করা যায়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের রীতির অনুকরণে একেকজন একেক পরামর্শ দিলেন। কেউ উঁচু জায়গায় আগুন জ্বালানোর পরামর্শ দিলেন। কেউ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে কিংবা গলিতে গলিতে নামাযের ঘোষণা দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কেউ "নাকূছ" (এক ধরনের যন্ত্র) বাজানোর পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পন্থা অনুমোদন করলেন না। এ সময় একরাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) ও অন্য কতিপয় সাহাবীকে স্বপ্নে "আযানে"র দৃশ্য দেখানো হল। তাঁরা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পদ্ধতি পছন্দ করলেন এবং হযরত বিলাল (রা.)কে সেভাবে আযান দেওয়ার আদেশ করলেন।

এই পন্থা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েছিল। কুরআন কারীমের সমর্থন দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ

"এবং যখন তোমরা নামাযের দিকে আহ্বান কর তখন তারা (এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার বদলে) একে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বিষয় বানিয়ে নেয়। এটা এজন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করে না।"

(সূরা মায়েদা : ৫৮)

আযানের বাক্য

আযানের বাক্যসমূহ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দেশিত। সাহাবী স্বপ্নে আযান দেখার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পছন্দ করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় হারাম শরীফে আযানের এ বাক্যগুলোই ধ্বনিত হত। সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের আযান হারাম শরীফের আযানের অনুরূপ ছিল। তারা তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সংযোজন-বিয়োজন ঘটাননি।

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য এবং ওলী-আল্লাহ ও ফুকাহায়ে কেরামের অনুসরণই আমাদের নাজাতের পথ। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত এই মতাদর্শে বিশ্বাস করে। তাই আমাদের সেভাবেই আযান দিতে হবে যা সুন্নতসম্মত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। কিছু শিয়া মতাবলম্বী আযানের মধ্যে এবং কতক বিদআতপন্থী আযানের শুরুতে যা কিছু নতুন করে সংযোজন করেছে, কুরআন-সুন্নাহ্তে এসবের কোনো ভিত্তি নেই।●

মাসনূন আযান

আযানের মাসনূন শব্দগুলো এই–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ   اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ   أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ   أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ   حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ   حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

● এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন পরিশিষ্টে। পৃষ্ঠা ৩২৪

اَللّٰهُ أَكْبَرُ   اَللّٰهُ أَكْبَرُ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাযেদ (রা.) থেকে বর্ণিত—

لَمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهٖ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِيْ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِيْ يَدِهٖ، فَقُلْتُ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ، أَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ؟ قَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ؟ فَقُلْتُ : نَدْعُوْ بِهٖ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ : أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهٗ : بَلٰى، فَقَالَ : تَقُوْلُ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ. اَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ. لَآ إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. {ابو داود : باب كيف الأذان، وقال الزيلعي : هذا ثابت صحيح}

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে লোকদেরকে জমায়েত করার জন্য "নাকূছ" বানানোর আদেশ দিলেন তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি "নাকূছ" হাতে আমার কাছ দিয়ে হেঁটে চলেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি "নাকূছটি" বিক্রি করবে ? সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এটা দিয়ে কী করবে ? আমি বললাম, এটি বাজিয়ে মানুষকে নামাযের জন্য একত্র করব। সে বলল, আমি কি এরচেয়ে উত্তম পদ্ধতি তোমাকে বলব ? আমি বললাম, অবশ্যই। সে বলল, তুমি এভাবে মানুষকে আহ্বান করবে–

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়। ৪ বার।

اَشْهَدُ اَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। ২ বার।

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। ২ বার।

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

অর্থ : নামাযের দিকে এস। ২ বার।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

অর্থ : কল্যাণের দিকে এস। ২ বার।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়। ২ বার।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। ১ বার। (সুনানে আবু দাউদ : ১/৭১-৭২)

ফযরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর পরে দুই বার اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলতে হবে।

হযরত আবু মাহযূরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ : اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. {ابو داود : كيف الأذان. وقال العظيم آبادى : حديث صحيح}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ফযর নামাযের আযান যখন দিবে তখন বলবে اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ দুইবার।" (সুনানে আবু দাউদ : ১/৭২)

হযরত আনাস (রা.) বলেন—

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ : اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (بيهقى : باب التثويب في أذان الصبح، وقال : إسناده صحيح)

'সুন্নাহ এই যে, ফযরের আযানে মুয়াজ্জিন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর পরে বলবে اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ।' (সুনানে বায়হাকী : ১/৪২৩)

আযানের জওয়াব

আযানের সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলে আযানের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং মুয়াজ্জিনের সঙ্গে বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ. {بخارى : باب ما يقول إذا سمع المنادى، مسلم : باب استحباب القول مثل قول المؤذن.}

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন তোমরা আযান শুনবে তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও তা-ই বলবে'।"

(সহীহ বুখারী : ১/৮৬; সহীহ মুসলিম : ১/১৬৬)

আযানের পরের দু'আ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي.

(بخارى : باب الدعاء عند النداء)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে আযান শুনে বলবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدعوةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَهُ.

সে আমার শাফায়াত লাভ করবে। (সহীহ বুখারী : ১/৮৬)

ইকামত

ইকামতের মাসনূন বাক্যগুলো এই–

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ.

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

রাসূলুল্লাহর মুয়াজ্জিনগণের আমল এমনই ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন হযরত আবু মাহযূরা (রা.) বলেছেন—

عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً

‘(স্বয়ং) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সতেরো বাক্যে ইকামত শিক্ষা দিয়েছেন।’ (তবারী : ১/১০০–১০২)

ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত আবু মাহযূরা (রা.) থেকে যে মারফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতেও সতেরো বাক্যের কথা আছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে “সহীহ” বলেছেন। (জামে তিরমিযী : ১/৪৮)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর মুয়াজ্জিন হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.)-এর আমলও এটাই ছিল।

উবাইদ (রহ.) বলেন—

إِنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ كَانَ يُثَنِّي الْإِقَامَةَ. {طحاوي : الاقامة كيف هو}

'সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) ইকামতের বাক্যগুলো (أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ থেকে اَللّٰهُ أَكْبَرُ পর্যন্ত) দুই বার করে বলতেন।' (তহাবী শরীফ : ১/১০২)

৩. হযরত বিলাল (রা.)-এর পরবর্তী আমলও এমন ছিল। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহ.) বলেন—

إِنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ، وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ. {مصنف عبد الرزاق. إسناده صحيح، آثار السنن ١/٥٣}

'হযরত বিলাল (রা.) আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো দুই বার করে বলতেন।' (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ১/৪৬২)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত বিলাল (রা.)-এর পূর্ববর্তী আমলের বিবরণ সহীহ মুসলিমে এসেছে। হযরত আনাস (রা.) বলেন—

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوْتِرَ الْإِقَامَةَ. {مسلم : الأمر بشفع الأذان}

'বিলাল (রা.)কে আযানের বাক্যগুলো দুই বার করে এবং ইকামতের বাক্যগুলো এক বার করে বলার আদেশ দেওয়া হয়েছে।' (সহীহ মুসলিম : ১/১৬৪)

আযান-ইকামতের সূচনাকালে বিলাল (রা.)কে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই নিয়ম মানসূখ হওয়ার পর তিনিও জীবনের শেষ পর্যন্ত ইকামতের বাক্যগুলো দুই বার করে বলতেন।

ইমাম তহাবী (রহ.) বলেন—

ثُمَّ ثَبَتَ هُوَ مِنْ بَعْدُ عَلَى التَّثْنِيَةِ فِي الْإِقَامَةِ بِتَوَاتُرِ الْآثَارِ فِي ذٰلِكَ، فَعُلِمَ أَنَّ ذٰلِكَ هُوَ مَا أُمِرَ بِهِ. (طحاوى : الإقامة كيف هي)

'অতঃপর হযরত বিলাল (রা.) ইকামতের বাক্যগুলো দুই বার করেই বলতেন, যা বহু সংখ্যক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত। এ থেকে বোঝা যায়, হযরত বিলাল (রা.) এই নিয়ম অনুসরণে আদিষ্ট হয়েছিলেন।' (তহাবী শরীফ : ১/১০২)

খোদ আল্লামা শাওকানীও আবু মাহযূরাহ (রা.)-এর হাদীসের ভিত্তিতে বিলাল (রা.)-এর পূর্ববর্তী আমলকে মানসূখ বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন—

وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيْثِ بِلَالٍ الَّذِيْ فِيْهِ الْأَمْرُ بِإِيْتَارِ الْإِقَامَةِ، لِأَنَّهُ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، لِأَنَّ أَبَا مَحْذُوْرَةَ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ، وَبِلَالًا أُمِرَ بِإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ أَوَّلَ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ فَيَكُوْنُ نَاسِخًا. وَقَدْ رَوَى أَبُو الشَّيْخِ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ بِمِنًى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَأَقَامَ مِثْلَ ذٰلِكَ. إِذَا عَرَفْتَ هٰذَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ أَحَادِيْثَ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ صَالِحَةٌ لِلْاِحْتِجَاجِ بِهَا لِمَا أَسْلَفْنَاهُ وَأَحَادِيْثُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَصَحَّ مِنْهَا لِكَثْرَةِ طُرُقِهَا وَكَوْنِهَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ لٰكِنْ أَحَادِيْثُ التَّثْنِيَةِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الزِّيَادَةِ، فَالْمَصِيْرُ إِلَيْهَا لَازِمٌ لَاسِيَّمَا مَعَ تَأَخُّرِ تَارِيْخِ بَعْضِهَا كَمَا عَرَّفْنَاكَ.

"হযরত আবু মাহযূরা (রা.)-এর বর্ণনায় পরবর্তী সময়ের বিধান বিধৃত হয়েছে। কেননা, হযরত আবু মাহযূরা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন ফাতহে মক্কার সময়। অতএব বলতে হয় যে, হযরত বিলাল (রা.)কে ইকামতের বাক্য এক বার করে বলার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা ছিল আযান-ইকামতের সূচনাকালের বিষয় এবং আবু মাহযূরা (রা.)-এর হাদীস তা মানসূখ করেছে। আবুশ শায়খের বর্ণনায় এসেছে যে, স্বয়ং বিলাল (রা.)ও মিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো দুই বার করে বলেছেন।

"সারকথা এই যে, যে হাদীসে ইকামতের বাক্যগুলো দুই বার করে বলার কথা এসেছে তা প্রমাণ গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত। আর এক বার করে বলার হাদীস যদিও অধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সহীহ বুখারী-সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান রয়েছে, সে হিসেবে তা অধিক সহীহ, কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে, দুই বার বলার হাদীসে অধিক বিষয় আছে আর তা পরবর্তী সময়ের বিধান সম্বলিত বলে জানা যাচ্ছে। অতএব এই বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে।" (নায়লুল আওতার : ২/২২)

ইকামতের জওয়াব

ইকামতের জওয়াবে ইকামতের বাক্যগুলোই বলতে হয়। শুধু قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ শব্দে ব্যতিক্রম হবে।

আবু উমামাহ (রা.) বলেন—

إِنَّ بِلاَلاً أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا اللّٰهُ، وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي الْأَذَانِ. (ابو داود : ما يقول إذا سمع الإقامة)

"হযরত বিলাল (রা.) ইকামত শুরু করলেন। যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বাক্যে পৌঁছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا اللّٰهُ এছাড়া অন্যান্য বাক্যের জওয়াব আযানের মতোই দিয়েছেন।" আযানের জওয়াবের বিবরণ হযরত উমর (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে। (সুনানে আবু দাউদ : ১/৭৮)

বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করা

মাসনূন আযান, মাসনূন ইকামত এবং আযান-ইকামতের সময় অন্যদের করণীয়– এই তিন বিষয়ে উপরে আলোচনা হয়েছে।

আযান-ইকামতের নিয়ম-নীতি যেমন নির্ধারিত তেমনি আযান-ইকামতের সময় অন্যদের করণীয় কী তা-ও নির্ধারিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের আলোকে তা নির্ধারিত হয়েছে। নবীজীর এই শিক্ষার সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজন করা কোনোভাবেই বৈধ নয় এবং তা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পরিচয় হতে পারে না। কেননা, এই নতুন সংযোজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবীর শামিল। কিন্তু কোনো কোনো বিদআতপন্থীকে দেখা যায় যে, তারা আযান-ইকামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম উচ্চারিত হওয়ার সময় আঙুলে চুমু দেয়। হাদীস শরীফের কোথাও এই নিয়ম পাওয়া যায় না।●

● এ প্রসঙ্গে কিছু বানানো গল্প বর্ণনা করা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরিশিষ্টে দেখুন। পৃষ্ঠা ৩৩২

নামাযের মাসনূন নিয়ম

প্রথমে কিবলামুখী হয়ে দাড়ান এবং যে নামায পড়ার ইচ্ছা করেছেন মনে মনে তার নিয়ত করুন। যেমন, আমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ফজরের নামায পড়ছি। এবার উভয় হাত কান পর্যন্ত ওঠান। হাতের তালু ও আঙুল কিবলামুখী থাকবে এবং আঙুলগুলো কানের লতি বরাবর নিচে থাকবে। এবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নাভির নিচে হাত বাঁধুন। ডান হাত বাম হাতের উপর থাকবে এবং দৃষ্টি সাজদার স্থানে নিবদ্ধ থাকবে। এবার অনুচ্চস্বরে 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' পড়ুন এবং 'আউযুবিল্লাহ...', 'বিসমিল্লাহ...' পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ুন। এরপর অনুচ্চস্বরে আমীন বলে অন্য একটি সূরা কিংবা একটি বড় আয়াত বা ছোট তিন আয়াত তেলাওয়াত করুন। ইমামের পিছনে নামায পড়লে 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা...'র পর কিরাত পড়া যাবে না।

এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে রুকূ করুন। রুকূতে পিঠ সোজা থাকবে এবং হাতের আঙুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে শক্ত করে হাটু ধরতে হবে। রুকূতে তিন বার বা পাঁচ বার তাসবীহ পড়ুন। এরপর 'সামিআল্লা...' বলতে বলতে সোজা হয়ে দাড়ান এবং 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলুন। ইমামের পিছনে থাকলে ইমাম 'সামিআল্লাহু...' বলবেন আর মুক্তাদী শুধু 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে সাজদায় যান। সাজদায় যথাক্রমে দুই হাটু, দুই হাত, নাক এবং সবশেষে কপাল ভূমিতে রাখুন। হাতের আঙুলগুলো কিবলামুখী থাকবে। কনুই পাঁজর থেকে এবং পেট উরু থেকে আলাদা থাকবে। কনুই ভূমিতে বিছানো যাবে না। সাজদায় তিন বার বা পাঁচ বার তাসবীহ পড়ুন। এরপর যথাক্রমে কপাল, নাক এবং সবশেষে হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতে বলতে বসুন। এরপর পুনরায় তাকবীর বলতে বলতে দ্বিতীয় সাজদা করুন। এরপর তাকবীর বলতে বলতে উঠুন। ওঠার সময় যথাক্রমে কপাল, নাক, হাত সবশেষে হাটু ভূমি থেকে উঠিয়ে সোজা দাড়িয়ে যান। দাড়িয়ে হাত বাঁধুন এবং 'বিসমিল্লাহ...' সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ুন। ইমামের পিছনে হলে কিরাত পড়বেন না।

এরপর পূর্বের নিয়মে রুকূ, কাওমা, সাজদা, জলসা এবং দ্বিতীয় সাজদা করুন। সাজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসুন এবং ডান পা খাড়া রাখুন ও দুই হাত উরুর উপর রাখুন। (হাতের আঙুলের অগ্রভাগ হাটু বরাবর থাকবে) এবার 'আত্তাহিয়্যাতু...' পড়ুন। "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পর্যন্ত

পৌঁছলে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে গোলক তৈরি করুন, কনিষ্ঠা ও অনামিকা মুড়ে তালুর সাথে লাগিয়ে রাখুন এবং তর্জনী উঠিয়ে ইশারা করুন। 'লা-ইলাহা' বলার সময় তর্জনী উঠবে 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় নামবে। এরপর বৈঠকের শেষ পর্যন্ত ডান হাত এ অবস্থাতেই থাকবে। দুই রাকাআত বিশিষ্ট নামায হলে 'আত্তাহিয়্যাতু' শেষ হওয়ার পর দরূদ শরীফ পড়ুন। এরপর দুআ পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করুন। যদি তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায হয় তাহলে 'আত্তাহিয়্যাতু'র পর দরূদ শরীফ না পড়ে তাকবীর বলতে বলতে দাড়িয়ে যান। এরপর এক রাকাআত কিংবা দুই রাকাআত পড়ে নামায শেষ করুন।

ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া জরুরী নয়। তবে সুন্নত ও নফল নামাযে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতেও সূরা মিলানো জরুরী।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিশদভাবে ও দলীলসহ উল্লেখ করছি।

কাপড় পরিধান করা

পুরুষের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত এবং নারীর মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা ছাড়া গোটা শরীর হল সতর। নামাযে সতর আবৃত রাখা জরুরী। এছাড়া নামায হবে না। আল্লাহ তাআলা আদেশ করেন—

يَا بَنِيٓ آدَمَ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

'হে আদম-সন্তান! গ্রহণ কর তোমাদের পোষাক প্রতি নামাযের সময়।' (সূরা আরাফ : ৩১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ. {بخارى : ما يذكر في الفخذ}

'উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।' অর্থাৎ তা আবৃত রাখা জরুরী। (সহীহ বুখারী : ১/৫৩)

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ. (بخارى : إذا كان الثوب ضيقا)

"কাপড় যদি বড় হয় তাহলে গোটা শরীর আবৃত কর আর যদি ছোট হয় তাহলে লুঙ্গির মতো পরিধান কর।" (সহীহ বুখারী : ১/৫২)

উল্লেখ্য যে, নামাযের জন্য পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা উচিত।

মাথা আবৃত করা

নামাযের অন্যতম আদব হল, পূর্ণ পোষাক পরিধান করে নামায আদায় করা। নামাযের বাইরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে মাথা আবৃত রাখা উচিত। অপারগতাবশত খোলা মাথায় নামায পড়লে নামায হয়ে যায়, কিন্তু কাপড় থাকা সত্ত্বেও এভাবে খোলা মাথায় নামায পড়া কিংবা খোলা মাথায় থাকা সুন্নত-পরিপন্থী।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত—

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ ... (شمائل ترمذى، باب ما جاء فى تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় শির মোবারক আবৃত রাখতেন।" (শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা ৯)

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলিম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন, "নামাযের সুন্নাহ্সম্মত ও বিশুদ্ধ পন্থা হল যেভাবে সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছেন। অর্থাৎ শরীর আবৃত করে এবং টুপি বা পাগড়ি দ্বারা মাথা ঢেকে।" (ফাতাওয়া ছানাইয়্যাহ : ১/৫২৫)

মাওলানা আবু সায়ীদ শরফুদ্দীন লিখেছেন, "(খোলা মাথায়) নামায পড়লে নামায হয়ে যায়, তবে উত্তম হল মাথা ঢেকে রাখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় নামাযে টুপি বা পাগড়ি পরিহিত থাকতেন।... এক শ্রেণীর মানুষকে দেখা যায়, তারা ঘর থেকে টুপি বা পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মসজিদে আসে, কিন্তু নামাযের সময় টুপি-পাগড়ি খুলে নামায পড়ে। এভাবে খোলা মাথায় নামায পড়া নাকি সুন্নত! এটা একদম ভুল কথা। এই নিয়ম কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত নয়। একে সরাসরি নাজায়েয বলা না গেলেও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিনা কারণে এভাবে মাথা খোলা রাখাকে পরিচিতি-চিহ্ন বানিয়ে দেওয়া খেলাফে সুন্নত ও নির্বুদ্ধিতা।"

(ফাতাওয়া ছানাইয়্যাহ : ১/৫২৩)

মাওলানা গযনবী লিখেছেন, "খোলা মাথায় নামায পড়া যদি ফ্যাশনের উদ্দেশ্যে হয় তবে নামায মাকরূহ হবে। খুশু-খুযুর উদ্দেশ্যে হলে তাতে

খৃষ্টানদের সাযুজ্য গ্রহণ করা হয়। কেননা, ইসলামে খুশু বা বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাথা খোলা রাখার বিধান কেবল ইহরামের হালতে রয়েছে, অন্য সময় নেই। আর যদি মাথা খোলা রাখার কারণ হয় আলসেমী তবে তা মুনাফিকদের অভ্যাস। মোটকথা, সর্বাবস্থাতেই বিষয়টি অপছন্দনীয়।"

(ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস : ৪/২৯১)

কিবলামুখী হওয়া

নামাযে কিবলামুখী হওয়া ফরয। মুসলমানদের কিবলা হল বায়তুল্লাহ। নামাযে বায়তুল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"আমি অবশ্যই দেখি আপনার মুখমণ্ডল বার বার আকাশের দিকে ফিরে যাওয়া। সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিব, যা আপনি পছন্দ করেন। এবার আপনার মুখ ফেরান মসজিদে হারামের দিকে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকেই মুখ ফেরাবে।" (সূরা বাকারা : ১৪৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ. {مسلم : واجبات الصلاة}

"যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করবে তখন ভালোভাবে অযু কর এবং কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াও।..." (সহীহ মুসলিম : ১/১৭০)

নামাযের জন্য অযু করা, শরীর-কাপড়-স্থান পবিত্র হওয়া ইত্যাদির মতো কিবলামুখী হওয়াও একটি বুনিয়াদী শর্ত। কুরআনের উপরোক্ত আদেশ– তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকেই মুখ ফেরাও– থেকে এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুমান করা যায়। এজন্য কিবলার দিক থেকে এক মুহূর্তের জন্যও ফিরে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। বাস, রেল, লঞ্চ-স্টিমার ইত্যাদিতে সফর করার সময়ও কিবলামুখী হওয়া এবং নামাযের অন্যান্য শর্তের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী। এসবের কোনো একটি ছুটে গেলে নামায হবে না।

কেউ কেউ গাড়িতে নামায পড়ার জন্য তায়াম্মুম করে থাকে। অথচ নামাযের ওয়াক্তের ভিতরে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম বৈধ নয়। সফরের সময় যদি মনে হয়, রাস্তায় পানি পাওয়া যাবে না, তাহলে সফরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মতো পানিও সঙ্গে রাখা উচিত। তদ্রূপ কেউ কেউ

কিবলামুখী না হয়েই নামায পড়ে ফেলে। এভাবে নামায হবে না। অনেকে বসে বসে ইশারায় পড়ে। এভাবেও নামায হবে না। ফরয নামায দাড়িয়ে আদায় করা ফরয এবং নামাযের সব রোকন সঠিক ও পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করাও জরুরী। ইশারায় শুধু তখনই নামায পড়া যায় যখন অন্য কোনোভাবে নামায পড়া সম্ভব হয় না। অথচ ওযর ছাড়াই মানুষ বসে বসে নামায আদায় করে। কেননা, সফরের জন্য এমন সময় নির্বাচন করা যায় যাতে নামাযের কোনো অসুবিধা না হয়। এরপর নামাযের জন্য বাস থামাতে ড্রাইভারকে অনুরোধ করা যায়। (আমাদের দেশে সাধারণত ড্রাইভাররা নামাযী মানুষের অনুরোধ রাখেন। কোনো কোনো বাস-কোম্পানির টিকেটের গায়ে নামাযের বিরতির কথা লেখাও থাকে) এর কোনোটাই যদি সম্ভব না হয় তাহলে বিভিন্ন স্টপেজে বাস যখন থামে তখন ফরয নামাযটুকু সহজেই আদায় করা যায়।

দাড়িয়ে নামায পড়া

সুস্থ ব্যক্তির জন্য দাড়িয়ে নামায পড়া জরুরী। কেউ যদি দাড়িয়ে পড়তে অপারগ হয়, তাহলে বসে পড়তে পারবে। বসে পড়তে অপারগ হলে শায়িত অবস্থায় পড়বে এবং রুকুর তুলনায় সাজদায় মাথা বেশি ঝুকাবে। যদি এভাবেও নামায পড়া সম্ভব না হয় তাহলে নামায বিলম্বিত করার অনুমতি রয়েছে। কেননা, এরপরে নামাযের আর কোনো পদ্ধতি নেই। শুধু চোখের ইশারায় নামায হয় না।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন—

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ.

(بخاری : إذا لم يطق قاعدا...)

"দাড়িয়ে নামায পড়। যদি তাতে অপারগ হও তবে বসে আদায় কর। তাতেও অপারগ হলে শুয়ে আদায় কর।" (সহীহ বুখারী : ১/১৫০)

তবে নফল নামায সুস্থ অবস্থাতেও দাড়িয়ে এবং বসে দুইভাবেই আদায় করা যায়।

নিয়ত করা

নিয়ত অর্থ সংকল্প। নামায শুরুর আগে নির্ধারণ করতে হবে, ফরয পড়ছি না সুন্নত। জামাআতে না একা। নফল নামায হলে কত রাকাআত পড়ব আর ফরয নামায হলে কোন ওয়াক্তের নামায পড়ছি। মনে মনে এই বিষয়গুলো নির্ধারণ

করে নেওয়াই যথেষ্ট। তবে কারো যদি সন্দেহগ্রস্ততা থাকে, যার কারণে নামায শুরু করার পর তা ভেঙ্গে পুনরায় শুরু করে কিংবা এই সংশয়ের কারণে নামাযে একাগ্রতার অভাব ঘটে যে, নিয়তে ভুল করিনি তো, তার জন্য অন্তরের নিয়তের সঙ্গে মুখেও উচ্চারণ করা উত্তম।

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.... (بخارى : كيف كان بدء الوحي)

"সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (সহীহ বুখারী ১/২)

তাকবীর

তাকবীরের মাধ্যমে নামায শুরু হয়। তাকবীর অর্থ 'আল্লাহু আকবার' বলা। যেহেতু এই তাকবীরের মাধ্যমে নামায-বহির্ভূত সকল কাজ হারাম হয়ে যায় তাই একে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলে। প্রথম তাকবীরের পর এক রোকন থেকে অন্য রোকনে যাওয়ার সময়ও তাকবীর দিতে হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. {بخارى : باب التكبير إذا قام من السجود}

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের শুরুতে তাকবীর দিতেন, এরপর রুকূর সময় তাকবীর দিতেন। রুকূ থেকে ওঠার সময় "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" রَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন এবং সোজা হওয়ার পর বলতেন। এরপর সাজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর দিতেন। (দ্বিতীয়) সাজদায় যাওয়ার সময় ও সাজদা থেকে ওঠার সময়ও তাকবীর দিতেন। এভাবে নামাযের শেষ পর্যন্ত এই নিয়মেই তাকবীর দিতেন। দ্বিতীয় রাকাআতের বৈঠকের পর তৃতীয় রাকাআতে ওঠার সময়ও তাকবীর দিতেন।" (সহীহ বুখারী : ১/১০৯)

হাত ওঠানো

তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত কান পর্যন্ত এভাবে ওঠাতে হবে যে, হাতের তালু ও আঙুলগুলো কিবলামুখী থাকে এবং বৃদ্ধাঙুল কানের লতি বরাবর থাকে। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেছেন—

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَ إِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِنْ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ. {طحاوى : رفع اليدين في افتتاح الصلاة}

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরুর তাকবীর যখন দিতেন তখন দুই হাত এমনভাবে ওঠাতেন যে, বৃদ্ধাঙুল কানের লতির কাছাকাছি থাকত।" (তহাবী : ১/১৪৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا. (ترمذى : نشر الأصابع عند التكبير)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ. {مسلم : استحباب رفع اليدين حذو المنكبين}

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন দুই হাত ভালোভাবে ওঠাতেন।" (জামে তিরমিযী : ১/৩৩)

সহীহ মুসলিমে হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, দুই হাত কানের লতি বরাবর উপরে ওঠাতে। (সহীহ মুসলিম : ১/১৬৮)

কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন কান পর্যন্ত এবং কানের লতি পর্যন্ত হাত ওঠাতেন, তেমনি কখনো কাঁধ পর্যন্তও ওঠাতেন। এজন্য কেউ কেউ কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে থাকেন। আবার আল্লামা শাওকানীর বক্তব্য অনুযায়ী কেউ কেউ কানের উপরেও হাত ওঠান। (নায়লুল আওতার : ১/১৮৯)

কিন্তু হানাফী ফকীহগণ যেহেতু এক হাদীসে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার স্থলে সকল হাদীস থেকে সারনির্যাস আহরণ করেন তাই তাদের বক্তব্য হল, তাকবীরে

তাহরীমার সময় এমনভাবে হাত ওঠাতে হবে যাতে হাতের আঙুলগুলো কান বরাবর, বৃদ্ধাঙুল কানের লতি বরাবর এবং হাতের তালু কাঁধ বরাবর থাকে।

ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরা

তাকবীরে তাহরীমার পর দুই হাত বাঁধবে। হাত বাঁধার নিয়ম হল ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর থাকবে এবং কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কব্জি পেঁচিয়ে ধরবে। অন্য তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর বিছানো থাকবে।

হযরত আসিম ইবনে কুলাইব (রা.) বলেন—

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ ...

الحديث. {ابو داود : رفع اليدين في الصلاة}

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাত বাম হাতের উপর এভাবে রাখলেন যে, তা বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি এবং বাহুর উপর ছিল।" (সুনানে আবু দাউদ : ১/১০৫)

কবীসা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ.

(ترمذى : ما جاء في وضع اليمين على الشمال)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমাম হতেন এবং নামাযে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন।" (জামে তিরমিযী : ১/৩৪)

এ প্রসঙ্গে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষণীয়।

হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) বলেন–

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى

فِي الصَّلَاةِ. {بخارى : وضع اليمنى على اليسرى}

"মানুষকে এই আদেশ দেওয়া হত যে, তারা যেন নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে।" (সহীহ বুখারী : ১/১০২)

উল্লেখ্য যে, শুধু এক হাদীসে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার কারণে একশ্রেণীর মানুষ অন্য হাদীসগুলো পরিত্যাগ করে বসেন, ফলে সেই জানা হাদীসটিরও সঠিক মর্ম অনুযায়ী তাদের আমল হল কি না তা সন্দেহযুক্ত থেকে যায়। এক্ষেত্রে হানাফী

ফকীহগণ মনে করেন, হাত বাঁধা বিষয়ক যে হাদীসগুলো রয়েছে তার সমন্বিত রূপই হল সুন্নত তরীকা। আসিম ইবনে কুলাইব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। কেননা, সে হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরতেন এবং তার ডান হাত থাকত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর (কিছু অংশের) উপর।

নাভির নিচে হাত বাঁধা

দাঁড়ানো অবস্থায় নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নত। হযরত আলী (রা.) বলেন–

مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. (رواه ابو داود، قال المزي : هذا الحديث في رواية ابى سعيد بن الاعرابى، وابن دآسة، وغير واحد عن ابى داود، ولم يذكره ابو القاسم. تحفة الأشراف ٧/٤٥٧)

"(নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সুন্নত হল, নামাযে এক হাত অন্য হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।" (মুসনাদে আহমদ : ৫/২২৭; সুনানে আবু দাউদ তাহকীক শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা : ১/৪৯৫)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত–

ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ، تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ، وَتَاخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. {المحلى لابن حزم ٣/ ٣٠، الجوهر النقي : باب وضع اليدين على الصدر}

"তিনটি বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী-স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত : সময় হওয়ার পর ইফতারে বিলম্ব না করা, সাহরী শেষ সময়ে খাওয়া এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।"

(মুহাল্লা : ৩/৩০; আল-জাওহারুন নাকী : ২/৩২)

উপরের হাদীসগুলোতে যে নিয়ম উল্লেখিত হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গতও বটে। কেননা, সম্মান ও তাজীম প্রকাশের ক্ষেত্রে মানুষ নাভির নিচে হাত বেঁধে দণ্ডায়মান হয়।

ইমামগণের সিদ্ধান্ত

ইমাম আবু হানীফা (রহ.), সুফিয়ান সাওরী (রহ.), ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ্ (রহ.), আবু ইসহাক মারওয়াযী (রহ.) প্রমুখ ইমামগণ নাভির নিচে

হাত বাঁধার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের প্রসিদ্ধ মতও তাই এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত আছে।●

ছানা

ইমাম মুকতাদী সবাই আল্লাহু আকবার বলে নাভির নিচে হাত বাঁধবে এবং অনুচ্চস্বরে ছানা পড়বে। ছানা এই–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র (শরীক থেকে ও সকল ত্রুটি থেকে)। আমি আপনার প্রশংসা করি। আপনার নাম অতি বরকতময়। আপনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং আপনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই।

কুরআন মাজীদে এসেছে—

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ

'তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর।' (সূরা তূর : ৪৮)

যাহহাক (রহ.) বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতের মর্ম হল নামাযে এই ছানা পাঠ করা—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ

(ইবনুল জাওযী, যাদুল মাছীর : ৮/৬০)

আবদা (রহ.) বলেন—

إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُوْلُ : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ. (مسلم : حجة من قال لايجهر بالبسملة)

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيْهِ : يُسْمِعُنَا وَيُعَلِّمُنَا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْكَلَامُ مِنْ عُمَرَ مَرْفُوْعًا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الْمَحْفُوْظُ عَنْ عُمَرَ، مِنْ قَوْلِهِ، وذكر من رواه موقوفًا، وَقَالَ : وَهُوَ الصَّوَابُ. انتهى كلام المنذرى.

● বুকের উপর হাত বাঁধা বিষয়ক রেওয়ায়াত এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনা পরিশিষ্টে দেখুন। পৃষ্ঠা ৩৩৪

"হযরত উমর (রা.) এই ছানা উচ্চস্বরে পড়তেন–

سُبحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيرُكَ

(সহীহ মুসলিম : ১/১৭২)

ইমাম দারাকুতনী (রহ.)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি আমাদেরকে বোঝানোর জন্য এবং (এই নিয়ম) শেখানোর জন্য জোরে পড়তেন।

মুনযিরী (রহ.) বলেন, 'এই ছানা হযরত উমর (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বলেন, 'মওকুফ' বর্ণনাই বিশুদ্ধ।' (আউনুল মাবুদ : ২/৪৭৯)

সর্বোত্তম ছানা

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—

فَأَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْاِسْتِفْتَاحِ مَا كَانَ ثَنَاءً مَحْضًا : "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ".

"সর্বোত্তম ছানা হল যাতে শুধু আল্লাহর প্রশংসা রয়েছে। অর্থাৎ—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ

আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন—

قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَجَهَرَ بِهِ أَحْيَانًا بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لِيَتَعَلَّمَهُ النَّاسُ مَعَ أَنَّ السُّنَّةَ إِخْفَاءُ يَدُلُّ عَلٰى أَنَّهُ الْأَفْضَلُ وَأَنَّهُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ غَالِبًا.

"গ্রন্থকার বলেন, হযরত উমর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে কখনো কখনো মানুষকে শেখানোর উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে এই ছানা পড়েছেন, অথচ সুন্নত হল ছানা অনুচ্চস্বরে পড়া। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নামাযে এই ছানা পড়া উত্তম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই ছানা পড়েছেন'।" (নায়লুল আওতার : ২/২১২)

সাহাবায়ে কেরামের আমল

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, "হযরত আলী (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত জাবির (রা.), হযরত জুবাইর

ইবনে মুতয়িম (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকেও তা বর্ণিত আছে।" (জামে তিরমিযী : ১/৩৩)

শাওকানী বলেন, "ইমাম সায়ীদ ইবনে মানসূর (রহ.) "সুনান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও এই ছানা পড়তেন।' দারাকুতনী হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে এবং ইবনুল মুনযির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সম্পর্কেও তা বর্ণনা করেছেন।" (নায়লুল আওতার : ২/২১১)

তা'আওউয্

ছানা পড়ার পর একা নামায আদায়কারী তা'আওউয পড়বে। তদ্রূপ ইমামও পড়বেন। তবে মুক্তাদী ছানা পড়ার পর নিশ্চুপ থাকবে। তা'আওউয হল–

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ : আমি অভিশপ্ত শয়তানের চক্রান্ত থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"যখন তোমরা কুরআন পড়তে আরম্ভ কর তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।" (সূরা নাহল : ৯৮)

হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার আশ্রয় নিতে اعوذ بالله من الشيطان الرجيم পড়তেন।" (আত-তালখীছুল হাবীর : ২৩০)

তাসমিয়া

আউযুবিল্লাহ পড়ার পর ইমাম অনুচ্চস্বরে 'তাসমিয়া' পড়বেন এবং মুকতাদীগণ নিশ্চুপ থাকবে। তাসমিয়া হল بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থ : শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম দয়ালু, নেহায়েত মেহেরবান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম 'বিসমিল্লাহ' উচ্চস্বরে পড়তেন না।

হযরত আনাস (রা.) বলেন—

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَءُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.(مسلم : حجة من لايجهر بالبسملة)

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উমর (রা.) ও উসমান (রা.)-এর পিছনে নামায পড়েছি; কিন্তু তাঁদের কাউকে "বিসমিল্লাহ" পড়তে শুনিনি।" (সহীহ মুসলিম : ১/১৭২)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . (بخارى : ما يقرء بعد التكبير)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও উমর (রা.) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দ্বারা নামায (কিরাআত) শুরু করতেন।" (সহীহ বুখারী : ১/১০৩)

হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত—

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْفِي بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বিসমিল্লাহ' অনুচ্চস্বরে পড়তেন।" (জামিউল মাসানীদ : ১/৩৪৭)

খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবা-তাবেয়ীনের আমল

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন—

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَغَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ. وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، لَايَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، قَالُوا : وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ. (ترمذي : ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ সাহাবীর আমল এরূপ ছিল। যাদের মধ্যে রয়েছেন আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী। তাঁদের পর তাবেয়ীগণও এ নিয়ম অনুসরণ করেছেন। সুফিয়ান ছাওরী (রহ.), ইবনুল মুবারক (রহ.), ইমাম আহমদ (রহ.), ইসহাক (রহ.) কেউই উচ্চস্বরে 'বিসমিল্লাহ' পড়ার কথা বলেননি। তারা সবাই বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ' অনুচ্চস্বরে পড়া হবে।"

(জামে তিরমিযী : ১/৩৩)

সারকথা, হাদীস শরীফের আলোকে জানা গেল যে, নামাযে উচ্চস্বরে 'বিসমিল্লাহ' পড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত ছিল না। অন্যান্য সাহাবী, তাবেয়ী ও সালাফে সালেহীনের আমলও এরূপ ছিল না। তাই নামাযে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া উচিত নয়।●

● উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া প্রমাণ করতে কেউ কেউ একটি রেওয়ায়েত পেশ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনা পরিশিষ্টে দেখুন। পৃষ্ঠা ৩৩৭

সূরা ফাতিহা

'বিসমিল্লাহ'র পর সূরা ফাতিহা পড়বে। ইমাম হলে ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযে প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহা উচ্চস্বরে পড়বে এবং জোহর ও আসরের নামাযে অনুচ্চ স্বরে।

আর মুক্তাদী হলে নিশ্চুপ থাকবে।

একা নামায পড়লে 'বিসমিল্লাহ'র পর সূরা ফাতিহা পড়বে।

সূরা ফাতিহা এই—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের পালনকর্তা। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। যিনি কর্ম-ফল দিবসের মালিক। (ইয়া আল্লাহ!) আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। আমাদের সরল পথের সন্ধান দাও। তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। তাদের পথ নয় যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

একা নামায আদায়কারী সূরা ফাতিহা পড়বে

একা নামায আদায়কারীকে মুনফারিদ্ বলে। মুনফারিদ্ প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়বে। হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (مسلم : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة)

"যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না।" (সহীহ মুসলিম : ১/১৬৯)

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও মুহাদ্দিসীনের ব্যাখ্যায় এ হাদীস একা নামায আদায়কারী সম্পর্কে এসেছে। আর তাঁরাই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন—

قَالَ أَحْمَدُ : مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، حَيْثُ قَالَ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَءْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ. قَالَ أَحْمَدُ : فَهٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) أَنَّ هٰذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. (ترمذى : ترك القراءة خلف الإمام)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস–

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ –এর মর্ম হল, কেউ যখন একা নামায পড়ে তখন সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়া নামায হয় না। এর দলীল হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীস। তিনি বলেছেন, 'যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না তবে যদি ইমামের পিছনে ইকতিদা করে।' ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী উপরোক্ত হাদীসের এই ব্যাখ্যা করলেন যে, এ বিধান একা নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য'।" (সুনানে তিরমিযী : ১/৪২)

২. হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)ও হাদীসটির এ ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)-এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করার পর আবু দাউদ (রহ.) বলেন—

قَالَ سُفْيَانُ : لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ. (ابو داود : من ترك القراءة)

"সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেছেন, 'হাদীসে ওই নামাযীর কথা বলা হয়েছে যে একা নামায আদায় করে'।" (সুনানে আবু দাউদ : ১/১১৯)

এ বর্ণনাগুলো থেকে পরিষ্কার হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম, সালাফে সালেহীন ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে উপরোক্ত হাদীস একা নামায আদায়কারী সম্পর্কে এসেছে। অতএব এই হাদীস থেকে কোনোভাবেই প্রমাণ করা যায় না যে, ইমামের পিছনে নামায আদায়কারীকেও সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

মুকতাদী সূরা ফাতিহা পড়বে না

কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জামাতের নামাযে মুকতাদী সূরা ফাতিহা ও অন্য কোনো সূরা পড়বে না।

প্রথম দলীল

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'এবং যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।' (সূরা আরাফ : ২০৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.)ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) বলেন, এই আয়াত নামায ও খুতবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/২৮১)

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন—

أَجْمَعَ النَّاسُ عَلٰى أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ.

"এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে যে, এই আয়াত নামায সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।" (আল-মুগনী : ১/৪৯০)

ইমাম যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) ও আবুল আলিয়া (রহ.) বলেছেন—

كَانُوا يَقْرَؤُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَنَزَلَتْ وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

"কিছু মানুষ ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তেন। তখন এই বিধান অবতীর্ণ হয়- 'যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে'।" (আল-মুগনী : ১/৪৯০)

হযরত বাশীর ইবনে জাবির (রা.) বলেন—

صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَمِعَ نَاسًا يَقْرَؤُونَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَفْهَمُوا؟ أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَعْقِلُوا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا كَمَا أُمِرَ.

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নামায পড়ালেন এবং অনুভব করলেন যে, কিছু মানুষ ইমামের সঙ্গে কিরাআত পড়ে। নামায শেষে তাদের ভর্ৎসনা করে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তাআলা আদেশ করেছেন– যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে। এরপরও কি তোমরা বিষয়টি বুঝছ না! এখনও কি তোমাদের বোঝার সময় হয়নি' ?"

(তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/২৮০)

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিসীনের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত আয়াত নামায সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আয়াতের নির্দেশ হল, ইমাম যখন নামাযে কুরআন পড়বে তখন মুক্তাদী নিশ্চুপ থাকবে।

লক্ষ্যণীয় যে, আয়াতে দুটি আদেশ রয়েছে : ১. মনোযোগের সাথে কুরআন শোনা। ২. চুপ থাকা। এই দুই আদেশ তখনই পালিত হবে যদি মুক্তাদী ইমামের সঙ্গে কিরাআত না পড়ে। ইমাম জোরে কিরাআত পড়ুক বা আস্তে। কেননা, যে মুক্তাদী জোরে কিরাআতের নামাযে কিরাআত পড়ল সে উভয় আদেশ অমান্য করল— মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনল না এবং চুপও থাকল না। আর যে আস্তে কিরাআতের নামাযে কিরাআত পড়ল সে দ্বিতীয় আদেশ অমান্য করল।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে লেখেন—

دَلَّتِ الْآيَةُ عَلٰى النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ، فَهِيَ دَالَّةٌ عَلٰى النَّهْيِ فِيمَا يُخْفِى، لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الْاِسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ حَالُ الْجَهْرِ مِنَ الْإِخْفَاءِ، فَإِذَا جَهَرَ فَعَلَيْنَا الْاِسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ، وَإِذَا أَخْفٰى فَعَلَيْنَا الْإِنْصَاتُ بِحُكْمِ اللَّفْظِ لِعِلْمِنَا بِأَنَّهُ قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ.

"উপরোক্ত আয়াতে যেমন জোরে কিরাআতের নামাযে মুকতাদীকে কিরাআত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি আস্তে কিরাআতের নামাযেও। কেননা এ আয়াতে কুরআন তিলাওয়াতের সময় নিশ্চুপ থাকা ও শ্রবণ করার আদেশ করা হয়েছে। জোরে কিরাআতের নামায এবং আস্তে কিরাআতের নামায— এই দুইয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অতএব ইমাম যখন

জোরে কুরআন পড়ে তখন যেমন চুপ থাকা ও মনোযোগ দিয়ে কিরাআত শোনা জরুরি, তেমনি যখন আস্তে কুরআন পড়ে তখনও চুপ থাকা জরুরি। কেননা, আমরা জানি যে, ইমাম কুরআন পড়ছে।" (আহকামুল কুরআন : ৩/৩৯)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে,

(ক) উল্লেখিত আয়াত ইমামের সঙ্গে সূরা ফাতিহা পড়া হবে কি না— এ বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

(খ) ইমাম যখন জোরে কিরাআত পড়ে তখন নিশ্চুপ থাকা এবং মনোযোগ দিয়ে শোনা জরুরী।

(গ) ইমাম যখন আস্তে কিরাআত পড়ে তখন মুকতাদীকে নিশ্চুপ থাকতে হবে।

(ঘ) যে নামাযী মনোযোগের সঙ্গে কুরআন শোনে এবং চুপ থাকে তার প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়।

(ঙ) যে মুকতাদী ইমামের সঙ্গে কিরাআত পড়ে সে এই আদেশ অমান্য করল।

দ্বিতীয় দলীল

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْآنَهٗ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ
فَاتَّبِعْ قُرْآنَهٗ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ

"(হে নবী!) আপনি (এই কুরআন) দ্রুত গ্রহণ করার জন্য আপনার জিহ্বা তার সঙ্গে সঞ্চালন করবেন না। একে সংরক্ষণ করা এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। এরপর তা প্রকাশে সক্ষম করারও দায়িত্ব আমারই।"

(সূরা কিয়ামাহ : ১৬–১৯)

ইমাম বুখারী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন—

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ ... فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْآنَهٗ. قَالَ : جَمْعَهٗ لَكَ فِيْ صَدْرِكَ وَتَقْرَءَهٗ، فَإِذَا قَرَءْنَاهُ فَاتَّبِعْ

قُرْآنَهُ قَالَ : فَاسْتَمِعْ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَءَهُ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ. (بخارى : كتاب الوحى)

"কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হত। তিনি এ সময় [হযরত জিবরীল (আ.)-এর সঙ্গে পড়ার জন্য] ঠোঁট নাড়াতেন। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হল– তরজমা : 'আপনি একে দ্রুত গ্রহণ করার জন্য আপনার জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না। একে সংরক্ষণ করা এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার।' অর্থাৎ আপনার বক্ষে সংরক্ষণ করা এবং আপনাকে পাঠ করানো। 'যখন আমি তা পড়ি আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।' অর্থাৎ আপনি এই কুরআন মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং নিশ্চুপ থাকুন। 'এরপর তা প্রকাশে সক্ষম করার দায়িত্বও আমারই।'

"এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন হযরত জিবরীল (আ.) ওহী নিয়ে আগমন করতেন এবং কুরআন পড়তেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করতেন। আর জিবরীল (আ.) চলে যাওয়ার পর যেভাবে জিবরীল পড়েছেন সেভাবে পড়তেন।" (সহীহ বুখারী : ১/৩)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, কুরআন পাঠের সময় আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) 'পাঠ অনুসরণের' ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'কুরআন তেলাওয়াতের সময় মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।' এজন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পাঠের সময় তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং জিবরীল (আ.) চলে যাওয়ার পর নিজে পড়তেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যখন নামাযের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতের সময় নিশ্চুপ থাকা ও মনোযোগের সঙ্গে শোনার এত গুরুত্ব, তবে নামাযের ভিতরে এর গুরুত্ব কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়। তবে মনে রাখতে হবে, এটি শুধু কুরআন মজীদের বৈশিষ্ট্য। এজন্য কিরাআত ছাড়া নামাযের অন্যান্য যিকির, তাসবীহ, তাকবীর ইত্যাদি মুক্তাদীকেও পড়তে হবে।

তৃতীয় দলীল

সহীহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম-মুক্তাদীর করণীয় নির্ধারণ করেছেন। কিছু কাজ ইমাম ও

মুক্তাদী উভয়ের জন্যই করণীয়, আর কিছু কাজ এর ব্যতিক্রম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেককে নিজ নিজ করণীয় পালন করা উচিত। হযরত কাতাদা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ : إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَءَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَرَءَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ فَسَجَدَ فَكَبِّرُوا فَاسْجُدُوا. (صحيح مسلم : التشهد فى الصلاة)

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বলেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নসীহত করলেন এবং সুন্নাহ অর্থাৎ দ্বীনের পথ বাতলে দিলেন। তিনি আমাদেরকে নামায শিক্ষা দিলেন এবং বললেন, 'যখন তোমরা নামায পড়তে শুরু কর তখন প্রথমে কাতারগুলো সোজা কর। এরপর একজন তোমাদের ইমাম হবে। সে যখন তাকবীর দেয় তখন তোমরাও তাকবীর দিবে এবং সে যখন পড়ে তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকবে। ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পড়বে তখন তোমরা আমীন বলবে (অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ! কবুল করুন) আল্লাহ তোমাদের দুআ কবুল করবেন। সে যখন তাকবীর দিয়ে রুকূ করবে, তোমরাও তাকবীর দিবে এবং রুকূ করবে। মনে রাখবে ইমাম তোমাদের আগে রুকূতে যায় এবং তোমাদের আগে রুকূ থেকে উঠে, তাহলে তার ও তোমাদের রুকূতে অবস্থান সমান হল। ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা বলবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ।

আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রশংসা শুনবেন।' কেননা, তিনি তাঁর নবীর মাধ্যমে তোমাদের জানিয়েছেন, যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার প্রশংসা শোনেন। এরপর যখন ইমাম তাকবীর দিয়ে সাজদা করে তখন তোমরাও তাকবীর দিবে এবং সাজদা করবে।" (সহীহ মুসলিম : ১/১৭৪)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, "ইমাম আহমদ (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম ইসহাক (রহ.) এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। অতএব এ বিষয়ে কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।" *(রাসায়েলে দ্বীনিয়াহ সালাফিয়্যাহ : পৃ. ৫৪)*

জামাতের নামাযে মুকতাদী ইমামের সঙ্গে সূরা ফাতিহা পড়বে কি না—এ বিষয়েই সহীহ মুসলিমের উক্ত হাদীসে সমাধান দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই হাদীসে জামাতের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে এবং জামাতের নামাযে ইমাম ও মুকতাদীর করণীয় কী, তা উল্লেখ করা হয়েছে। কী কী কাজ ইমাম-মুকতাদী উভয়েই করবে এবং কী কী কাজে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তা নির্দেশ করে বলা হয়েছে, "ইমাম যখন তাকবীরে তাহরীমা বলবে তখন তোমরাও তাকবীরে তাহরীমা বলবে। ইমাম যখন তাকবীর দিয়ে রুকূ করবে তখন তোমরাও তাকবীর দিয়ে রুকূ করবে। ইমাম যখন তাকবীর দিয়ে সাজদা করবে তখন তোমরাও তাকবীর দিয়ে সাজদা করবে। আর ইমাম যখন পাঠ করবে তখন তোমরা চুপ থাকবে। ইমাম যখন বলবে, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তখন তোমরা বলবে, آمِيْنَ। ইমাম যখন বলবে, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ তখন তোমরা বলবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ।"

তাহলে এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, জামাতের নামাযে কুরআন পড়া ইমামের দায়িত্ব। আর মুকতাদীর কর্তব্য হল চুপ থাকা। অতএব মুকতাদী সূরা ফাতিহাও পড়বে না এবং অন্য সূরাও মিলাবে না।

সূরা ফাতিহা প্রসঙ্গে এই হাদীসে যা বলা হয়েছে তা আবার উল্লেখ করছি। বলা হয়েছে যে, "ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলেন তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে এবং যখন তিনি কিরাআত আরম্ভ করেন তখন তোমরা চুপ থাকবে। যখন তিনি বলেন, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তখন তোমরা বলবে آمِيْنَ।"

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মুকতাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান নেই, শুধু জোরে কিরাআতের নামাযে যখন ইমামের সূরা ফাতিহা সমাপ্ত হয় তখন মুকতাদী 'আমীন' বলবে।

মোটকথা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ হল, ইমাম যখন কুরআন পড়ে তখন মুকতাদীরা চুপ থাকবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ তাঁর এই আদেশ অনুযায়ীই আমল করে থাকে। অন্যদিকে গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের বক্তব্য এই যে, ইমাম যখন কুরআন পড়ে তখন মুকতাদীকেও কুরআন পড়তে হবে!

চতুর্থ দলীল

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَءَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ، فَقُولُوا آمِيْنَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ... (ابن ماجه : باب إذا قرء فأنصتوا)

قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ : هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَءَ فَأَنْصِتُوا، فَقَالَ : هُوَ عِنْدِيْ صَحِيحٌ. (مسلم : التشهد في الصلوة)

"জামাতের নামাযে ইমাম হল অনুসরণের জন্য। অতএব ইমাম যখন 'আল্লাহু আকবার' বলে তখন তোমরাও 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আর ইমাম যখন পাঠ করে তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকবে। যখন ইমাম বলে, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তখন তোমরা বলবে آمِيْنَ। যখন সে রুকূ করে তখন তোমরাও রুকূ করবে।... (সুনানে ইবনে মাজা : ১/৬১)

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্য আবু বকর (রহ.) এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। ইমাম মুসলিম বললেন, "আমার মতে হাদীসটি সহীহ"।

(সহীহ মুসলিম : ১/১৭৪)

এই হাদীসেও জামাতের নামাযে ইমাম-মুকতাদীর করণীয় উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, জামাতের নামাযে ইমাম হল অনুসরণের জন্য। আর সেই অনুসরণ এভাবে হবে যে, 'ইমাম যখন তাকবীর দিবে তখন মুকতাদীও তাকবীর দিবে। আর ইমাম যখন কুরআন পড়বে তখন মুকতাদী চুপ থাকবে।' অতএব ইমামের কিরাআতের সময় চুপ না-থাকার অর্থ হল ইমামের অনুসরণ পরিহার করা। কেউ যদি ইমামের তাকবীরের সময় তাকবীর না দেয় কিংবা ইমাম রুকূতে যাওয়ার পরও রুকূ না

করে তাহলে যেমন ইমামের অনুসরণ লঙ্ঘিত হয় তদ্রূপ যে ইমামের কিরাআতের সময় নিশ্চুপ থাকে না সে-ও ইমামের অনুসরণ পরিত্যাগ করল।

পঞ্চম দলীল

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِذَا قَالَ الْقَارِئُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ : آمِيْنَ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(مسلم : التسميع والتامين)

"যখন কুরআন পাঠকারী বলে, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ এবং মুকতাদী বলে آمِيْنَ তো যার আমীন আসমানবাসীর আমীনের সঙ্গে মিলে যায় তার পূর্ববর্তী গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (সহীহ মুসলিম : ১/১৭৬)

এই হাদীস স্পষ্টতই জামাতের নামায সম্পর্কে এসেছে। এ হাদীসে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ইমামকেই 'কারী' অর্থাৎ কুরআন পাঠকারী বলে অভিহিত করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নামাযে কুরআন পাঠ ইমামেরই কর্তব্য। যদি ইমাম ও মুকতাদী সবার জন্য কুরআন পাঠের বিধান থাকত তাহলে শুধু ইমামকে এ বিশেষণে উল্লেখ করা হত না।

দ্বিতীয়ত হাদীসের বক্তব্য থেকে সূরা ফাতিহার বিষয়টিও জানা যাচ্ছে। হাদীসটি লক্ষ্য করুন– "যখন (কুরআন) পাঠকারী বলে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তখন মুকতাদী বলবে 'আমীন'।" বোঝা যাচ্ছে যে, সূরা ফাতিহা পাঠ করবে ইমাম, আর মুকতাদী বলবে, 'আমীন'।

ষষ্ঠ দলীল

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ. (بخاري : كتاب الدعوات، باب التأمين)

"যখন কুরআন পাঠকারী আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা, ফিরিশতাগণও আমীন বলে থাকেন।" (সহীহ বুখারী : ২/৯৪৭)

বলাবাহুল্য, এই হাদীসেও জামাতের নামাযের বিধান নির্দেশিত হয়েছে। এখানেও শুধু ইমামকে 'কারী' বলা হয়েছে এবং মুকতাদীদেরকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করবে তখন তারা বলবে, 'আমীন'।

মোটকথা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের উপরোক্ত দুই হাদীসেও এ বিধান এসেছে যে, জামাতের নামাযে শুধু ইমাম কুরআন পড়বে আর মুকতাদীরা চুপ থাকবে।

সপ্তম দলীল : রুকূতে রাকাআত-প্রাপ্তি

মুকতাদী যদি ইমামের সঙ্গে রুকূতে শামিল হয় তবে তার সেই রাকাআত পূর্ণ রাকাআত হিসেবে গণ্য হয়। যদিও রুকূতে-শামিল-হওয়া মুকতাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় যে, সূরা ফাতিহা পড়া মুকতাদীর জন্য অপরিহার্য নয়। সহীহ বুখারীতে এসেছে—

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهٰى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تُعِدْ. (بخاری : إذا ركع دون الصف)

ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الطَّبَرَانِيِّ : فَقَالَ : أَيُّكُمْ صَاحِبُ هٰذَا النَّفَسِ؟ قَالَ : خَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي الرَّكْعَةُ مَعَكَ. (فتح الباری : إذا ركع دون الصف)

"হযরত আবু বাকরা (রা.) (জামাতের নামাযে) এসে দেখলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূতে চলে গেছেন। তিনি তখন কাতারে না পৌছেই রুকূতে শামিল হলেন। নামায শেষে বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হল। তিনি আবু বাকরা (রা.)কে লক্ষ করে বললেন, 'আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন, তবে এমন আর করো না'। (অর্থাৎ কাতারে পৌছার আগে নামায শুরু করো না।)" (সহীহ বুখারী : ১/১০৮)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এই হাদীসের টীকায় লেখেন, "ইমাম তবারানী হযরত হাসান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নামায শেষে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন কে করেছে?' আবু বাকরা (রা.) উত্তরে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এমন করেছি, যেন আপনার সঙ্গে আমার এই রাকাআত ছুটে না যায়'।"

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকরা (রা.)কে তার পবিত্র প্রেরণার জন্য সাধুবাদ দিয়েছেন এবং তার জন্য দুআ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কাতারে পৌছার আগে নামাযে শামিল হওয়ার ভুল কাজটিও সংশোধন করে দিয়েছেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় নামায পড়তে বলেননি। এ থেকে বোঝা যায়, রুকূতে ইমামকে পেলে মুকতাদী সেই রাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য হয়।

ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর বক্তব্য

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম বায়হাকী (রহ.) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) থেকেও অনুরূপ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনাগুলো থেকে যে বিধান প্রমাণিত হয় তা তিনি তার রীতি অনুযায়ী শিরোনাম আকারে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

بَابُ مَنْ رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ، وَفِيْ ذٰلِكَ دَلِيْلٌ عَلٰى إِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ، وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَمَا تَكَلَّفُوْهُ. (سنن بيهقى ج ٢ ص ٩٠)

"কাতারে পৌছার আগে রুকূ করা। এ থেকে প্রতীয়মান হয় রুকূতে শামিল হলে তা পূর্ণ রাকাআত গণ্য হয়। অন্যথায় এ তড়িঘড়ির কোনো অর্থ থাকে না।"
(সুনানে বায়হাকী)

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর আছার ও ফতোয়াদ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত। এরপরও যারা এ বিষয়ে বিরোধিতা প্রদর্শন করে থাকেন তাদের সম্পর্কে আফসোস করা ছাড়া আর কী করার আছে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ফতোয়া

রুকূতে-শামিল-হওয়া মুকতাদী সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ফতোয়া এই যে, তার সে রাকাআত পূর্ণ রাকাআত হিসেবেই গণ্য হবে।

ইমাম আবদুর রাযযাক (রহ.) "মুসান্নাফ" গ্রন্থে বর্ণনা করেন–

إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ : الرَّجُلُ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ، أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالَا : وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذٰلِكَ. (مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٣٧٨)

যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এই ফতোয়া দিতেন যে, নামাযে আগত ব্যক্তি যদি দেখে জামাত রুকূ অবস্থায় রয়েছে তবে তাকবীর দিয়ে নামাযে শরীক হবে এবং তার এ রাকাআত পূর্ণ রাকাআত গণ্য হবে। আর যদি জামাআতকে সিজদারত দেখে তাহলেও নামাযে শামিল হবে, কিন্তু তা রাকাআত গণনা করবে না।

অন্যত্র বর্ণনা করেন—

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : مَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ.

(مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٢٨١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, 'যে রুকূ পায়নি, সিজদায় শামিল হয়েছে তার এই রাকাআত গণনা করা হবে না।'

(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক)

উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলো থেকে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, রুকূতে-শামিল হওয়া-মুকতাদীর এই রাকাআত পূর্ণ রাকাআত গণ্য হয়। আর এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুকতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়া অপরিহার্য নয়। অন্যথায় সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়া রাকাআত গণ্য হত না।

উম্মাহ্র জ্ঞানী ও আলেমগণের সিদ্ধান্ত

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) "ফাতাওয়া" গ্রন্থে, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান "বুদূরুল আহিল্লা" কিতাবে, আল্লামা শামছুল হক আজীমাবাদী "আউনুল মা'বূদ" গ্রন্থে এবং আল্লামা শাওকানী "নায়লুল আওতার" গ্রন্থে বলেছেন, 'উম্মাহ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের সিদ্ধান্ত এই যে, রুকূতে-শামিল-হওয়া মুকতাদীর সেই রাকাআত পূর্ণ রাকাআত গণ্য হবে।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—

وَالْمَسْبُوقُ إِذَا لَمْ يَتَّسِعْ وَقْتُ قِيَامِهِ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ مَعَ إِمَامِهِ، وَلَا يُتِمُّ الْفَاتِحَةَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَهُوَ شَاذٌّ.

(مختصر فتاوى ابن تيمية ص ٥٩)

"জামাতে বিলম্বে অংশগ্রহণকারী যদি সূরা ফাতিহা পড়ার সময় না পায় তবে ইমামের সঙ্গে রুকূতে শামিল হয়ে যাবে, ফাতিহা সম্পূর্ণ করবে না। এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত এবং এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করা বিচ্ছিন্নতা হিসেবেই গণ্য।" (মুখতাসারু ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া)

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান লেখেন—

واعتداد لاحق برکعتے کہ رکوعش دریافتہ مذہب جمہورست مگر جماعتے از اہل علم درآن خلاف کردہ

'অধিকাংশ আলিমের সিদ্ধান্ত এই যে, রুকূতে-শামিল-হওয়া মুসল্লীর সেই রাকাআত পূর্ণ রাকাআত গণ্য হবে। তবে কিছু আলিম এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন।' (বুদূরুল আহিল্লা)

নওয়াব সাহেব নিজে যদিও মজবূরীর কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের পথ পরিহার করেছেন তবে তাদের সিদ্ধান্তকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের সিদ্ধান্ত বলেই উল্লেখ করেছেন।

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলিম আল্লামা শামসুল হক আজীমাবাদী (রহ.) "আউনুল মা'বূদ" গ্রন্থে লেখেন, 'আল্লামা শাওকানী (রহ.) প্রথমে রুকূতে-শামিল-হওয়া মুকতাদীর সেই রাকাআত পূর্ণ রাকাআত গণ্য হবে না বলে মত প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু পরে তার মতের পরিবর্তন ঘটে এবং "ফাতহুর রাব্বানী ফী ফাতাওয়াশ শাওকানী" গ্রন্থে মূলধারার আলিমগণের সিদ্ধান্তকেই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেন।' দেখুন– আউনুল মাবূদ : ৩/১১০ (الرجل يدرك الإمام ساجدا)

মোটকথা, সহীহ বুখারীর হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের ফাতাওয়া এবং অধিকাংশ আলিমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একথা পরিষ্কার যে, রুকূতে-শামিল-হওয়া মুকতাদীর ওই রাকাআত পূর্ণ রাকাআত হিসেবেই গণ্য হবে। আল্লামা শাওকানী (রহ.) গায়রে মুকাল্লিদ হওয়া সত্ত্বেও পরিশেষে এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, দলীলের আলোকেও এই মতই শক্তিশালী। আর এটি প্রমাণ করে যে, মুকতাদীর জন্য ফাতিহা পড়া অপরিহার্য নয়।

অষ্টম দলীল : মুকতাদী কিরাআত পড়বে না

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ : لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ. (صحيح مسلم : سجود التلاوة)

আতা ইবনে ইয়াসার (রহ.) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, "মুকতাদী কি ইমামের সঙ্গে পড়বে?" তিনি উত্তরে বললেন, "মুকতাদী কোনো নামাযেই ইমামের সঙ্গে পড়বে না।" (সহীহ মুসলিম : ১/২১৫)

এই হাদীস জামাতের নামায প্রসঙ্গে এসেছে এবং এ হাদীসে মুকতাদীকে ইমামের সঙ্গে কুরআন পড়তে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীসের "فِيْ شَيْءٍ" শব্দ থেকে জানা যাচ্ছে যে, মুকতাদী কোনো কিছুই পড়বে না– না সূরা ফাতিহা, না অন্য কোনো সূরা।

"فِيْ شَيْءٍ" শব্দ থেকে আরো বোঝা যাচ্ছে যে, জাহরী বা জোরে কিরাআতের নামায কি সিররী বা আস্তে কিরাআতের নামায কোনো নামাযেই মুক্তাদী কুরআন পাঠ করবে না।

নবম দলীল : ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট

হযরত নাফে' (রহ.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَءُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ، وَإِذَا صَلّٰى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَءْ. قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَايَقْرَءُ خَلْفَ الْإِمَامِ. (موطأ امام مالك : ترك القراءة خلف الإمام)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)কে যদি জিজ্ঞাসা করা হত, মুকতাদী ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বে কি না, তাহলে তিনি বলতেন, 'ইমামের কিরাআতই মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট। তবে যখন সে একা নামায পড়বে তখন তাকে কুরআন পড়তে হবে'।"

নাফে' (রহ.) বলেন, "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ইমামের পিছনে কুরআন পড়তেন না।" (মুয়াত্তা মালেক : পৃষ্ঠা ২৯)

আল্লামা নিমাভী (রহ.) "আছারুস সুনান" গ্রন্থে (১/৮৯) এই হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন।

দশম দলীল : ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : مَنْ صَلّٰى وَرَاءَ الْإِمَامِ كَفَاهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ.

(بيهقى : من قال لا يقرء خلف الإمام)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এই ফতোয়া দিতেন যে, 'ইমামের পিছনে নামায আদায়কারীর জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট।' বায়হাকী (রহ.) বলেন, 'ইবনে উমর (রা.)-এর এ মতটিই সহীহ সনদে বর্ণিত।'

(সুনানে বায়হাকী : ২/১৬১)

বলাবাহুল্য, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর উপরোক্ত দু'টি রেওয়ায়াত জামাতের নামায সম্পর্কে এসেছে। এই দুই রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ইমামের কিরাআত মুকতাদীর পক্ষে যথেষ্ট। অতএব জামাতে নামায আদায়কালে মুকতাদী নিজে পড়বে না। আর একা নামায আদায়কারী কুরআন পড়বে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবী ইমামের পিছনে নামায আদায়কালে কুরআন পড়তেন না।

একাদশ দলীল : ইমামের পিছনে নামায আদায়কালে কিরাআত নেই

হযরত জাবির (রা.) বলেন—

مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ. (حسن صحيح) (ترمذى : ترك القراءة خلف الإمام. مؤطا امام مالك : باب تجب قراءة فاتحة الكتاب)

'নামাযের কোনো এক রাকাআতে যে সূরা ফাতিহা পড়ল না সে যেন নামাযই পড়ল না। তবে যদি ইমামের পিছনে নামায আদায় করে।'

(জামে তিরমিযী : ১/৭১; মুয়াত্তা ইমাম মালেক : পৃ. ২৮)

এই হাদীসে হযরত জাবির (রা.) সূরা ফাতিহা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, একা নামায আদায়কারী প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়বে। আর যে জামাতে নামায পড়ে সে সূরা ফাতিহা পড়বে না।

দ্বাদশ দলীল : মুকতাদী কোনো রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়বে না

ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) বলেন—

إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمْ يَقْرَءْ خَلْفَ الْإِمَامِ لاَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِمَا. (جامع المسانيد ج ١ ص ٣١٠)

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ইমামের পিছনে কুরআন পড়েননি— না প্রথম দুই রাকাআতে, না শেষ দুই রাকাআতে।'

(জামিউল মাসানীদ : ১/৩১০)

এই হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইমামের পিছনে নামায আদায়কালে মুকতাদী চার রাকাআতের কোনো রাকাআতে কুরআন পড়বে না।

'কিরাআত' শব্দে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা দুটোই শামিল রয়েছে। অতএব মুকতাদী সূরা ফাতিহা কি অন্য সূরা কিছুই পড়বে না।

ত্রয়োদশ দলীল : সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মাহর আলিমগণের কর্মধারা

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর গবেষণার উপর গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের আস্থা রয়েছে। তিনি লিখেছেন যে—

وَالْأَمْرُ بِاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَالْإِنْصَاتِ لَهُ مَذْكُوْرٌ فِي الْقُرْآنِ وَفِي السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ فِيْمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيْرِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا. (تنوع العبادات ص ٥٥)

'ইমামের কিরাআত মনোযোগ দিয়ে শোনা ও নিশ্চুপ থাকার বিধান কুরআন মজীদ ও সহীহ্ হাদীসদ্বারা প্রমাণিত। জামাতের নামাযে মুকতাদী সূরা মিলাবে না– এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মতে সূরা ফাতিহাও পড়বে না।' (তানাওউউল ইবাদাত পৃষ্ঠা ৫৫)

উপরের আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো জানা গেল তা হচ্ছে :

১. মুকতাদী ইমামের কিরাআত শুনবে এবং নিশ্চুপ থাকবে। এটা কুরআন কারীমের নির্দেশ।

২. ইমামের সঙ্গে সূরা ফাতিহা পড়া কুরআন-দ্বারা প্রমাণিত নয়।

বলাবাহুল্য, কুরআন-মজীদে-আসা বিধান কুরআন-মজীদে-না-আসা বিষয় থেকে অগ্রগণ্য।

৩. সহীহ ও মারফূ হাদীসে এসেছে যে, নামাযে কুরআন পড়া ইমামের দায়িত্ব, আর মুকতাদীর দায়িত্ব হল চুপ থাকা।

৪. কোনো সহীহ মারফূ হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, জামাতের নামাযে মুকতাদীর জন্য ফাতিহা পড়া অপরিহার্য।

বলাবাহুল্য, সহীহ ও মারফূ হাদীস-দ্বারা প্রমাণিত মাসআলা সহীহ-মারফূ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন বিষয় থেকে অবশ্যই অগ্রগণ্য।

৫. অধিকাংশ সাহাবী থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, মুকতাদীর সূরা ফাতিহা পড়া উচিত নয়।

৬. কোনো কোনো সাহাবী থেকে ইমামের সঙ্গে সূরা ফাতিহা পড়ার যে কথা বর্ণিত হয়েছে তা হয়তো সনদের দিক থেকে দুর্বল, কিংবা তাতে জামাতের কথা নেই, অথবা মানসূখ অর্থাৎ ওই বর্ণনাগুলোতে ইমামের সঙ্গে কিরাআত নিষিদ্ধ হওয়ার আগের বিধান উল্লেখিত হয়েছে। যদি কিছু সহীহ আছার এ প্রসঙ্গে পাওয়াও যায় তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সেগুলোর তুলনায় কুরআন, সুন্নাহ এবং অধিকাংশ সাহাবীর আছারে বিধৃত বিধানই অগ্রগণ্য।

আমাদের কর্তব্য হল কুরআন মজীদের স্পষ্ট নির্দেশ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিষ্কার নির্দেশনা এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল ও বর্ণনা থেকে প্রাপ্ত নিয়ম অনুযায়ী নামায আদায় করা। কিরাআত-প্রসঙ্গে এই নিয়মের সারকথা এই যে, একা নামায আদায়কারী সূরা ফাতিহা পড়বে এবং সূরা মিলাবে। আর মুকতাদী সূরা ফাতিহা কি অন্য সূরা কিছুই পড়বে না, নিশ্চুপ থাকবে।●

অবর্তমানে এক শ্রেণীর মানুষকে মুকতাদীর ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়। এমনকি এ অন্যায় প্রচারণাও চালাতে দেখা যায় যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাছে ইমামের পিছনে ফাতিহা না-পড়া সম্পর্কে কোনো দলীল নেই। এসব প্রচার-প্রচারণায় সাধারণ মানুষ যাতে বিভ্রান্ত না হন– এই সদিচ্ছা থেকে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

● ওইসব লোকদের উপস্থাপিত কিছু দলীলের পর্যালোচনাও গ্রন্থকার মূল গ্রন্থে টীকা আকারে করেছেন। সে আলোচনা 'মুকতাদীর কিরাআত পাঠ : অন্যান্য মতামত ও পর্যালোচনা' শিরোনামে পরিশিষ্ট অংশে রয়েছে। দেখুন, পৃষ্ঠা– ৩৪০

আমীন-প্রসঙ্গ

ইমাম ফাতিহা সমাপ্ত করার পর মুকতাদী অনুচ্চ স্বরে আমীন বলবে। এটিই উত্তম। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْنَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (بخارى : فضل التأمين)

'যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে এবং আসমানের ফিরিশতাগণও আমীন বলেন আর পরস্পরের আমীন মিলে যায় তখন তার পিছনের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।' (সহীহ বুখারী : ১/১০৮)

আল্লামা ইবনুল মুনাইয়্যির উপরোক্ত হাদীসের 'তরজমাতুল বাব' অর্থাৎ শিরোনাম বিষয়ক আলোচনায় বলেন—

إِنَّ التَّأْمِيْنَ دُعَاءٌ. وَقَالَ : إِنَّ التَّأْمِيْنَ قَائِمٌ مَقَامَ التَّلْخِيْصِ بَعْدَ الْبَسْطِ، فَالدَّاعِي فَصَّلَ الْمَقَاصِدَ، وَالْمُؤَمِّنُ أَتَى بِكَلِمَةٍ تَشْمُلُ جَمِيْعًا .

(فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ٢ ص ٢٦٣)

'আমীন হল দু'আ।' তিনি আরও বলেন, 'আমীন হল বিশদ প্রার্থনার পর সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা। ইমাম প্রার্থণীয় বিষয়গুলোকে বিশদভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং 'আমীন' পাঠকারী এই শব্দদ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত সকল বিষয় প্রার্থনা করেছেন।' (ফাতহুল বারী)

'আমীন' শব্দের অর্থ হল, ইয়া আল্লাহ! এই দু'আ কবুল করুন।

অন্য ভাষায় : 'এমনই হোক'।

আল্লাহ তাআলার নিকটে ওই দুআ পছন্দনীয় যা অনুচ্চ স্বরে ও কাতরতার সঙ্গে করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ডাক কাতরভাবে ও গোপনে। তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ : ৫৫)

এই আয়াতের আলোচনায় ইবনে কাসীর (রহ.) নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত—

رَفَعَ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالدُّعَاءِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ! اِرْبَعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَاتَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّ الَّذِيْ تَدْعُوْنَهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ. (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٢١)

"লোকেরা উচ্চ আওয়াজে দু'আ করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ করে বললেন, 'হে লোকসকল! আস্তে। তোমরা এমন কাউকে ডাকছ না যিনি শোনেন না কিংবা তোমাদের থেকে দূরে রয়েছেন। তোমরা যাকে ডাকছ তিনি সকল কথা শোনেন এবং অতি নিকটে রয়েছেন'।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে,

- যার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের সঙ্গে মিলবে তার পিছনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।
- আমীন হল দুআ।
- আল্লাহ তাআলা গোপনীয়তা ও কাতরতার সঙ্গে দুআ করতে আদেশ দিয়েছেন।
- উচ্চস্বরে দুআকারীদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।
- আল্লাহ তাআলা সকল আওয়াজ শোনেন এবং সবার নিকটে রয়েছেন।

অতএব 'আমীন' অনুচ্চ স্বরে বলা উচিত। কেননা, এটিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে পছন্দনীয়।

কিছু আলেম বলেন, আমীন একটি যিকির। তাদের মত গ্রহণ করা হলেও আমীন অনুচ্চ স্বরে বলা উত্তম। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ (اعراف : ٢٠٥)

'তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ করবে মনে মনে, সকাতর ও সশঙ্কচিত্তে, অনুচ্চ স্বরে, প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় এবং তুমি উদাসীন হবে না।' (সূরা আরাফ : ২০৫)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে গোটা বিষয়ের সারনির্যাস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমীন যদি দুআ হয় তবে সূরা আরাফের ৫৫

নং আয়াতের আলোকে তা আস্তে বলা উচিত। আর যদি যিকির গণ্য করা হয় তবেও অনুচ্চ স্বরে বলা কর্তব্য সে সূরারই ২০৫ নং আয়াতের নির্দেশক্রমে।'

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ : لاَتُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، إِذَا قَالَ : وَلاَ الضَّالِّيْنَ، فَقُولُوا : آمِيْنَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (مسلم : النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره ١/١٧٧، النسخة الهندية ٤١٥)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (নামায) শিক্ষা দিয়ে বলেন, "তোমরা ইমামের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না। যখন ইমাম তাকবীর দেয় তখন তোমরা তাকবীর দিবে। যখন ইমাম وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। যখন ইমাম রুকূ করে তখন তোমরা রুকূ করবে। যখন ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে তখন তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে।"

(সহীহ মুসলিম : ১/১৭৭ হাদীস নং ৪১৫)

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের ফাতিহা পাঠ শেষ হলে মুকতাদীকে 'আমীন' বলতে আদেশ করেছেন। তদ্রূপ ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর মুকতাদীকে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতে আদেশ দিয়েছেন। দুই আদেশ একই ভঙ্গিতে করা হয়েছে। এ দুয়ের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্যের কোনো ইঙ্গিতও নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুকতাদী যেমন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ অনুচ্চ স্বরে পড়ে তেমনি 'আমীন'ও অনুচ্চ স্বরেই পড়বে।

হযরত উমর (রা.)-এর ফরমান

আবু মা'মার হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন—

يُخْفِي الْإِمَامُ أَرْبَعًا : اَلتَّعَوُّذُ، وَبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَآمِيْنَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (عينى شرح الهدايه ٢/٢١٩، صفة الصلاة : بحث التمية)

'ইমাম চারটি বিষয় অনুচ্চ স্বরে বলবে : ১. আউযুবিল্লাহ..., ২. বিসমিল্লাহ..., ৩. আমীন, ৪. রাব্বানা লাকাল হামদ।' ২/২১৯ (মাকতাবায়ে হক্কানিয়া, মুলতান)

হযরত আলী (রা.)-এর তরীকা

আবু ওয়াইল বলেন—

لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا بِآمِيْن

(الجوهر النقي ج ٢ ص ٤٨)

"উমর (রা.) ও আলী (রা.) 'বিসমিল্লাহ...' ও 'আমীন' উচ্চ আওয়াজে পড়তেন না।" (আল-জাওহারুন নাকী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ফরমান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন—

يُخْفِي الْإِمَامُ ثَلَاثًا : اَلْاِسْتِعَاذَةَ، وَبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَآمِيْنَ.

(المحلى ج ٣ ص ١٨٤)

"ইমাম তিনটি বিষয় অনুচ্চ স্বরে পড়বে : আউযুবিল্লাহ..., বিসমিল্লাহ... ও আমীন।" (আল-মুহাল্লা)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো প্রমাণিত হল তা নিম্নরূপ :

- কুরআন মজীদের শিক্ষা অনুযায়ী 'আমীন' অনুচ্চ স্বরে বলা উচিত।
- সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকেও বোঝা যায় যে, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এর মতো آمِيْنَ ও অনুচ্চ স্বরে বলা উচিত।
- কুরআন কারীমের কোনো আয়াত থেকে উচ্চ স্বরে আমীন বলার প্রমাণ পাওয়া যায় না।
- কোনো সহীহ হাদীসে উচ্চ স্বরে আমীন বলার আদেশ দেওয়া হয়নি।
- উচ্চ স্বরে আমীন বলা সম্পর্কে যে রেওয়ায়েতগুলো পাওয়া যায় তা জয়ীফ।
- আজকাল কিছু মানুষ সর্বদা উচ্চ স্বরে আমীন বলার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে তারা যত রেওয়ায়েতের সাহায্য নিয়ে থাকে (জয়ীফ হওয়ার বিষয়টি বাদ দিলেও) সেগুলোতে সর্বদা জোরে আমীন বলার উল্লেখ নেই। অতএব এ জাতীয় রেওয়ায়েতদ্বারা দাবি প্রমাণিত হয় না।
- হাদীসবিশারদগণ বলেন, যে রেওয়ায়েতে উচ্চ স্বরে আমীন পড়ার কথা এসেছে তা উপস্থিত মুসল্লীদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ছিল। অনেক রেওয়ায়েতে

এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা পাঠের পর কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। দু'একবার উচ্চ স্বরে আমীন পড়ে মুকতাদীদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ সময় চুপে চুপে আমীন পড়তে হয়। এভাবে শিক্ষাদানের আরো দৃষ্টান্ত হাদীস শরীফে রয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো জোহর-আসরের নামাযে এক-দুই আয়াত উচ্চ স্বরে পড়তেন যাতে নতুন লোকেরা বুঝতে পারে যে, এ সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুচ্চ স্বরে কিরাআত পড়ে থাকেন। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত উমর (রা.) একবার উচ্চ স্বরে ছানা سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ পড়েছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে জানানো যে, এ সময় ছানা পড়া হয়। এসব রেওয়ায়াত থেকে কেউ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জোহর-আসরের নামাযে এক-দুই আয়াত উচ্চ স্বরে পড়তে হয় কিংবা নামাযের শুরুতে ছানা উচ্চ স্বরে পড়তে হয় তবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে না। একই কথা আমীন সম্পর্কেও।

বিষয়টি এভাবেও ভাবা যায় যে, যদি উচ্চ স্বরে আমীন পড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম হত তবে প্রচুর হাদীসে বিষয়টি উল্লেখিত হত। কেননা, যে সাহাবীগণ তাঁর ছোট ছোট অঙ্গভঙ্গি পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাঁরা এই প্রকাশ্য আমলটিও অবশ্যই বর্ণনা করতেন। কিন্তু এমন হয়নি। এজন্যই ইমাম বুখারী (রহ.) 'উচ্চ স্বরে আমীন পড়া' শিরোনাম আনলেও তার অধীনে কোনো 'মারফূ' হাদীস উল্লেখ করেননি।

আল্লামা নিমাভী (রহ.) বলেন–

لَمْ يَثْبُتِ الْجَهْرُ بِالتَّأْمِيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَنِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، وَمَا جَاءَ فِي الْبَابِ فَهُوَ لَا يَخْلُوْ عَنْ شَيْءٍ. (آثار السنن ج ١ ص ٩٤)

'উচ্চস্বরে আমীন পাঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে প্রমাণিত নয়, চার খলীফা থেকেও নয়। এ প্রসঙ্গে যে বর্ণনাগুলো পাওয়া যায় তা আপত্তিমুক্ত নয়।' (আছারুস সুনান)●

সূরা মিলানো

সূরা ফাতিহা পড়ার পর ইমাম এবং একা নামায আদায়কারীর জন্য বিধান এই যে, তারা অন্য একটি সূরা কিংবা অন্তত একটি বড় আয়াত বা তিন ছোট আয়াত পড়বে। জোহর, আসর, ইশা এবং মাগরিবের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা

● এ ধরনের কিছু বর্ণনা ও পর্যালোচনা পরিশিষ্টে উল্লেখিত হয়েছে। দেখুন– পৃ. ৩৫২

ফাতিহার সঙ্গে অন্য আরেকটি সূরা মিলাবে। অবশিষ্ট রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। হযরত আবু কাতাদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَءُ فِي الظُّهْرِ فِى الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهٰكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهٰكَذَا فِي الصُّبْحِ. {بخارى : ما يقرء في الأخرين بفاتحة الكتاب}

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর ও আসরের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে দুই সূরা মিলাতেন এবং শেষ দু' রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। কখনো কখনো এক আয়াত জোরে পড়ে আমাদের শোনাতেন। আর প্রথম রাকাআত দ্বিতীয় রাকাআত থেকে দীর্ঘ করতেন। আসর ও ফজরের নামাযও এভাবেই আদায় করতেন। (সহীহ বুখারী : ১/১০৭)

জোহর-আসরে অনুচ্চ স্বরে কিরাআত

একা নামায আদায়কারী এবং জামাতের নামাযে ইমাম জোহর ও আসরে অনুচ্চ স্বরে কিরাআত পড়বে। ফজর, জুমা, দুই ঈদ ও বিতর (জামাতে আদায়কালে) ইমাম জোরে কিরাআত পড়বে। মাগরিব-ইশার প্রথম দু' রাকাআতে জোরে এবং অবশিষ্ট রাকাআতে আস্তে কিরাআত পড়বে।

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ : أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَءُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ : بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. (بخارى : باب القراءة في العصر)

আবু মা'মার (রহ.) হযরত খাব্বাব (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর-আসরে কিরাআত পড়তেন কি ? হযরত খাব্বাব (রা.) উত্তরে বললেন, 'হাঁ।' আবু মা'মার পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কীভাবে বোঝা যেত ?' তিনি উত্তরে বললেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারক নড়া দেখে বোঝা যেত।' (সহীহ বুখারী : ১/১০৫)

রাফয়ে ইয়াদাইন (হাত ওঠানো)

কিরাআত সমাপ্ত হওয়ার পর সোজা রুকূ করবে। রুকূতে যাওয়ার সময় 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করবে না। তদ্রূপ রুকূ থেকে উঠে এবং তৃতীয় রাকাআতে দাড়িয়েও 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করবে না। যেহেতু এই পদ্ধতি হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারাও তা-ই ছিল, তাই এ পদ্ধতিই উত্তম।

প্রথম দলীল : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَلَا أُصَلِّيْ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ. (ترمذى : ما جاء في رفع اليدين، قال : حديث حسن)

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, 'আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের মতো নামায আদায় করব না?' এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং শুধু নামাযের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইন করলেন।" (জামে তিরমিযী ১/৩৫)

এই হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নামাযের শুরুতে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করতেন। এরপর আর করতেন না। প্রিয়নবীর সুন্নত অনুসারে আমাদেরও শুধু নামাযের শুরুতে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করা উচিত, অন্যত্র নয়।

মুহাদ্দিস আহমদ শাকির এ হাদীস সম্পর্কে বলেন—

هٰذَا الْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وَمَا قَالُوْهُ فِيْ تَعْلِيْلِهِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ. (ترمذى محقق ج ٢ ص ٤١)

"ইবনে হাযম ও অন্যান্য হাফিযুল হাদীস উপরের হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন। কেউ কেউ এর বর্ণনাগত যে 'ত্রুটি' আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন বস্তুত সেগুলো 'ত্রুটি' হিসেবে পরিগণিত নয়।"

২. আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী (রহ.) বলেন, "এই হাদীসের সকল রাবী সহীহ মুসলিমের রাবী।" (আল-জাওহারুন নাকী : ২/৭৮)

স্মর্তব্য যে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) "সুনান" গ্রন্থে ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর যে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন তা এই বর্ণনা সম্পর্কে নয়, অন্য আরেকটি বর্ণনা সম্পর্কে, যা নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু প্রথমবার হাত উঠিয়েছেন।'

এ দুই বর্ণনার মধ্যে প্রভেদ না করায় অনেক আলেম বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন কিংবা অন্যকে বিভ্রান্ত করেছেন। (দেখুন : নাসবুর রায়াহ : ১/৩৯৪)

এজন্য সুনানে তিরমিযীর বিভিন্ন নুসখায় দ্বিতীয় বর্ণনাটি ভিন্ন শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইবনুল মুবারকের মন্তব্যও রয়েছে সেখানে। অতএব তার ওই মন্তব্য আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে নয়।

(দেখুন– জামে তিরমিযী, তাহকীক আহমদ শাকির : ২/৪১)

এখানে মুহাদ্দিস আহমদ শাকিরের পর্যালোচনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লেখেন—

وَذَهَبُوا يُصَحِّحُونَ بَعْضَ الْأَسَانِيْدِ وَيُضَعِّفُونَ انْتِصَارًا لِمَذْهَبِهِمْ، وَتَرَكُوا أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ سَبِيْلَ الْإِنْصَافِ وَالتَّحْقِيْقِ. (ترمذى محقق ج ٢ ص ٤٢)

অর্থাৎ 'রাফয়ে ইয়াদাইন' বিষয়ে (একশ্রেণীর মানুষ) জয়ীফ হাদীসকে সহীহ ও সহীহ হাদীসকে জয়ীফ সাব্যস্ত করার প্রয়াস পেয়ে থাকে। তাদের অধিকাংশই নীতি ও ইনসাফ বিসর্জন দিয়ে থাকে।'

বর্তমান সময়ের কিছু গায়রে মুকাল্লিদও তাদের সমশ্রেণীর পূর্বের লোকদের মতো সহজ সরল জনগণকে একথা বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, 'রাফয়ে ইয়াদাইন' না করার বিষয়ে যে হাদীস এসেছে সেগুলো জয়ীফ। তাদের এ কথায় যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হন এজন্য আমরা এ বিষয়ের হাদীসগুলোর সঙ্গে বড় বড় মুহাদ্দিসের স্বীকৃতিও উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় দলীল : রাফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে হাদীসের বারণ

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, "(একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন—

مَا لِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ اُسْكُنُوْا فِي الصَّلَاةِ. (مسلم : الأمر بالسكون في الصلاة)

'কী ব্যাপার, আমি তোমাদের হাত ওঠাতে কেন দেখি যেন তা বেয়াড়া ঘোড়ার উর্ধ্বে -উত্থিত লেজ! তোমরা নামাযে স্থির থাকবে'।"

(সহীহ মুসলিম : ১/১৮১)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থিরতার সঙ্গে নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। আর হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ীই যেহেতু রাফয়ে ইয়াদাইন স্থিরতা-পরিপন্থী তাই আমাদের কর্তব্য হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতো স্থিরতার সঙ্গে নামায পড়া।

উল্লেখ্য, সহীহ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের সময় 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করতে নিষেধ করেছেন। সেই হাদীসেও "كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ" 'বেয়াড়া ঘোড়ার উর্ধ্বে-উত্থিত লেজের ন্যায়' শব্দটি এসেছে। এখান থেকে কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, উভয় বর্ণনার বিষয়বস্তু এক। এ ধারণা ঠিক নয়। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন হাদীস এবং দুই হাদীসে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে। নিম্নে বর্ণনা দু'টির পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হল।

১. হযরত জাবির (রা.) দুই বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ছিল–

مَالِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟

"আমি তোমাদের হাতগুলো এমন কেন দেখছি যেন তা বেয়াড়া ঘোড়ার উর্ধ্বে-উত্থিত লেজ?"

আর দ্বিতীয় বর্ণনায় অর্থাৎ যেখানে সালামের সময় হাত ওঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে–

عَلَامَ تُوْمِئُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ، إِنَّمَا يَكْفِيْكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلٰى أَخِيْهِ مَنْ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ.

'তোমরা তোমাদের হাতগুলো দ্বারা কীসের ইঙ্গিত কর যেন সেগুলো বেয়াড়া ঘোড়ার উর্ধ্বে উত্থিত লেজ। তোমাদের করণীয় কেবল এটুকু যে, উরুর উপর হাত রাখবে অতঃপর ডানে বামে উপবিষ্ট ভাইদের সালাম দিবে।'

এই দুই বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য একদম স্পষ্ট।

২. এই হাদীসে আছে, 'আমরা একা একা নামায পড়ছিলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন...।' অথচ দ্বিতীয় বর্ণনার বক্তব্য হল, 'আমরা জামাতের নামাযে সালামের সময় হাতদ্বারা ইশারা করলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন...।'

৩. এই হাদীসে اُسْكُنُوْا فِي الصَّلَاةِ 'নামাযে স্থিরতা অবলম্বন কর' বাক্যটি আছে। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসে তা নেই।

৪. এই হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসে এসেছে, সালামের সময় ডানে-বামে হাত দিয়ে ইশারা করতে নিষেধ করেছেন।

দুই বর্ণনার মধ্যে এতগুলো পার্থক্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কীভাবে এদের বিষয়বস্তু এক বলা যায়? আর এটাইবা কীভাবে সম্ভব যে, হযরত জাবির (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ সাহাবী একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন শব্দে, ভিন্ন মর্মে ও ভিন্ন প্রেক্ষাপটসহ বর্ণনা করবেন?

সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী বর্ণনা করতেন কোনো ধরনের সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া। তাই এটা পরিষ্কার যে, এ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন হাদীস এবং উভয় হাদীসের বিষয়বস্তুও ভিন্ন।

তৃতীয় দলীল : হযরত উমর (রা.)-এর আমল

আসওয়াদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُوْدُ. (طحاوى : رفع اليدين)

صَحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ، وَفِي الدِّرَايَةِ ١ : ١٥٢ : وَهٰذَا رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَفِي الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ ٢ : ٧٥ : وَهٰذَا سَنَدٌ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ .

قَالَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ : وَفِعْلُ عُمَرَ هٰذَا وَتَرْكُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ عَلٰى ذٰلِكَ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ عَلٰى أَنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِيْ لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ.

'আমি হযরত উমর (রা.)কে দেখেছি, তিনি শুধু প্রথম তাকবীরের সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন, পরে করতেন না।' (তহাবী : ১/১৬৪)

আল্লামা যায়লায়ী (রহ.) এই হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন। সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এই বর্ণনার সকল রাবীকে 'ছিকাহ' (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। আলজাওহারুন নাকী গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'এই হাদীসের সনদ সহীহ মুসলিমের সনদের মতো শক্তিশালী।'

ইমাম তহাবী (রহ.) বলেন, 'হযরত উমর (রা.)-এর আমল এবং এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর কোনোরূপ বিরোধিতা না থাকাই প্রমাণ করে যে, এটিই সঠিক পদ্ধতি এবং এ পদ্ধতির বিরোধিতা করা কারও জন্য উচিত নয়।'

(তহাবী : ১/১৬৪)

চতুর্থ দলীল : হযরত আলী (রা.)-এর আমল

আসিম ইবনে কুলাইব (রহ.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন—

إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ. (بيهقى : من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح)

"হযরত আলী (রা.) নামাযে প্রথম তাকবীরে হাত ওঠাতেন এরপর আর হাত ওঠাতেন না।" (সুনানে বায়হাকী : ২/৮০)

আল্লামা যায়লায়ী (রহ.) বর্ণনাটিকে 'সহীহ' বলেছেন। সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, 'এ বর্ণনার সকল রাবী ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য)।' সহীহ বুখারীর অপর ভাষ্যকার আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, 'এ সনদটি সহীহ মুসলিমের সনদের সমমানের।'

(নাসবুর রায়াহ : ১/৪০৬; উমদাতুল কারী : ৫/২৭৪; দিরায়াহ : ১/১১৩)

পঞ্চম দলীল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর আমল

মুজাহিদ (রহ.) বলেন—

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولٰى مِنَ الصَّلَاةِ. (طحاوى : باب رفع اليدين)

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِيْ أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ. (ابن ابى شيبة. المصنف ج ١ ص ٢٣٧)

وفي الجوهر النقي ج ٢ ص ٧٤ : وهذا سند صحيح.

'আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না।' (তহাবী : ১/১৬৩; ইবনে আবী শাইবা : ২/৪১৮ হাদীছ নং ২৪৬৭; [শায়খ আওয়ামা দা. বা. তাহকীকৃত নুসখা)

আল্লামা তুরকুমানী (রহ.) বলেছেন, 'এ বর্ণনার সনদ সহীহ।'

(আল-জাওহারুন নাকী)

ষষ্ঠ দলীল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল

আসওয়াদ (রহ.) বলেছেন—

إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

(جامع المسانيد ج ١ ص ٣٥٥)

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) শুধু প্রথম তাকবীরের সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন, এরপর আর করতেন না।' (জামিউল মাসানীদ)

সপ্তম দলীল : খুলাফায়ে রাশেদীন ও রাফয়ে ইয়াদাইন

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা নীমাভী (রহ.) খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা বিষয়ক বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে—

وَأَمَّا الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ رفع الأَيْدِيْ فِيْ غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. (آثار السنن ج ١ ص ١٠٩)

'খুলাফায়ে রাশেদীন শুধু প্রথম তাকবীরের সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন। অন্য সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।'

(আছারুস সুনান)

খুলাফায়ে রাশেদীন হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর পর মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহর সত্যিকারের অনুসারী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সুন্নাহ্‌কেও নিজের সুন্নাহ্‌র মতো অনুসরণীয় ঘোষণা করেছেন। কেননা, তাঁদের সুন্নাহ ছিল নবীর সুন্নাহ থেকেই গৃহীত। তাই তাঁরা যখন নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো স্থানে হাত ওঠাতেন না তখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁদের কাছেও নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন না করা উত্তম। আর এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ।

অষ্টম দলীল : সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন—

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. (ترمذى : رفع اليدين)

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর (রাফয়ে ইয়াদাইন না করা সংক্রান্ত) হাদীস 'হাসান' পর্যায়ে উত্তীর্ণ এবং অনেক আহলে ইলম সাহাবা-তাবেয়ীন এই মত পোষণ করতেন। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) ও কুফাবাসী ফকীহগণ এই ফতোয়া দিয়েছেন।' (জামে তিরমিযী : ১/৩৫)

আল্লামা ইবনে আবদুল বার (রহ.) রাফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান এভাবে বর্ণনা করেছেন—

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلٰى أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْحَسَنُ عَنِ الصَّحَابَةِ : أَنَّ مَنْ رَفَعَ مِنْهُمْ لَمْ يَعِبْ عَلٰى مَنْ تَرَكَهُ. (التمهيد ج ٩ ص ٢٢٦)

"হযরত হাসান (রা.) সাহাবায়ে কেরামের কর্মনীতি সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁদের মধ্যে যারা রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন তারা রাফয়ে ইয়াদাইন পরিত্যাগকারীদের উপর কোনো আপত্তি করতেন না।' এ থেকে বোঝা যায়, রাফয়ে ইয়াদাইন জরুরি কিছু নয়।" (আত-তামহীদ : ৯/২২৬)

এ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই একাধিক কর্মধারা ছিল। কেউ নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কিছু স্থানেও রাফয়ে ইয়াদাইন করা উত্তম মনে করতেন। কেউ তা মনে করতেন না। তবে এ বিষয়ে তাদের অভিন্ন কর্মনীতি এই ছিল যে, যারা রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন তারা অন্যদের সম্পর্কে আপত্তি করতেন না।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা এবং যারা রাফয়ে ইয়াদাইন করেন না তাদেরকে আপত্তি ও সমালোচনার নিশানা বানানো প্রকারান্তরে সাহাবীদেরই নিন্দা ও সমালোচনা করা। বলাবাহুল্য, এ শ্রেণীর মানুষ সাহাবায়ে কেরামের নীতি ও পথ থেকে বিচ্যুত।

নবম দলীল : মদীনাবাসী ও রাফয়ে ইয়াদাইন

উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন ইমাম মালিক (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন ৯৩ হিজরীতে। ইলমের অন্যতম কেন্দ্রভূমি মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর জীবন কেটেছে। সাহাবায়ে

কেরামের আমল এবং হাদীস শরীফের বিশাল ভাণ্ডার তাঁর সামনে ছিল। তিনি শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মদীনাবাসীর কর্মকে বুনিয়াদী বিষয় বলে মনে করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শাগরিদ আল্লামা ইবনুল কাসিম (রহ.) রাফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে তাঁর যে সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন তা এই–

قَالَ مَالِكٌ : لَا أَعْرِفُ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ تَكْبِيْرِ الصَّلَاةِ، لَا فِيْ خَفْضٍ وَلَا فِيْ رَفْعٍ إِلَّا فِيْ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَكَانَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ضَعِيْفًا اِلَّا فِيْ تَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ. (المدونة الكبرى ج ١ ص ٧١)

"ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, 'নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো তাকবীরের সময়, নামাযে ঝুঁকার সময় কিংবা সোজা হওয়ার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করার নিয়ম আমার জানা নেই'।" ইবনুল কাসিম (রহ.) আরো বলেন, "ইমাম মালিক নামাযের প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে রাফয়ে ইয়াদাইন করার পদ্ধতিকে (দলীলের বিবেচনায়) দুর্বল মনে করতেন।"

(আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা)

দশম দলীল : ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)-এর ফতোয়া

ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) বলেন—

لَا تَرْفَعِ الْاَيْدِيْ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِكَ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى. (جامع المسانيد ج ١ ص ٣٥٣)

'নামাযের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইন করার পর অন্য কোথায় রাফয়ে ইয়াদাইন করো না।' (জামিউল মাসানীদ : ১/৩৫৩)

সারকথা

উপরোক্ত দালীলিক আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো প্রমাণিত হচ্ছে তা নিম্নরূপ :

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনা সম্বলিত হাদীস থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন না-করা উত্তম।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ববাস-প্রবাসের সার্বক্ষণিক সহচর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন, এরপর আর করতেন না।

৩. হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীস থেকে জানা যায়, স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করতে নিষেধ করেছিলেন।

৪. দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বিশুদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে যে, তাঁদের কাছেও রাফয়ে ইয়াদাইন না করাই ছিল অধিক শুদ্ধ ও অগ্রগণ্য। আর এ সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবীদের দ্বিমত বর্ণিত না হওয়া থেকে প্রমাণ হয় যে, অধিকাংশ সাহাবী এ নিয়ম অনুসরণ করতেন।

৫. খুলাফায়ে রাশেদীন নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন করেছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই।

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যযুগের অব্যবহিত পরেই ছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ। তাঁদের রাফয়ে ইয়াদাইন না-করা প্রমাণ করে যে, তাঁদের মতেও নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন না করাই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ আমল।

৭. নামাযের ভিতরে রাফয়ে ইয়াদাইনপ্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের যুগেও একাধিক নিয়ম ছিল। তবে দলীল-প্রমাণের আলোকে তাঁদের নিয়মই অগ্রগণ্য যাঁরা রাফয়ে ইয়াদাইন না-করা উত্তম মনে করতেন।

৮. সহীহ সনদে এসেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। তিনি রাফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গ ও তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। অতএব রাফয়ে ইয়াদাইন করণীয় প্রমাণের জন্য ইবনে উমর (রা.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত উপস্থাপন করা উচিত নয়।●

রুকূ

কিরাআত সমাপ্ত করার পর আল্লাহু আকবার বলে রুকূতে যাবে। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(بخارى : باب إتمام التكبير في الركوع)

আবু হুরায়রা (রা.) মুসল্লীদের নিয়ে নামায আদায় করতেন। নামাযের কোনো রুকন আদায়ের জন্য যখনই নিচু হতেন বা নিচু অবস্থা থেকে উঠতেন

● রাফয়ে ইয়াদাইন-প্রসঙ্গে আরো কিছু আলোচনা ও কিছু রেওয়ায়েতের পর্যালোচনা পরিশিষ্টে দেখুন। পৃষ্ঠা ৪২১

তখন আল্লাহু আকবার বলতেন। নামায সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি বলেছেন, আমার এই নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের মতো। (সহীহ বুখারী : ১/১০৮)

রুকূতে পিঠ সোজা রাখা

রুকূতে কোমর ও মাথা একসমান থাকবে। মাথা কোমর থেকে উঁচুও হবে না, নিচুও হবে না। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. {ترمذى : من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود. قال : حسن صحيح}

'যে নামাযের রুকূতে নামাযী তার পিঠ সোজা রাখে না সে নামায যথেষ্ট নয়।' (জামে তিরমিযী : ১/৩৬)

রুকূর সুন্নত পদ্ধতি

রুকূর সুন্নত পদ্ধতি হল, তাকবীর দিয়ে রুকূতে যাবে। রুকূতে কোমর ও মাথা সমান থাকবে। দুই হাত হাটুর উপর থাকবে এবং হাতের কনুই শরীর থেকে আলাদা থাকবে। ধীর-স্থিরভাবে রুকূ করবে।

সালিম আল-বাররা (রহ.) বলেন—

أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْنَا لَهُ : حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ، فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ، وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هٰذِهِ الرَّكْعَةِ، فَصَلَّى صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ : هٰكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي. (أبو داود : صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

"আমরা হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। একথা শুনে হযরত আবু মাসউদ আমাদের সামনে দাড়ালেন এবং তাকবীর দিয়ে নামায আরম্ভ করলেন। রুকূতে গিয়ে দুই হাত এমনভাবে রাখলেন যে, হাত হাটুর উপর ছিল, হাতের আঙুলগুলো তার নিচে ছিল, আর কনুই পাঁজর থেকে দূরে ছিল। এভাবে থাকলেন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির হওয়া পর্যন্ত। এরপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে মাথা ওঠালেন এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির হওয়া পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকলেন। এরপর তাকবীর দিয়ে সাজদায় গেলেন। হাত ভূমির উপর রাখলেন এবং কনুই পাঁজর থেকে দূরে রাখলেন। শরীরের সকল অঙ্গ স্থির হওয়া পর্যন্ত সাজদায় থাকলেন। এরপর সাজদা থেকে মাথা ওঠালেন এবং স্থির হয়ে বসলেন। এভাবে চার রাকাআত আদায় করে নামায সমাপ্ত করলেন। এরপর বললেন, 'আমরা এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি'।"

(সুনানে আবু দাউদ : ১/১২৬)

রুকূর তাসবীহ

রুকূতে গিয়ে তিন বার বা পাঁচ বার এই তাসবীহ পাঠ করবে-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

'আমার মহান পালনকর্তা সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র'।

হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) বলেন—

لَمَّا نَزَلَتْ ((فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ)) قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ((سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى)) قَالَ : اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ. (أبو داود : ما يقول الرجل في ركوعه

قال الحاكم فى المستدرك : صحيح الإسناد، ورواه ابن حبان في صحيحه.

(نصب الراية ١ : ٣٧٦)

"যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই তাসবীহ তোমাদের রুকূতে পাঠ

করবে।' আর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল– سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই তাসবীহ সাজদায় পাঠ করবে'।" (সুনানে আবু দাউদ : ১/১২৬)

হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى. (ترمذى : ما جاء في التسبيح في الركوع) (حسن صحيح)

'তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ বলতেন এবং সাজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলতেন।' (জামে তিরমিযী : ১/৩৬)

তাসমী' ও তাহমীদ

এরপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। জামাতের সঙ্গে নামায আদায়কালে ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে এবং মুকতাদী رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে—

ثُمَّ يَقُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ... الحديث

(بخارى : باب التكبير إذا قام من السجود)

'হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ থেকে ওঠার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন এবং সোজা হয়ে দাড়ানোর পর رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন।' (সহীহ বুখারী : ১/১০৯)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার পর حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ বলা মুস্তাহাব। এর অনেক ফযীলত রয়েছে।

হযরত রিফা'আ যুরাকী (রা.) বলেন—

كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ : أَنَا. قَالَ : رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.

(بخاری : فضل اللهم ربنا ولك الحمد)

'একদিন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়ছিলাম। রুকূ থেকে ওঠার সময় তিনি যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন তখন এক মুক্তাদী বলল, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ, নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ওই কথাটি কে বলেছিল ? সেই সাহাবী জানালেন যে, তিনি বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি দেখলাম, ত্রিশজনেরও বেশি ফেরেশতা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে কে তা আগে লিখতে পারে'।" (সহীহ বুখারী : ১/১১০)

সাজদা

রুকূর পর আল্লাহু আকবার বলতে বলতে সাজদায় যাবে। সাজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাটু ভূমিতে রাখবে। এরপর যথাক্রমে হাত, নাক ও কপাল রাখবে। সাজদা থেকে ওঠার সময় হবে এর বিপরীত। সাজদারত অবস্থায় দুই কনুই পাঁজর থেকে দূরে থাকবে।

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) বলেন—

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (ترمذی : ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود)

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, সাজদায় যাওয়ার সময় ভূমিতে হাত রাখার আগে হাটু রাখতেন এবং ওঠার সময় হাটুর আগে হাত ওঠাতেন।' (জামে তিরমিযী : ১/৩৬)

সাজদার তাসবীহ

সাজদায় যেয়ে এই তাসবীহ পড়বে–

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ

আমার পালনকর্তা সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী, সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র।

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন—

إِنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ. (ترمذى : ما جاء في التسبيح في الركوع. قال : حسن صحيح)

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়েছি। তিনি রুকূতে বলতেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' এবং সাজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা'।" (জামে তিরমিযী : ১/৩৬)

সাজদায় ভূমির উপর কনুই বিছিয়ে দিবে না। কেননা তা সাজদার নিয়ম পরিপন্থী।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

(مسلم : الاعتدال في السجود)

'সাজদায় ইতিদাল অবলম্বন করবে (অর্থাৎ ধীরস্থিরভাবে সাজদা করবে) আর কেউ যেন সাজদায় কনুই বিছিয়ে না দেয় যেভাবে কুকুর কনুই বিছিয়ে বসে।' (সহীহ মুসলিম : ১/১৯৩)

সাজদার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

সাজদা সাত অঙ্গের দ্বারা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে কোনো এক অঙ্গও যদি ভূমিতে না রাখা হয় তবে সাজদা ত্রুটিপূর্ণ হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

أُمِرتُ أَن أسجُدَ على سَبعةِ أعظُمٍ : عَلَى الجَبهَةِ وأشار بيدِهِ على أنفِهِ، واليدينِ والرُّكبتينِ، وأطرافِ القدمينِ، ولا نكفتَ الثِّيابَ والشَّعرَ.

(بخاري : باب السجود على الأنف)

'আমি সাত অস্থিতে সাজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। কপাল-নাক, দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুল।' তিনি আমাদের আরও আদেশ করেছেন, আমরা যেন নামাযরত অবস্থায় কাপড় গোটাতে এবং চুল বিন্যস্ত করতে আরম্ভ না করি। (সহীহ বুখারী : ১/১১২)

সাজদার সুন্নত পদ্ধতি

সাজদার মধ্যে হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিত করে এভাবে ভূমিতে রাখবে যেন তা কিবলামুখী থাকে।

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত—

إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَينَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. (حاكم، صحيح على شرط مسلم)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ করতেন তখন আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখতেন। আর যখন সাজদা করতেন তখন মিলিত করে রাখতেন।' (মুসতাদরাকে হাকিম : ১/২২৪, ২২৭)

সাজদায় হাত এমনভাবে ভূমিতে রাখবে যেন হাতের পাতা কিছুটা কাঁধ বরাবর এবং হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কান বরাবর থাকে। এভাবে রাখলে দুই বর্ণনার উপরই আমল হয়।

প্রথম বর্ণনা : আবু হুমাইদ সায়িদী (রা.) থেকে বর্ণিত—

إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمكَنَ أَنفَهُ وَجَبهَتَهُ الأَرضَ وَنَحَّى يَدَيهِ عَن جَنبِهِ وَوَضَعَ كَفَّيهِ حَذوَ مَنكِبَيهِ. (ترمذى : ما جاء في السجود على الجبهة والأنف)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাজদায় যেতেন তখন নাক ও কপাল ভালোভাবে ভূমিতে রাখতেন। বাহু পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন এবং হাতের পাতা কাঁধ বরাবর রাখতেন।' (জামে তিরমিযী : ১/৩৬)

দ্বিতীয় বর্ণনা : আবু ইসহাক (রহ.) বলেন, আমি বারা ইবনে আযিব (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় মুখমণ্ডল কোথায় রাখতেন ? তিনি উত্তরে বললেন—

بَيْنَ كَفَّيْهِ. (حديث حسن غريب) {ترمذى : ما جاء اين يضع الرجل وجهه}

'দুই হাতের মধ্যখানে।' (তিরমিযী : ১/৩৭)

জলসা

প্রথম সাজদা থেকে তাকবীর বলতে বলতে সোজা হয়ে বসবে। এ সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়া মুস্তাহাব :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ. (ترمذى : ما يقول بين السجدتين)

অর্থ : ইয়া আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমার অবস্থা দুরস্ত করে দিন, আমাকে হিদায়েত দিন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।' (তিরমিযী : ১/৩৮)

কিয়াম

দুই সাজদা সমাপ্ত হলে দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং এ বিষয়ে উম্মাহর পূর্বসূরী ব্যক্তিদের ইজমা রয়েছে। হযরত সাহল (রা.)-এর পুত্র সা'দ সায়িদী থেকে বর্ণিত—

ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ. (ابو داود : من ذكر التورك في الرابعة. صححه النيموي)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর দিয়ে সাজদা করলেন এরপর তাকবীর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন, বসলেন না।'
(সুনানে আবু দাউদ : ১/১৩৮; আছারুস সুনান : পৃ. ১৫২)

সাহাবায়ে কেরামের আমল

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল বর্ণনা করেছেন—

فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ وَلَا يَجْلِسُ إِذَا صَلَّى فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ حِينَ يَقْضِي السُّجُودَ. (بيهقى : من قال يرجع على صدور قدميه)

'আমি দেখেছি যে, প্রথম রাকাআতে সাজদার পর তিনি বসতেন না; বরং সোজা দাড়িয়ে যেতেন।' (বায়হাকী : ২/১২৫)

এছাড়া হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণের আমলও এমন ছিল। অর্থাৎ তারা সাজদা শেষে সোজা দাড়িয়ে যেতেন, বসতেন না।

(আল-জাওহারুন নাকী : ২/১২৫; নাসবুর রায়া : ১/৩৮৯)

সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বর্ণনা করেন—

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ : أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ نَهَضَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ. (الدراية ج ١ ص ١٤٧)

"নুমান ইবনে আবি আইয়াশ বলেন, 'আমি অনেক সাহাবীর দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাঁরা প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতে যখন সাজদা থেকে মাথা ওঠাতেন তখন বসতেন না, সোজা দাড়িয়ে যেতেন'।" (আদদিরায়া)

ইজমায়ে উম্মত

এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের পর না বসে সোজা দাড়িয়ে যাওয়া উচিত।

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ نَهَضَ وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا الشَّافِعِيَّ. (الجوهر النقي ج ٢ ص ١٢٦)

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ব্যতীত সালাফের সকল ব্যক্তিত্ব এ বিষয়ে একমত যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতে দ্বিতীয় সাজদার পর সোজা দাড়িয়ে যাবে।

(আল-জাওহারুন নাকী)

দ্বিতীয় রাকাআত প্রথম রাকাআতের মতোই পূর্ণ করবে। কেবল ছানা ও আউযুবিল্লাহ পড়বে না। শুধু সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ে রুকু সাজদা করবে।

জলসা ইস্তিরাহাত বা বিশ্রামের বৈঠক

জলসা ইস্তিরাহাত বা দ্বিতীয় সাজদার পর দাড়ানোর আগে সংক্ষিপ্ত বৈঠক নামাযের মাসনূন নিয়ম নয়। অনেক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁদের বিবরণে এই জলসার উল্লেখ পাওয়া যায় না। শুধু মালিক ইবনুল হুয়াইরিছ (রা.)-এর একটি বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জলসা ইস্তিরাহাত করেছেন। অন্যান্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জলসা ইস্তিরাহাত করতেন না। ইমাম তহাবী (রহ.) এ বিষয়ের সকল হাদীস আলোচনা করে বলেন—

فَلَمَّا تَخَالَفَ الْحَدِيْثَانِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَهُ فِي حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِهِ، فَقَعَدَ مِنْ أَجْلِهَا، لَا لِأَنَّهُ ذٰلِكَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ. وَقَالَ : وَلَوْ كَانَتْ هٰذِهِ الْجَلْسَةُ مَقْصُودَةً لَشُرِعَ لَهَا ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ.

(طحاوى باختصار في العبارة ٢/٣٧٦)

'যেহেতু দু' ধরনের বর্ণনায় বাহ্যত বৈপরীত্ব দেখা যাচ্ছে তাই মালিক ইবনুল হুয়াইরিছ (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা এই হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিশেষ ওজরে এই জলসা করেছেন, নামাযের মাসনূন নিয়ম হিসেবে করেননি। (অন্যথায় অন্যান্য বর্ণনায় তা থাকত) যদি এই জলসা নামাযের অঙ্গ হত তাহলে এর মধ্যে বিশেষ কোনো যিকির অবশ্যই থাকত।' (তহাবী : ২/৩৭৬)

ইমাম তহাবী (রহ.)-এর সিদ্ধান্তের সমর্থন ওই রেওয়ায়াত থেকেও পাওয়া যায় যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, 'বার্ধক্যের কারণে আমার শরীর ভারি হয়ে গেছে।' এই বিশেষ ওজরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদা থেকে উঠে বসতেন, তারপর দাঁড়াতেন।

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ. إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ. (ابن ماجه : النهي ان يسبق الإمام بالركوع)

'তোমরা রুকূ ও সাজদায় আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না। রুকূতে যাওয়ার সময় মুহূর্তকাল যদি তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী থাকি তাহলে রুকূ থেকে ওঠার সময় তোমরা আমার সমান হয়ে যাবে। তদ্রূপ সাজদায় যাওয়ার সময় যদি মুহূর্তকাল তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী থাকি তবে সাজদা থেকে ওঠার সময় তোমরা আমার সমান হয়ে যাবে (অর্থাৎ তাহলে আমার ও তোমাদের রুকূ-সাজদায় সমান সময় কাটানো হল।) আমার দেহ ভারী হয়ে গিয়েছে।'

(ইবনে মাজা : পৃ. ৬৮)

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রহ.) বলেন—

وَلَوْ كَانَ هَدْيَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَهَا دَائِمًا لَذَكَرَهَا كُلُّ وَاصِفٍ لِصَلَاتِهِ، وَ مُجَرَّدُ فِعْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُلُّ عَلٰى أَنَّهَا مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ، إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ جَعَلَهَا سُنَّةً يَقْتَدٰى بِهٖ فِيْهَا، وَأَمَّا إِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ فَعَلَهَا لِلْحَاجَةِ لَمْ يَدُلَّ عَلٰى كَوْنِهَا سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ. (ملحض زاد المعاد ج ١ ص ٢٤٠)

'এটি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাধারণ নিয়ম হত তবে তাঁর নামাযের বিবরণ যারা দিয়েছেন তারা সকলেই তা উল্লেখ করতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজ করেছেন শুধু এটুকু বিবরণ থেকে তা নামাযের সুন্নত সাব্যস্ত হয় না; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজটি সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন বলে জানা গেলে তা সুন্নত হিসেবে গৃহীত হয়। অতএব যখন মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, তিনি কোনো প্রয়োজন বশত তা করেছেন তখন তা নামাযের সুন্নত হিসেবে গণ্য করা যাবে না।' (যাদুল মাআদ সংক্ষিপ্ত)

সারকথা এই যে, হাদীস শরীফে জলসা ইস্তিরাহাত-এর উল্লেখ নামাযের মাসনূন আমল হিসেবে পাওয়া যায় না। যেহেতু শেষ বয়সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজরের কারণে জলসা ইস্তিরাহাত করেছেন তাই এ জলসা সুন্নত নয়। এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে।

ক্বাদা (বৈঠক)

দ্বিতীয় রাকাআতে দুই সাজদার পর 'আত্তাহিয়্যাতু'র জন্য বসবে। বসার নিয়ম নিম্নোক্ত হাদীসে এসেছে :

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

وكَانَ يَقُولُ : فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ... (مسلم : صفة الصلاة)

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতি দু' রাকাআতে আত্তাহিয়্যাতু রয়েছে।' আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ বৈঠকে) বাম পা বিছাতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।"

(সহীহ মুসলিম : ১/১৯৪)

তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

নামাযের বৈঠকে নিম্নোক্ত তাশাহহুদ পড়বে—

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا ، وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

অর্থ : সকল মৌখিক ইবাদত, সকল দৈহিক ইবাদত এবং সকল আর্থিক ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি হোক এবং আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল নেক বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া বন্দেগীর উপযুক্ত আর কেউ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত—

كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ : إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. (مسلم : التشهد في

الصلاة. بخاري : التشهد في الاخرة)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায়কালে আমরা বলতাম, 'আল্লাহর প্রতি সালাম, অমুকের প্রতি সালাম।' একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তাআলা সালাম। নামাযে তোমরা যখন বসবে তখন বলবে, আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি...। এরপর যে দুআ চাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর'।"

(সহীহ মুসলিম : ১/১৭৩; সহীহ বুখারী : ১/১১৫)

আঙ্গুল দ্বারা ইশারা

বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটতম আঙ্গুলকে শাহাদাত আঙ্গুল বলা হয়। নামাযী নামাযের মধ্যে যখন মৌখিকভাবে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় তখন তার আঙ্গুলও এই সাক্ষ্য দিবে। এজন্য আত্তাহিয়্যাতু পড়তে পড়তে যখন ((أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ)) পর্যন্ত পৌছবে তখন বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা দ্বারা গোলক বানাবে এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে। আর কনিষ্ঠা ও অনামিকা হাতের তালুর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। ((إِلَّا اللّٰهُ)) বলার পর শাহাদাত অঙ্গুলি নিচু করবে। তবে অন্য আঙ্গুলগুলো আপন অবস্থায় নামাযের শেষ পর্যন্ত থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

(مسلم : صفة الجلوس في الصلاة)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুআর জন্য বসতেন তখন ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন। তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মধ্যমার সঙ্গে মিলিত করতেন।...'

(সহীহ মুসলিম : ১/২১৬)

কেউ কেউ আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করার পরিবর্তে আঙ্গুল নাড়াতে থাকে। তারা সম্ভবত নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে এ কাজ করে থাকেন।

ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত—

"... ثُمَّ قَبَضَ ثَلَاثَةً مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا"

"এরপর তিনি তিন আঙ্গুল মিলিত করে হালকা বানালেন এবং তর্জনী উঁচু করলেন। আমি দেখলাম, তিনি তর্জনী নাড়াচ্ছেন ও দুআ করছেন।"

(সুনানে বায়হাকী : ২/১৩২)

কিন্তু অন্য বর্ণনায় এসেছে– আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুআ করতেন তখন তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন এবং তা নাড়াতেন না।' (সুনানে বায়হাকী : ২/১৩২)

তো নামাযে তর্জনী নাড়াতে থাকলে দ্বিতীয় হাদীস মোতাবেক আমল হয় না। প্রথম হাদীস মোতাবেক আমল হয় কি না– এ সিদ্ধান্তের জন্য প্রথমে সে হাদীসের সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা কর্তব্য।

এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন—

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا، لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. (سنن بيهقى)

'ওয়াইল (রা.)-এর বর্ণনায় يُحَرِّكُهَا শব্দের মর্ম নাড়ানো নয়, শুধু ইশারা করাও হতে পারে। তাহলে তার বর্ণনাও ইবনুয যুবাইর (রা.)-এর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাবে।' (সুনানে বায়হাকী : ২/১৩২)

কিয়াম

নামায তিন রাকাআত বা চার রাকাআতবিশিষ্ট হলে 'আত্তাহিয়্যাতু'র পর সোজা দাড়িয়ে যাবে এবং পূর্বোক্ত নিয়মেই নামায সমাপ্ত করবে। ফরয নামাযে (ইমাম ও একা নামায আদায়কারী) তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য কোনো সূরা পড়বে না। সুন্নত বা নফল নামাযে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলাবে।

হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَءُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ ... (بخارى : يقرء في الأخريين بفاتحة الكتاب)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও দুই সূরা পড়তেন এবং শেষ দুই রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। কখনো আমাদেরকে এক আয়াত (জোরে পড়ে) শোনাতেন।'

(সহীহ বুখারী : ১/১০৭)

দরূদ শরীফ

দুই রাকাআতবিশিষ্ট নামায হলে আত্তাহিয়্যাতুর পর দরূদ শরীফ পড়বে। আর তিন বা চার রাকাআতবিশিষ্ট নামায হলে প্রথম বৈঠকে দরূদ পড়বে না। শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দরূদ পড়বে। দরূদ এই—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

আবু মাসউদ আনসারী (রা.) বলেন, "আমরা সা'দ ইবনে উবাদা (রা.)-এর মজলিসে ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। বাশীর ইবনে সাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আরয করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আপনার প্রতি দরূদ পড়তে আদেশ করেছেন। আমরা কীভাবে দরূদ পড়ব ?' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বললেন না। আমরা তখন ভাবতে লাগলাম, সে যদি এই প্রশ্ন না করত! কিছুক্ষণ পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এরূপ বলবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ...

অর্থ : ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত নাযিল করুন যেমন আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।

ইয়া আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি বরকত নাযিল করুন যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।

(সহীহ মুসলিম : ১/১৭৫)

দুআ

দরূদ পড়ার পর কোনো একটি মাসনূন দুআ পড়বে। একাধিক দুআও পড়া যায়। হাদীস শরীফে এসেছে–

... ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. (مسلم)

'অতঃপর যে দুআ ইচ্ছা পড়বে।' (সহীহ মুসলিম : ১/১৭৩)

দুআয়ে ইবরাহীমী

رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (سورة ابراهيم : ٤٠ - ٤١)

অর্থ : ইয়া রব! আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে নামায আদায়কারী বানান। ইয়া রব! আমাদের দুআ কবুল করুন। ইয়া রব! কিয়ামতের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও সকল মুমিনকে আপনি ক্ষমা করে দিবেন।

আরেকটি দুআ

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (بقرة : ٢٠١)

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে নিয়ামত দিন, আখেরাতে ছওয়াব দিন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দিন।

আরেকটি দুআ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আবেদন করলেন—

عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ : قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (بخارى : باب الدعاء قبل السلام)

আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন, যা আমি নামাযে পড়ব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এই দুআ কর—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থ : ইয়া আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি। আর আপনি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নেই। আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই ক্ষমাকারী, করুণাময়। (সহীহ বুখারী : ১/১১৫)

সালাম

দুআর পর ডান দিকে বাম দিকে মুখ ফিরাবে এবং বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

হযরত আমের ইবনে সা'দ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন—

كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ حَتّٰى أَرٰى بَيَاضَ خَدِّهٖ. (مسلم : السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها)

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম ফিরাতে দেখেছি। তখন তাঁর চেহারা মোবারকের শুভ্রতা পিছন থেকে দৃষ্টিগোচর হত।' (সহীহ মুসলিম : ১/২১৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—

إِنَّهٗ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ. (ترمذى : ما جاء في التسليم في الصلاة) (حسن صحيح)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলতে বলতে ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম ফেরাতেন।' (জামে তিরমিযী : ১/৩৯)

ইমাম মানুষের দিকে মুখ করে বসবে

জামাতের নামাযে নামায শেষে ইমাম মুকতাদীদের দিকে ঘুরে বসবে।

হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) বলেন—

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

(بخاري : يستقبل الإمام الناس إذا سلم)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন।' (সহীহ বুখারী : ১/১১৭)

তাসবীহ

নামায শেষে মাসনূন তাসবীহ পাঠের অনেক ফযীলত রয়েছে।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا : يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، يَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيَعْتِقُونَ وَلَا نَعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ! تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً. قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا : سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا! فَصَنَعُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. (مسلم : استحباب الذكر بعد الصلاة)

"দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে আরয করলেন, 'সম্পদশালীরা জান্নাতের সমুচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেলেন!' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীভাবে তারা অগ্রগামী হয়ে গেল?' দরিদ্র

সাহাবীরা বললেন, 'নামায-রোযা ইত্যাদি আমল আমরাও করি, তারাও করেন, কিন্তু সম্পদশালী হওয়ার কারণে তারা দান-সদকা করে থাকেন, ক্রীতদাস মুক্ত করে থাকেন, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় শিখিয়ে দিব যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রগামী লোকদের কাছে পৌঁছে যাবে এবং পরবর্তীদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাবে আর ওই আমল করা ছাড়া কেউ তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারবে না ? তারা বললেন, 'অবশ্যই বলুন, ইয়া রাসূলুল্লাহ!' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা প্রতি নামাযের পর তেত্রিশ বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পড়বে'।"

বর্ণনাকারী বলেন, "কিছুদিন পর মুহাজির সাহাবীগণ পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের সম্পদশালী ভাইরা এই আমল সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং তারাও তা করতে আরম্ভ করেছেন!' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করে থাকেন'।"

(সহীহ মুসলিম : ১/২১৯)

হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. (مسلم : استحباب الذكر بعد الصلاة)

'নামায শেষের বাক্যগুলি যে পাঠ করে সে নিষ্কাম হয় না। বাক্যগুলি হল- তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার।' (সহীহ মুসলিম : ১/২১৯)

দুআয় হাত ওঠানো

নামাযের পর দুআ কবুল হয়। এ সময় মেহেরবান রবের নিকট যেকোনো দুআ করা যায়। আরবীতে বা নিজ নিজ মাতৃভাষায় ইখলাস ও মনোযোগের সঙ্গে দুআ করা উচিত। এ সময় দুআ করা মুস্তাহাব, তবে তা নামাযের অংশ নয়।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ (ترمذى)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা দয়ালু, দাতা। যখন বান্দা তাঁর সামনে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে তখন তা শূন্য ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।' (জামে তিরমিযী : ২/১৯৫)

আবু মুহাম্মাদ ইবনে আবু ইয়াহইয়া বলেন—

رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ. رواه الطبراني ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد ج ١٠ ص ١٦٩)

"আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) একজন নামাযীকে দেখলেন, সে নামায শেষ করার আগেই হাত তুলে দুআ করছে। তিনি তাকে বললেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপ্ত হওয়ার আগে হাত তুলে দুআ করতেন না'।" (মাজমাউয যাওয়াইদ : ১০/১৬৯)

হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا رَفَعَ قَوْمٌ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوا. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ج ١ ص ١٦٩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কিছু মানুষ হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে তখন অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রার্থিত বিষয় দান করেন।' (মাজমাউয যাওয়াইদ : ১০/১৬৯)

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত—

قِيلَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ : جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. (حسن) (ترمذى : كتاب الدعوات)

সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন দুআ বেশি কবুল হয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'শেষ রাতের দুআ ও ফরয নামায শেষের দুআ।' (জামে তিরমিযী : ২/১৮৮)

উপরোক্ত চার হাদীসের মধ্যে প্রথম হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, হাত তুলে দুআ করলে তা কবুলের সম্ভাবনা বেশি।

দ্বিতীয় হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর হাত তুলে দুআ করতেন।

তৃতীয় হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, কিছু মানুষ যখন আল্লাহর দরবারে দুআ করেন তখন তা কবুল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

চতুর্থ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, নামায শেষে দুআ কবুল হয়।

ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ করার বিষয়ে দু' ধরনের প্রান্তিকতা রয়েছে। কেউ একে নামাযের অংশ মনে করেন। আর কেউ নাজায়েয ও বিদআত বলেন। এখানে কতিপয় গায়রে মুকাল্লিদ আলিমের বক্তব্য উল্লেখ করা হল।

১. হাফেজ আবদুল্লাহ রোপড়ী বলেন, 'ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ করার যে প্রচলন রয়েছে তা সঠিক।' (ফাতাওয়া আহলে হাদীস : ২/১৯০)

২. মিয়া নজীর হুসাইন দেহলবী বলেন, 'চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ করা জায়েয ও মুস্তাহাব। যায়েদ (যিনি এই দুআকে বিদআত বলেন) ভুল বলেন।' (ফাতাওয়া নাজীরিয়াহ : ১/৫৬৬)

৩. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বলেন, 'কোনো কোনো রেওয়ায়েতে নামাযের পর হাত তুলে দুআ করার কথা রয়েছে।' (ফাতাওয়া ছানাইয়্যাহ : ১/৫২৭)

মাসনূন দুআ

হযরত ছাওবান (রা.) বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. (مسلم : استحباب الذكر بعد الصلاة)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে তিনবার ইস্তিগফার পড়তেন। এরপর বলতেন—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ইয়া আল্লাহ! তুমি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং তোমার নিকট থেকেই পবিত্রতা ও নিরাপত্তা লাভ করা যায়। হে দান ও মহত্ত্বের মালিক! তুমি সুমহান। (সহীহ মুসলিম : ১/২১৮)

দুআর পদ্ধতি

দুআর শুরু ও শেষে আল্লাহ তাআলার হামদ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা উচিত। বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে দুআ করা উচিত এই বিশ্বাস নিয়ে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের দুআ শোনেন এবং কবুল করেন। তিনিই সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দান করেন এবং সকল প্রয়োজন পূরণ করেন। আল্লাহ ছাড়া দুআ কবুলকারী ও বিপদ থেকে পরিত্রাণকারী আর কেউ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন—

كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَءْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللّٰهِ، ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ. {ترمذى : ما ذكر فى الثناء على الله والصلاة على النبى قبل الدعاء} (حسن صحيح)

"আমি নামায পড়ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) ছিলেন। যখন আমি বসলাম তো প্রথমে আল্লাহ তাআলার হামদ-ছানা করলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়লাম। এরপর নিজের জন্য দুআ করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ করে বললেন, 'প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে। প্রার্থনা কর, তোমাকে দান করা হবে'।"

(জামে তিরমিযী : ১/৭৬)

সাহু সাজদা

যদি ভুলক্রমে নামাযের কোনো ফরয আগ-পিছ হয়ে যায় কিংবা কোনো ওয়াজিব বাদ পড়ে যায় অথবা নামাযী রাকাআত-সংখ্যা ভুলে যায় তাহলে সাহু সাজদা করলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এ কাজগুলো করলে নামায ভেঙ্গে যাবে এবং পুনরায় নামায আদায় করতে হবে।

সাহু সাজদার নিয়ম

নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর একদিকে সালাম ফিরিয়ে দুই সাজদা করবে। এরপর আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদ শরীফ পড়ে সালাম ফিরাবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেন—

اَلسَّهْوُ أَنْ يَقُوْمَ فِي قُعُوْدٍ، أَوْ يَقْعُدَ فِي قِيَامٍ أَوْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَيَتَشَهَّدُ، وَ يُسَلِّمُ. (طحاوی : باب سجود السهو في الصلاة)

'নামাযে ভুলের অর্থ হল, বসার স্থানে দাড়িয়ে যাওয়া কিংবা দাড়ানোর স্থলে বসে পড়া অথবা (তিন বা চার রাকাআতবিশিষ্ট নামাযে) দুই রাকাআতে সালাম ফিরিয়ে দেওয়া। এরকম ভুল হলে সালাম ফেরানোর পর দুইটি সাজদা করবে এরপর আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফেরাবে। (তহাবী : ১/২৯১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.), হযরত আনাস (রা.), হযরর্ত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী থেকেও সালামের পর সাহু সাজদা করার নিয়ম বর্ণিত আছে।

(দেখুন- তহাবী : ১/২৮৯ (باب سجود السهو في الصلاة)

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيْلَ لَهُ، أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. (بخاری : باب إذا صلى خمسا)

"একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায পাঁচ রাকাআত পড়ে ফেললেন। সালাম ফেরানোর পর জিজ্ঞাসা করা হল, 'নামাযের রাকাআত-সংখ্যা কি বৃদ্ধি করা হয়েছে ?' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে ?' সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, 'নামায পাঁচ রাকাআত পড়া হয়েছে।' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের পর দুটি সাজদা করলেন।" (সহীহ বুখারী : ১/১৬৩)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত—

سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ، فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيْطُ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِيْ كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ. (مسلم : السهو في الصلاة والسجود له)

"একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযে তিন রাকাআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলেন। এরপর উঠে হুজরায় চলে গেলেন। (এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাগান্বিত দেখা যাচ্ছিল।) এক সাহাবী দাড়িয়ে আরয করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামাযের রাকাআত সংখ্যা কি হ্রাস পেয়েছে ?' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাগান্বিত অবস্থায়ই হুজরা থেকে বের হলেন এবং চতুর্থ রাকাআত আদায় করলেন। এরপর দুইটি সাহু সাজদা করলেন এবং সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করলেন।" (সহীহ মুসলিম : ১/২১৪)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. (صححه الحاكم) {ابو داود : سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم}

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকতাদীদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামাযে কিছু ভুল হল। তখন তিনি দুটি সাহু সাজদা করলেন এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়লেন। এরপর সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করলেন।

(সুনানে আবু দাউদ : ১/১৪৯)

এই হাদীসগুলো থেকে জানা যাচ্ছে যে, সাহু সাজদার পদ্ধতি হল, প্রথমে সালাম ফেরানো, তারপর দুইটি সাহু সাজদা করা, এরপর আত্তাহিয়্যাতু (ইত্যাদি) পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করা।

সাহাবীগণের কর্মপন্থা

শায়খ আবু বকর হামাযানী আল হাযিমী (মৃতু ৫৮৪ হি.) লেখেন—

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَثَوْبَانَ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هٰذَا الْبَابِ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، فَطَائِفَةٌ رَأَتِ السُّجُودَ كُلَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ عَمَلًا بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَمِمَّنْ رُوِينَا ذٰلِكَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلٰى، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ.

(الإعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الأثار ص ٨٥)،

"সালামের পর সাহু সাজদা করার নিয়ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, সাহাবী হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.), হযরত মুগীরা (রা.) ও হযরত ছাওবান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এই নিয়ম এসেছে।

"উল্লেখ্য, সাহু সাজদার চারটি নিয়ম বর্ণিত আছে। প্রথম নিয়ম এই যে, সর্বাবস্থায় সাহু সাজদার সালাম সাহু সাজদার আগে হবে। উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে এ নিয়ম প্রমাণিত হয়। এছাড়া যে সাহাবীগণের ফতোয়ায় এ নিয়ম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন, হযরত আলী (রা.), হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

যুবাইর (রা.)। তাবেয়ীদের মধ্যে রয়েছেন হাসান বসরী (রহ.), ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.), আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রহ.), সুফিয়ান ছাওরী (রহ.), হাসান ইবনে সালিহ (রহ.), আবু হানীফা (রহ.) এবং অন্যান্য কুফী ইমাম।"

ইমামের ভুল হলে

জামাতের নামাযে ইমামের ভুল হলে মুকতাদীদের করণীয় হল উচ্চস্বরে 'সুবহানাল্লাহ' বলা। যাতে ইমাম তার ভুল বুঝতে পারে। যদি মহিলা মুকতাদীরা প্রথমে ইমামের ভুল ধরতে পারেন তাহলে তারা হাতের উপর চাপড় দিবেন, মুখে আওয়াজ করবেন না। কেননা, তাদের কণ্ঠস্বরও পর্দার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ. (مسلم : تسبيح الرجل وتصفيق المرأة)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পুরুষের জন্য নিয়ম হল সুবহানাল্লাহ বলা আর মহিলাদের জন্য হাতে চাপড় দেওয়া'।"

(সহীহ মুসলিম : ১/১৮০)

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللّٰهِ. إِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ، وَالتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ. (طحاوى : الكلام في الصلاة...)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নামাযের (নিয়মে) কোনো ভুল হলে 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। কেননা, হাতের উপর চাপড় দেওয়া মহিলাদের জন্য, আর 'সুবহানাল্লাহ' বলা পুরুষের জন্য'।" (তহাবী : ১/২৯৩)

সাহু সাজদার দু'টি ক্ষেত্র

১. প্রথম বৈঠক করা ভুলে গেলে : নামাযে প্রথম বৈঠক করতে ভুলে গেলে যদি দাড়ানোর আগেই তা মনে পড়ে তাহলে বসে যাবে এবং বৈঠক পূর্ণ করবে। আর যদি দাড়ানোর পরে মনে পড়ে তাহলে আর বসবে না। নামায শেষে সাহু সাজদা করবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ.

(بخاری : ما جاء في السهو إذا قام)

'একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের দ্বিতীয় রাকাআতে বৈঠক করলেন না, তৃতীয় রাকাআতে দাড়িয়ে গেলেন। অত:পর নামাযের শেষে দু'টি সাজদা করলেন। পরে সালাম ফিরালেন।'

(সহীহ বুখারী : ১/১৬৩)

২. রাকাআত-সংখ্যায় সন্দেহ হলে : হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত–

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ. (ابن ماجه : ما جاء فيمن شك في صلاة)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কারও যদি নামাযে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে সন্দেহ ছেড়ে ইয়াকীন অনুযায়ী অগ্রসর হবে। (যথা : যদি সন্দেহ হয় যে, দুই রাকাআত পড়া হল না তিন রাকাআত তাহলে দুই রাকাআত ধরে নিয়ে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে) যখন ইয়াকীন অনুযায়ী নামায সমাপ্ত হবে তো দুটি সাহু সাজদা করবে। যদি তার নামায আগেই পূর্ণ হয়ে যায় তবে বাড়তি (রাকাআত) নফল হিসেবে গণ্য হবে, আর যদি পূর্বে তার নামায পূর্ণ না হয়ে থাকে তবে শেষ রাকাআত দ্বারা তা পূর্ণ হয়েছে। আর সাজদা শয়তানকে অপদস্থ করেছে'।" (সুনানে ইবনে মাজাহ : ১/৮৫)

নামাযে কথা বলা

প্রথম দিকে নামাযে প্রয়োজনীয় কথা বলার সুযোগ ছিল। পরে আর সে অবকাশ থাকেনি। সাহু সাজদা বিষয়ক যে হাদীসগুলোতে কথাবার্তার উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো প্রথম যুগের ঘটনা। এখন শুধু 'সুবহানাল্লাহ' বলার অনুমতি

রয়েছে। অতএব কেউ যদি সাহু সাজদার আগে কথা বলে তাহলে তার নামায ভেঙ্গে যাবে এবং তাকে নতুন করে নামায পড়তে হবে।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত—

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلٰى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ، حَتّٰى نَزَلَتْ ((وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ))، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ. (مسلم : تحريم الكلام في الصلاة، بخارى : ما ينهى من الكلام في الصلاة)

"আমরা নামাযে কথা বলতাম। নামাযী তার পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর সঙ্গে কথা বলত। একপর্যায়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হল– وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

'আল্লাহর সামনে বিনয়ের সঙ্গে দাড়াও এবং কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।' তখন থেকে আমাদেরকে নিশ্চুপ থাকার আদেশ করা হল।"

(সহীহ মুসলিম : ১/২০৪; সহীহ বুখারী : ১/১৬০)

সহীহ বুখারীতে فِيْ حَاجَتِهِ শব্দটিও রয়েছে, যার অর্থ হল তখন 'প্রয়োজনীয় কথা' বলা যেত। কিন্তু উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় কথাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাই এখন বিধান এই যে, যেকোনো ধরনের কথা নামায বিনষ্ট করবে।

অন্য হাদীসে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন—

كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلاً. (بخارى : ما ينهى من الكلام فى الصلاة)

"প্রথম দিকে নামাযে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করতাম। তিনি সালামের জওয়াব দিতেন। (হাবাশার হিজরতের পর) যখন আমরা নাজাশীর দেশ থেকে ফিরে আসি তখন (বিধান পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল) আমরা তাকে নামাযরত অবস্থায় সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি জওয়াব দিলেন না। (নামায শেষে) বললেন, 'নামাযে রয়েছে ভিন্ন মগ্নতা'।" (সহীহ বুখারী : ১/১৬০)

তাছাড়া নামাযে ভুল-ভ্রান্তি হলে 'সুবহানাল্লাহ' বলার নিয়ম যে হাদীসগুলোতে এসেছে সেগুলোর তাৎপর্যও এই যে, যেহেতু এখন নামাযের

শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে ভুল-ক্রটি আলোচনা করার সুযোগ নেই, তাই নামাযের মধ্যেই 'সুবহানাল্লাহ' বলে ইমামের মনোযোগ আকর্ষণের বিধান এসেছে।

টীকা : আজকাল কারও কারও মুখে শোনা যায় যে, নামাযে ভুল-ক্রটি হয়ে গেলে সালাম ফেরানোর পর আলোচনা করে সাহু সাজদা করা যায়। কথাবার্তা যেহেতু নামাযেরই সংশোধনের স্বার্থে তাই এতে নামায বিনষ্ট হবে না। একথা ঠিক নয়।

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলিম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও লিখেছেন যে, নামাযে যেকোনো ধরনের কথাবার্তা নামায ভঙ্গ করে।

এক হাদীসে এসেছে—

إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

'এই যে নামায এতে কোনো কথাবার্তা বলা যায় না।'

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় নওয়াব সাহেব লেখেন—

پس حدیث دلالت کند برآنکه مخاطبه در نماز مبطل نماز ست، برابر ست که برائے اصلاح نماز باشد یا غیراو (مسک الختام ج ۱ ص ۳۰۹)

"এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, নামাযে যেকোনো ধরনের কথাবার্তা নামায বিনষ্ট করে। তা নামাযের সংশোধনের জন্য হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে।" (মিছকুল খিতাম)

অন্য এক গায়রে মুকাল্লিদ আলিম মাওলানা ওহীদুযযামান (রহ.)ও লিখেছেন যে, যার উপর সাহু সাজদা এসেছে সে যদি সাহু সাজদা না করে মসজিদ থেকে বের হয়, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কথা বলে, কিংবা কোনো কিছু খায় বা পান করে কিংবা বে-অযু হয় তাহলে তাকে নতুন করে নামায পড়তে হবে, শুধু সাহু সাজদা যথেষ্ট হবে না। (নুযুলুল আবরার : ১/১৩৯)

নামাযের ধারাবাহিক বিবরণ শেষ হওয়ার পর এখানে নামাযের 'শর্ত', 'ফরজ', 'ওয়াজিব', 'সুন্নত' ও কিছু 'মাকরূহ' বিষয় উল্লেখিত হচ্ছে। কেননা, সাহু সাজদার মাসাইল ভালোভাবে বোঝার জন্য এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগতি প্রয়োজন।

নামাযের শর্তসমূহের বিবরণ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে নামায হয় না।

১. ওয়াক্ত হওয়া। বিস্তারিত আলোচনা ১২৫ পৃষ্ঠায়।

২. শরীর পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ দৃশ্যমান নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া এবং অযু বা গোসলের মাধ্যমে অদৃশ্য নাপাকী থেকেও পবিত্রতা অর্জন করা।

৩. কাপড় পবিত্র হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

অর্থ : এবং আপনার কাপড় পবিত্র করুন। (সূরা মুদ্দাছছির : ৪)

৪. নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া।

৫. নাভি থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত আবৃত রাখা। বিস্তারিত ১৪৩ পৃষ্ঠায়।

৬. কিবলামুখী হওয়া। বিস্তারিত ১৪৫ পৃষ্ঠায়।

৭. নিয়ত করা। বিস্তারিত ১৪৬ পৃষ্ঠায়।

নামাযের ফরযসমূহ

নিম্নোক্ত ফরযগুলোর মধ্যে কোনো একটি ছুটে গেলে নামায হবে না। আর যদি তা আদায়ে কিছু বিলম্ব হয় যেমন শেষ রাকাআতে বসার স্থলে দাড়িয়ে গেল এবং স্মরণ হওয়ামাত্র পুনরায় বসে পড়ল তাহলে সাহু সাজদা করার দ্বারা নামায হয়ে যাবে। নামাযের ফরযগুলো এই–

১. কিয়াম অর্থাৎ দাড়িয়ে নামায পড়া। যদি দাড়িয়ে নামায আদায়ের সামর্থ্য না থাকে তাহলে বসে আদায় করবে। এটাও যদি সম্ভব না হয় তবে শায়িত অবস্থায় আদায় করবে। আরও আলোচনা ১৪৬ পৃষ্ঠায়।

২. কুরআন পড়া। বিস্তারিত ১৫৬ পৃষ্ঠায়।

৩. রুকূ করা। বিস্তারিত ১৮৮ পৃষ্ঠায়।

৪. দুই সাজদা করা। বিস্তারিত ১৯২ পৃষ্ঠায়।

৫. শেষ বৈঠক। বিস্তারিত ১৯৮ পৃষ্ঠায়।

৬. নামাযের রুকনগুলো নির্ধারিত তরতীবে আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে সম্মিলিত আমলের দ্বারা এই ফরয প্রমাণিত হয়।

৭. স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নামায সমাপ্ত করা। বিস্তারিত ২০৪ পৃষ্ঠায়।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের ওয়াজিবগুলোর মধ্যে কোনো একটি ভুলক্রমে ছুটে গেলে কিংবা আদায়ে আগপিছ হলে সাহু সাজদা ওয়াজিব হয়। নামাযের ওয়াজিবসমূহ এই–

১. তাকবীরে তাহরীমা, অর্থাৎ নামাযের সূচনায় আল্লাহু আকবার বলা। বিস্তারিত ১৪৭ পৃষ্ঠায়।

২. ইমাম ও মুনফারিদের জন্য (একা নামায আদায়কারী) সূরা ফাতিহা পড়া। বিস্তারিত ১৫৬ ও ১৫৭ পৃষ্ঠায়।

৩. প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর একটি বড় আয়াত কিংবা তিনটি ছোট আয়াত অথবা একটি সূরা পড়া। (ইমাম ও মুনফারিদের জন্য)

৪. ইমামের কিরাআতের সময় মুকতাদী নিশ্চুপ থাকা। বিস্তারিত ১৫৮–১৭৩ পৃষ্ঠায়।

৫. প্রথম বৈঠক করা।

৬. প্রথম ও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।

৭. নামাযের সকল রুকন ধীরস্থিরভাবে আদায় করা।

৮. প্রত্যেক ফরয ও ওয়াজিব আগপিছ করা ছাড়া যথাযথভাবে আদায় করা।

৯. জাহরী নামাযে, অর্থাৎ যে নামাযে জোরে কিরাআত হয় তাতে কুরআন জোরে পড়া এবং ছিররী নামাযে, অর্থাৎ যে নামাযে কিরাআত আস্তে হয় তাতে আস্তে পড়া। তবে এ ওয়াজিব শুধু ইমামের জন্য। বিস্তারিত ১৭৯ পৃষ্ঠায়।

১০. আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফেরানো। বিস্তারিত ২০৪ পৃষ্ঠায়।

১১. বিতর নামাযে দুআ কুনূত পড়া। বিস্তারিত ২৪৩–২৪৮ পৃষ্ঠায়।

১২. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে বাড়তি ছয় তাকবীর দেওয়া।

নামাযের সুন্নতসমূহ

নামাযের সুন্নতসমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া কর্তব্য। তবে এগুলোর কোনো কিছু ছুটে গেলে সাহু সাজদা ওয়াজিব হয় না। সুন্নতগুলো এই–

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত কান পর্যন্ত ওঠানো এবং আঙুলগুলো খোলা রাখা। বিস্তারিত ১৪৮ পৃষ্ঠায়।

২. হাত বেঁধে নাভির নিচে রাখা। বিস্তারিত ১৫০ পৃষ্ঠায়।

৩. ছানা পড়া। বিস্তারিত ১৫১–১৫২ পৃষ্ঠায়।

৪. অনুচ্চ স্বরে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া। বিস্তারিত ১৫৩–১৫৫ পৃষ্ঠায়।

৫. অনুচ্চ স্বরে আমীন বলা। বিস্তারিত ১৭৫–১৭৮ পৃষ্ঠায়।

৬. এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা। বিস্তারিত ১৮৮ পৃষ্ঠায়।

৭. রুকু-সাজদায় তিন বার তাসবীহ পড়া। বিস্তারিত ১৯০ পৃষ্ঠায়।

৮. রুকুতে দুই হাটু ধরা এবং হাতের আঙুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখা। বিস্তারিত ১৮৯ পৃষ্ঠায়।

৯. ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলা এবং মুকতাদী 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা। আর একা নামায আদায়কারী দু'টোই বলা। বিস্তারিত ১৯১ পৃষ্ঠায়।

১০. রুকূর পর সোজা হয়ে দাড়ানো। বিস্তারিত ১৯০ পৃষ্ঠায়।

১১. দুই সাজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা। বিস্তারিত ১৯৫ পৃষ্ঠায়।

১২. ক্বা'দা অর্থাৎ বৈঠকে ডান পা খাড়া রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা। বিস্তারিত ১৯৮–১৯৯ পৃষ্ঠায়।

১৩. শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দরূদ শরীফ পড়া। বিস্তারিত ২০২ পৃষ্ঠায়।

১৪. শেষ বৈঠকে দরূদ শরীফের পর দুআ পড়া। বিস্তারিত ২০৩ পৃষ্ঠায়।

১৫. সালামের সময় ডানে বামে মুখ ফেরানো। বিস্তারিত ২০৪ পৃষ্ঠায়।

● নামায শেষে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুল্লিাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়াও সুন্নাত। বিস্তারিত ২০৫–২০৬ পৃষ্ঠায়।

নামাযে যে কাজগুলো মাকরূহ

নামাযে যেসব কাজ খুবই নিন্দনীয় তা 'মাকরূহ' হিসেবে চিহ্নিত। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য। নিম্নে এমন কিছু মাকরূহ কাজের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যেগুলো ব্যাপকভাবে হতে দেখা যায়। ইতোপূর্বে উল্লেখিত সুন্নতসমূহের মধ্যে কোনো সুন্নত পরিত্যাগ করাও 'মাকরূহ' হিসেবে পরিগণিত।

নামাযে আকাশের দিকে তাকানো

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ .(مسلم : النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة)

"সাবধান! লোকেরা যেন নিবৃত্ত হয় নামাযে দুআর সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি ওঠানো থেকে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যাবে।"

(সহীহ মুসলিম : ১/১৮১)

নামাযে এদিক সেদিক তাকানো

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন—

سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ : هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطٰنُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.(بخارى : الالتفات في الصلاة)

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'এর মাধ্যমে নামাযীর নামায থেকে শয়তান তার অংশটুকু হরণ করে'।" (সহীহ বুখারী : ১/১০৪)

যখন মনোযোগ অন্য বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ. (مسلم : باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام)

অর্থাৎ যখন খাবার উপস্থিত হয় তখন নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না। তদ্রূপ পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নামায পড়লেও নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না।

(সহীহ মুসলিম : ১/২০৮)

সাজদায় দুই হাতের কনুই বিছিয়ে দেওয়া

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، ولا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ. (بخاری :
باب لا يفترش ذراعيه في السجود)

"তোমরা ধীরস্থিরভাবে সাজদা করবে। আর কেউ যেন তার হাত কুকুরের মতো বিছিয়ে না দেয়।" (সহীহ বুখারী : ১/১১৩)

এমন কিছুর দিকে মুখ করে নামায পড়া, যার দ্বারা মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، وَقَالَ : شَغَلَتْنِيْ أَعْلَامُ هٰذَا، فَاذْهَبُوا بِهَا إِلٰى أَبِي جَهْمٍ (عَامِرِ بْنِ حُذَيْفَةَ) وَأْتُوا بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ، {مسلم : كراهية الصلاة في ثوب له اعلام}

"(একবার) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কাপড়ে নামায পড়লেন যাতে নকশা ছিল। নামায শেষে বললেন, 'এই কাপড় আবু জাহ্মকে (আমের ইবনে হুযাইফাকে) দিয়ে দাও। এর নকশা আমার মনোযোগ বিনষ্ট করেছে। এর বদলে তার নকশাবিহীন মোটা কাপড় নিয়ে আস'।"

(সহীহ মুসলিম : ১/২০৮)

কাপড়, রুমাল ইত্যাদি ঝুলিয়ে নামায পড়া

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ. (ترمذی :
ما جاء في كراهية السدل في الصلاة)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শরীরে) কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।" (সুনানে তিরমিযী : ১/৮৭)

ঘুমের চাপ নিয়ে নামায পড়া

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلّٰى وَهُوَ يَنْعَسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ. (حسن صحيح) {ترمذی : الصلاة عند النعاس}

"যখন তোমাদের কারো তন্দ্রা আসে তখন সে যেন ঘুমিয়ে নেয়, যাতে ঘুমের চাপ কেটে যায়। কেননা ঘুম নিয়ে নামায পড়লে এমন হতে পারে যে, সে ইস্তিগফার করার ইচ্ছা করেছে, কিন্তু তা না করে নিজেকে গালি দিচ্ছে।"

(সুনানে তিরমিযী : ১/৮১)

নামাযের জন্য বিশেষ স্থান নির্ধারণ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে শিব্‌ল বলেন—

نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ. (رواه أحمد والحاكم)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কাকের মতো ঠোকর দিতে, হিংস্র প্রাণীর মতো ভূমিতে হাত বিছাতে এবং উট যেভাবে উটশালায় স্থান নির্ধারণ করে সেভাবে মসজিদে স্থান নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন।"

(মুসনাদে আহমদ : ৩/৪২৮; হাকিম : ১/৪৯২)

জামাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

নামায মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে বিপ্লব সাধন করে। জামাতে নামায আদায়ের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক উপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনের পাশাপাশি মুসলমানদের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। আর একা নামাযের চেয়ে জামাতের নামাযের ফযীলত অনেক বেশি।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

'এবং যথাযথরূপে নামায আদায় কর, যাকাত প্রদান কর এবং যারা রুকূ করে তাদের সঙ্গে রুকূ কর।' (সূরা বাকারা : ৪৩)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

'একা নামাযের চেয়ে জামাতের নামাযের মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশি।'

(সহীহ মুসলিম : ১/২৩১)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَضْعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ. (بخاری : باب فضل صلاة الجماعة)

"মসজিদে জামাতে নামায আদায় করা ঘরে কিংবা বাজারে নামায পড়া থেকে পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদা রাখে। কেননা, মানুষ যখন উত্তমরূপে অজু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদের দিকে অগ্রসর হয় তখন তার প্রতি পদক্ষেপে একটি দরজা বুলন্দ হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। এরপর নামায শেষে যতক্ষণ নামাযের স্থানে বসে থাকে ফেরেশতাগণ তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকে যে, ইয়া আল্লাহ, তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তাকে করুণা করুন। আর নামাযী যতক্ষণ নামাযের প্রতীক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে নামাযের ছওয়াব পেতে থাকে।" (সহীহ বুখারী : ১/৯০)

রাসূলুল্লাহর দৃষ্টিতে জামাত ত্যাগকারী

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا، فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلٰى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

(مسلم : فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها)

'মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন নামায হল ইশা ও ফজর। তারা যদি এ দুই নামাযের মর্যাদা ও বিনিময় সম্পর্কে জানত তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাতে শামিল হত। আমি এ সংকল্প করেছিলাম যে, একজনকে নামায পড়াতে আদেশ দিব আর আমি কিছু লোককে নিয়ে, যাদের সঙ্গে লাকড়ির বোঝা থাকবে, ওইসব লোকের বাড়ি যাব, যারা নামাযে আসে না, এরপর তাদেরকে ও তাদের ঘর-বাড়িগুলোকে আগুনে জ্বালিয়ে দিব।' (মুসলিম : ১/২৩২)

ইমাম নির্বাচনের মানদণ্ড

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَءُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ

سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (مسلم : من أحق بالامامة)

'প্রত্যেক দলের মধ্যে ইমাম সে হবে যে কুরআনী ইলমে সর্বাধিক অগ্রগামী। যদি এ বিষয়ে সকলেই সমান হয় তাহলে যে সুন্নাহ্র জ্ঞানে অগ্রগামী। এ বিষয়েও সকলে সমান হলে যে আগে হিজরত করেছে। আর সবাই যদি একই সঙ্গে হিজরত করে থাকে তাহলে যে আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কেউ যেন কারো কর্তৃত্বের স্থানে তার ইমাম না হয় এবং কেউ যেন কারও গৃহে তার সম্মানের স্থানে তার অনুমতি ছাড়া না বসে।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৩৬)

কাতার

জামাতের নামাযে কাতার সোজা করা এবং সোজা রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ক সকল রেওয়ায়াত সামনে রাখলে দেখা যায়, নামাযে সবার পায়ের টাখনু, কাঁধ ও ঘাড় এক সমান্তরালে থাকা চাই।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. (مسلم : تسوية الصف وإقامتها)

'তোমরা কাতারগুলো সোজা কর। কেননা, কাতার সোজা করা নামাযের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত।' (সহীহ মুসলিম : ১/১৮২)

হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. (مسلم : تسوية الصفوف. بخارى : تسوية الصفوف عند الإقامة)

'তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে অনৈক্য ও মতবিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।' (সহীহ বুখারী : ১/১০০)

প্রথম কাতারের গুরুত্ব

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَا يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا ... (مسلم : تسوية الصفوف وإقامتها)

'মানুষ যদি আযান দেওয়া ও প্রথম কাতারে নামায পড়ার ফযীলত জানত তাহলে লটারী করে হলেও তার সুযোগ লাভের চেষ্টা করত।'

(সহীহ মুসলিম : ১/১৮২)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ لَهُمْ : تَقَدَّمُوا، فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ. (مسلم : تسوية الصفوف...)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সাহাবীর মধ্যে উদাসীনতা ও পিছনে থাকার প্রবণতা লক্ষ করলেন। তখন তিনি সতর্ক করে বললেন, 'সামনে আস এবং আমার পূর্ণ অনুসরণ কর, যাতে পরবর্তীরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে। কোনো জাতি যখন পশ্চাৎপদতা অবলম্বন করে তখন আল্লাহও তাদেরকে পশ্চাৎপদ করে দেন'।" (মুসলিম : ১/১৮২)

ইমামের ইকতিদা

নামাযে ইমামের পূর্ণ অনুসরণ জরুরি।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. (بخاري : إنما جعل الامام ليؤتم به)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে শরীরের ডান দিকে চোট পেয়েছিলেন। সে সময় তিনি বসে নামায পড়িয়েছেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে নামায পড়েছি। নামায শেষে সাথীদের দিকে ফিরে বলেছেন, 'ইমাম এজন্যই বানানো হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে। অতএব ইমাম যখন দাড়িয়ে নামায পড়ে তখন তোমরাও দাড়িয়ে নামায পড়বে, যখন সে রুকূ করে তখন তোমরাও রুকূ করবে, যখন সে রুকূ থেকে ওঠে তখন তোমরাও উঠবে এবং যখন সে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে তখন তোমরা 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে'।" (সহীহ বুখারী : ১/৯৬)

ইকতিদা না করার শাস্তি

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ. (بخارى : اثم من رفع رأسه قبل الإمام)

'কেউ যখন ইমামের আগে মাথা তোলে তখন কি তার এই ভয় হয় না যে, আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথার মতো বানিয়ে দেবেন কিংবা তার আকৃতি গাধার আকৃতির মতো করে দিবেন?' (সহীহ বুখারী : ১/৯৬)

ইমাম নামাযকে দীর্ঘায়িত করবে না

জামাতের নামাযে মুকতাদীদের প্রতি লক্ষ রাখা ইমামের কর্তব্য। নামায এত দীর্ঘ করা উচিত নয় যাতে বিরক্তি আসে এবং খুশুখুযু বিনষ্ট হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ، وَالْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ. (مسلم : امر الائمة بتخفيف الصلاة...)

'যখন তোমাদের কেউ ইমাম হয়, তখন সে যেন হাল্কাভাবে নামায পড়ে। কেননা, নামাযীদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল, অসুস্থ সব ধরনের মানুষ থাকে। তবে যখন একা নামায পড়ে তখন যেভাবে ইচ্ছা পড়বে।'

(সহীহ মুসলিম : ১/১৮৮)

ছুত্‌রা-প্রসঙ্গ

নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া অনেক বড় গুনাহ। এ বিষয়ে যাতায়াতকারীর সাবধান থাকা জরুরী। তদ্রূপ নামায আদায়কারীর কর্তব্য হল এমন জায়গায় নামায পড়া যাতে মুসল্লীদের চলাফেরায় অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। এমন জায়গা পাওয়া না গেলে নামায শুরু করার আগে এমন কোনো জিনিস সামনে রাখবে, যার উচ্চতা এক হাতের কাছাকাছি (প্রায় ১ ফুট)। একে 'ছুতরা' বলে। জামাতের নামাযে ইমামের সামনে 'ছুতরা' থাকাই যথেষ্ট। 'ছুতরা'র সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে গুনাহ হয় না।

ছুত্‌রার ব্যাখ্যা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّى، فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ. (مسلم : سترة المصلى)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযীর 'ছুতরা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি উত্তরে বললেন, 'ছুতরা' হাওদার পিছনের লাঠির সমান হতে হবে'।" (সহীহ মুসলিম : ১/১৯৫)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, "ছুতরা কমপক্ষে হাওদার পিছনের লাঠির সমান হতে হবে, যা হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত বা এক হাতের দুই তৃতীয়াংশ পরিমাণ হয়ে থাকে। এ উচ্চতার কোনো জিনিস দাড় করিয়ে দিলে তা 'ছুতরা'র কাজ করবে। এই হাদীস থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, সামনে 'ছুতরা' স্থাপন করে নামায পড়া উত্তম।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত—

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ، وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. (بخارى: حمل العنزة بين يدي الامام يوم العيد)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঈদগাহে যেতেন তখন তাঁর সম্মুখে নেযা বহনকারী থাকত। এই নেযা ঈদগাহে গেড়ে দেওয়া হত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে নামায আদায় করতেন।'

(সহীহ বুখারী : ১/১৩৩)

নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়ার শাস্তি

আগেই বলা হয়েছে যে, ছুতরাবিহীন অবস্থায় নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা অনেক বড় গুনাহ। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে কঠিন শাস্তির কথা এসেছে।

হযরত আবু জাহ্‌ম (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي أَقَالَ : أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً. (موطأ مالك : التشديد في أن يمر أحد...)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত এতে কীরূপ শাস্তি-ভোগের আশঙ্কা রয়েছে তবে চল্লিশ পর্যন্ত ঠায় দাড়িয়ে থাকাও সে ভালো মনে করত।'

"আবুন নাযর বলেন, 'আমার জানা নেই, হাদীসে চল্লিশের কী অর্থ, চল্লিশ দিন, চল্লিশ মাস, কি চল্লিশ বৎসর'।" (মুয়াত্তা মালিক : পৃ. ৫৪)

কা'ব আহবার বলেন—

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. (موطا مالك)

'নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত এতে কীরূপ শাস্তি রয়েছে তবে সে একাজ না করে ভূমিতে ধ্বসে যাওয়াও ভালো মনে করত।'

(মুয়াত্তা মালিক : পৃ. ৫৪)

নামাযের রাকাআত-সংখ্যা

নামাযের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যথা :

ফরয : যা আদায় করা জরুরী, পরিত্যাগ করা হারাম।

ওয়াজিব : যা আদায় করা জরুরী, পরিত্যাগ করা মাকরূহে তাহরীমী।

সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ : যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত করেছেন। এটা পরিত্যাগ করা গুনাহ।

সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ অধিকাংশ সময় করেছেন, তবে কখনো কখনো পরিত্যাগও করেছেন।

নফল : যা আদায়ে ছওয়াব রয়েছে, পরিত্যাগে গোনাহ নেই।

সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ. (ترمذي : من صلى ثنتي عشرة ركعة، (ورواه مسلم مختصرا في فضل السنن الراتبة)

'যে দিনে-রাতে বারো রাকাআত নামায আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। (ওই বারো রাকাআত নামায এই–) জোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাআত, ফরযের পরে দুই রাকাআত। মাগরিবের (ফরয নামাযের) পরে দুই রাকাআত। ইশার (ফরয নামাযের) পরে দুই রাকাআত। আর ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাকাআত। (জামে তিরমিযী : ১/৯৪)

ফজরের নামাযের রাকাআত-সংখ্যা

দুই রাকাআত সুন্নত, দুই রাকাআত ফরয

ফজরের সুন্নত নামায সম্পর্কে হাদীস শরীফে তাকীদ এসেছে। এজন্য অন্যান্য নামাযে জামাত শুরু হওয়ার পর অন্য কোনো নামায, এমনকি অন্য কোনো সুন্নত নামায পড়া না গেলেও ফজরের সময় ফজরের সুন্নত পড়ার বিধান রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে, 'যখন নামায শুরু হয়ে যায়, তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোনো নামায পড়া দুরস্ত নয়।' (জামে তিরমিযী : ১/৯৬)

কিন্তু ফজরের সুন্নত নামাযের গুরুত্বের কারণে জামাত শুরু হওয়ার পরও সাহাবায়ে কেরাম এই নামায আদায় করে জামাতে শামিল হতেন। এজন্য যদি সুন্নত পড়ে জামাতের সঙ্গে এক রাকাআত পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে তাহলে সুন্নত পড়ে জামাতে শামিল হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي مُوسٰى قَالَ : جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَالإِمَامُ يُصَلِّي الصُّبْحَ، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ إِلٰى سَارِيَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ صَلّٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ : رِجَالُهُ مُوثَّقُونَ (مجمع الزوائد ج ١ ص ٧٥)

আবদুল্লাহ ইবনে আবু মূসা বলেন, "আমাদের মসজিদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তাশরীফ আনলেন। তখন ইমাম ফজরের নামায পড়ছিলেন। তিনি একটি খুঁটির কাছে ফজরের সুন্নত নামায আদায় করলেন। কেননা, তিনি আগে সুন্নত পড়তে পারেননি।" (মাজমাউয যাওয়াইদ : ২/২২৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আমল

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَالإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلّٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الإِمَامِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ. (طحاوى : الرجل يدخل المسجد والامام في صلاة الفجر. صححه النيموي، آثار السنن ج ٢ ص ٣٣)

আবু উসমান আনসারী বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যখন মসজিদে পৌছলেন তখন ইমাম ফজরের নামাযে ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) আগে সুন্নত পড়তে পারেননি তাই প্রথমে দু' রাকাআত সুন্নত আদায় করলেন এরপর জামাতে শামিল হলেন।" (তহাবী : ১/২৫৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর আমল

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهِ، فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، ثُمَّ

دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ. (طحاوى : الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر. اسناده حسن.)

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর ঘর থেকে বের হলেন। ইতোমধ্যে ফজরের নামায শুরু হয়ে গেল। তিনি মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই রাস্তায় দু'রাকাআত নামায পড়লেন, এরপর জামাতে শামিল হলেন।"
(তহাবী : ১/২৫৬)

হযরত আবূ দারদা (রা.)-এর আমল

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ. (طحاوى : الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر)

আবূ দারদা (রা.) মসজিদে এলেন। ইতোমধ্যে মুসল্লীরা নামাযের কাতারে দাড়িয়ে গেছে। তিনি মসজিদের একপার্শ্বে দুই রাকাআত পড়লেন, এরপর জামাতে শামিল হলেন। (তহাবী : ১/২৫৬)

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরামের আমল

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : كُنَّا نَأْتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَنُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ. (طحاوى : الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر)

আবু উসমান নাহ্দী উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফতকালের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "এমন হত যে, আমরা ফজরের দুই রাকাআত সুন্নত পড়ার আগেই মসজিদে এসেছি। দেখলাম, তিনি নামায আরম্ভ করেছেন। তখন আমরা মসজিদের পিছনে দু' রাকাআত পড়ে জামাতে শামিল হতাম।"
(তহাবী : ১/২৫৬)

সাহাবায়ে কেরামের উপরোক্ত আমল থেকে জানা যায় যে, সুন্নত পড়ে জামাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে মসজিদের একপার্শ্বে সুন্নত পড়ে জামাতে শামিল হওয়া উচিত।

আর যদি সুন্নত পড়তে গেলে জামাত হারানোর আশঙ্কা থাকে তাহলে সুন্নত না পড়েই জামাতে শামিল হবে এবং সূর্যোদয়ের পর সুন্নত কাযা করবে। ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের আগে এই সুন্নত পড়বে না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যেকোনো নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ. (ترمذى : ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس. قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ফজরের দুই রাকাআত সুন্নত (সময়মতো) পড়ল না সে যেন সূর্যোদয়ের পর তা আদায় করে।'

(জামে তিরমিযী : ১/৯৬)

হযরত ইমাম মালিক (রহ.) বলেন—

بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. (موطا مالك : ما جاء في ركعتي الفجر)

"তিনি জেনেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর ফজরের দুই রাকাআত ছুটে গিয়েছিল। তিনি তা সূর্যোদয়ের পর আদায় করেন।"

(মুয়াত্তা মালিক : পৃ. ৪৫)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, ফজরের সুন্নত ছুটে গেলে সূর্যোদয়ের পর তা আদায় করবে। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন, ফরয নামাযের পরই এই সুন্নত আদায় করা হবে। তারা দলীল হিসেবে যে হাদীস পেশ করেন তা মুরসাল, অর্থাৎ হাদীসটির সূত্র অবিচ্ছিন্ন নয়। হাদীসটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

عَنْ قَيْسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَنِيْ أُصَلِّيْ، فَقَالَ : مَهْلًا يَا قَيْسُ أَصَلَاتَانِ مَعًا؟ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ : فَلَا إِذَنْ. (ترمذى : ما جاء في من تفوته الركعتان)

কায়স (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) তাশরীফ আনলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ফজরের নামায পড়লাম। নামায শেষে প্রস্থানের সময় তিনি দেখলেন, আমি নামায পড়ছি। তিনি তখন বললেন, 'কায়স! থাম। তুমি কি দুই নামায একসঙ্গে পড়ছ?' আমি বললাম, 'আমার ফজরের দুই রাকাআত পড়া হয়নি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে অসুবিধা নেই'।" (জামে তিরমিযী : ১/৯৬)

এই বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন—

"إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلًا، وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسٍ.

'বর্ণনাটি মুরসাল, এর সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম কায়স থেকে শোনেননি।'

এই দলীলের দ্বিতীয় দুর্বলতা এই যে, এখানে যে ফজরের সুন্নতের কথা বলা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

জোহরের নামাযের রাকাআত-সংখ্যা

চার রাকাআত সুন্নত, চার রাকাআত ফরয, দুই রাকাআত সুন্নত, দুই রাকাআত নফল।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. (بخارى : الركعتان قبل الظهر)

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের আগের চার রাকাআত এবং ফজরের আগের দুই রাকাআত কখনো ছাড়তেন না।' (সহীহ বুখারী : ১/১৫৭)

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. (صحيح غريب) {ترمذى : باب آخر من سنن الظهر}

'যে জোহরের আগের চার রাকাআত ও জোহরের পরের চার রাকাআত নিয়মিত আদায় করে আল্লাহ্ তাআলা তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেন।' (সুনানে তিরমিযী : ১/৯৮)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা থেকে জোহরের আগের চার রাকাআত এবং ফজরের আগের দুই রাকাআতের প্রমাণ পাওয়া গেল। এগুলো হল সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তা পরিত্যাগ করেননি। আর হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর রেওয়ায়াতে জোহরের পরের চার রাকাআতের ফযীলত পাওয়া গেল। এর মধ্যে দুই রাকাআত হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা আর দুই রাকাআত নফল।

জোহরের আগের চার রাকাআত সুন্নত যদি সময়মতো আদায় করা না হয় তাহলে নামাযের পরে তা আদায় করবে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا. (ترمذى : باب آخر من سنن الظهر)

"কখনো যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের আগের চার রাকাআত সুন্নত সময়মতো পড়তে সক্ষম না হতেন তাহলে ফরয নামাযের পর তা আদায় করতেন।" (জামে তিরমিযী : ১/৯৭)

আসরের রাকাআত-সংখ্যা

চার রাকাআত সুন্নত, চার রাকাআত ফরয।

আসরের ফরয নামাযের আগে চার রাকাআত নামায হল সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা। সময় অল্প হলে দুই রাকাআতও পড়া যায়। না পড়লেও গুনাহ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

رَحِمَ اللَّهُ امْرَءً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. (ترمذى : باب ما جاء في الأربع قبل العصر)

'আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহমত করুন যে আসরের আগে চার রাকাআত নামায পড়ে।' (জামে তিরমিযী : ১/৯৮)

মাগরিবের রাকাআত-সংখ্যা

তিন রাকাআত ফরয, দুই রাকাআত সুন্নত, দুই রাকাআত নফল

হযরত আবু মা'মার বলেছেন—

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. (مروزى : قيام الليل ص ٥٨)

'সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মাগরিবের পরে চার রাকাআত নামায পড়া পছন্দ করতেন।' (কিয়ামুল লায়ল, মারওয়াযী : পৃ. ৭৪)

এছাড়া ইতোপূর্বে 'সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ' শিরোনামে উল্লেখিত উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর বর্ণনায় মাগরিবের পরের দু' রাকাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদার কথা এসেছে।

ইশার রাকাআত-সংখ্যা

চার রাকাআত সুন্নত, চার রাকাআত ফরয, দুই রাকাআত সুন্নত, দুই রাকাআত নফল, তিন রাকাআত বিতর, দুই রাকাআত নফল।

ইশার ফরয নামাযের আগে সময় হলে চার রাকাআত নামায পড়া ভালো। সময় কম হলে দুই রাকাআত। না পড়লেও গুনাহ নেই।

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বারা ইবনে আযিব (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেছেন—

مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا كَانَ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهِ، وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا مَوْقُوفًا، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى كَعْبٍ. (الدراية : ج ١ ص ١٩٨)

যে ইশার আগে চার রাকাআত নামায পড়ল সে যেন তাহাজ্জুদ নামায আদায় করল। আর যে ইশার পরে চার রাকাআত পড়ল সে যেন শবে কদরে চার রাকাআত নামায আদায় করল।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) এ বর্ণনা হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাণী হিসেবে এবং নাসায়ী ও দারাকুতনী কা'ব (রা.)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

(আদ-দিরায়াহ : ১/১৫১)

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহ.) বলেন—

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ. (مروزى : قيام الليل ص ٥٨)

'সাহাবায়ে কেরাম ইশার আগে চার রাকাআত নামায পড়া পছন্দ করতেন।'

(কিয়ামুল লাইল : পৃ. ৭৪)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُصَلِّي أَرْبَعًا ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ... (ابو داود : باب صلاة الليل)

তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। উম্মুল মুমিনীন বললেন, 'তিনি মসজিদে ইশার নামায পড়ে ঘরে আসতেন এবং চার রাকাআত নামায পড়ে বিছানায় যেতেন।'

(সুনানে আবু দাউদ : ১/১৯১)

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত—

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ، يَقْرَءُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، يَقْرَءُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلاَثِ سُوَرٍ آخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

(ترمذى : ما جاء في الوتر بثلاث)

টীকা : নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান 'শরহু বুলুগুল মারাম' কিতাবে লেখেন—

وپیش عشاء چهار رکعت مستحب ست

অর্থাৎ 'ইশার আগে চার রাকাআত নামায পড়া মুস্তাহাব।'

তিনি আরও লেখেন—

واما دو رکعت قبل عشاء فقط پس شامل ست آن را حدیث بین کل أذانین صلاة

অর্থাৎ "ইশার ফরযের আগে দুই রাকাআত নামায পড়া হাদীসের এই নির্দেশনার শামিল : "بين كل اذانين صلاة" 'প্রতি দু' আযানের মধ্যে নামায রয়েছে'।" (মিসকুল খিতাম : ১/৫২৫, ৫২৯)

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাআত বিতর পড়তেন এবং প্রতি রাকাআতে তিন সূরা করে তিন রাকাআতে নয় সূরা পড়তেন। সর্বশেষ সূরাটি হত সূরা ইখলাস।' (জামে তিরমিযী : ১/১০৬)

আবু সালামা বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন—

كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. (مسلم : صلاة الليل والوتر)

'তিনি তেরো রাকাআত নামায পড়তেন। আট রাকাআত পড়তেন এরপর বিতর পড়তেন, এরপর দুই রাকাআত নামায বসে পড়তেন।'

(সহীহ মুসলিম : ১/২৫৪)

প্রথম রেওয়ায়েত থেকে জানা যাচ্ছে, সাহাবীগণ ইশার আগে চার রাকাআত নামায পড়া মুস্তাহাব মনে করতেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যাচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার পরে চার রাকাআত নামায পড়তেন। অর্থাৎ দুই রাকাআত সুন্নত ও দুই রাকাআত নফল।

তৃতীয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যাচ্ছে, তিনি তিন রাকাআত বিতর পড়তেন।

চতুর্থ রেওয়ায়েত থেকে জানা যাচ্ছে, বিতরের পর দুই রাকাআত নফল বসে আদায় করতেন।

বিত্‌র-প্রসঙ্গ

বিতর বিষয়ক যে আলোচনা এখানে উপস্থাপিত হবে তার শিরোনামগুলো আগে উল্লেখ করছি।

১. বিতরের নামায ওয়াজিব হওয়া।

২. সময়মতো বিতর পড়া না হলে পরে আদায় করা।

৩. বিতরের রাকাআত-সংখ্যা তিন।

৪. তৃতীয় রাকাআতে রুকুর আগে দুআ কুনূত পড়া।

৫. দুআয়ে কুনুত-এর আগে তাকবীর দিয়ে হাত ওঠানো এবং পুনরায় হাত বাঁধা।

৬. দুই রাকাআত পড়ে প্রথম বৈঠক করা এবং এ বৈঠকে সালাম না ফেরানো।

এবার বিস্তারিত আলোচনা।

১. বিতরের নামায ওয়াজিব

ইশার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিতর নামায পড়া জরুরী। এ নামায না-পড়া গুনাহ।

হযরত খারিজা ইবনে হুযাফাহ বলেন—

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنَّ اللّٰهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اَلْوِتْرُ، جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلٰى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ. {ترمذى : باب الوتر}

(قال الحاكم : صحيح الاسناد. زيلعى)

"একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন এক নামায আরও দান করেছেন যা তোমাদের জন্য লাল উট থেকেও উত্তম। নামাযটি হল বিতর। এ নামাযের সময় ইশা ও ফজরের মধ্যখানে'।" (সুনানে তিরমিযী : ১/১০৩)

হযরত বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন—

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. (ابو داود : من لم يوتر) (صححه الحاكم. زيلعى)

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'বিতর অপরিহার্য, যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়; বিতর অপরিহার্য, যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়; বিতর অপরিহার্য, যে বিতর পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।" (সুনানে আবু দাউদ : ১/২০১)

২. বিতর ছুটে গেলে কাযা করতে হবে

বিতরের সময় হল ইশা থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য তাহাজ্জুদের পর বিতর পড়া উত্তম। অন্যরা ইশার নামাযের সঙ্গেই বিতর পড়বে। কেউ যদি সময়মতো বিতর পড়তে না পারে তাহলে পরে কাযা করতে হবে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهٖ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهٖ إِذَا ذَكَرَهُ. (أبو داود : أبواب الوتر)

'যে বিতর ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকল কিংবা তা ভুলে গেল সে যেন স্মরণ হওয়ার পর তা আদায় করে।' (সুনানে আবু দাউদ : ১/২০৩)

বায়হাকী শরীফে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهٖ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهٖ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ. (بيهقى : ابواب الوتر)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে বিতর ছেড়ে ঘুমিয়ে রইল কিংবা তা ভুলে গেল সে যেন সকাল বেলায় অথবা স্মরণ হওয়ার পর তা আদায় করে'।" (সুনানে বায়হাকী : ২/৪৮০)

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন—

بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرٍ قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ. (موطا مالك : الوتر بعد الفجر)

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), উবাদা ইবনে সামিত (রা.), কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমির (রহ.) ফজরের পর বিতর নামায আদায় করেছেন। অর্থাৎ সময়মতো পড়তে না পারায় ফজরের পর কাযা হিসেবে পড়েছেন। (মুয়াত্তা মালিক : পৃ. ৪৪)

২. বিতর সর্বনিম্ন তিন রাকাআত

আমরা জানি যে, দু' রাকাআতের নিচে কোনো নামায নেই। নামাযের সর্বনিম্ন রাকাআত-সংখ্যা দুই। তবে দু' রাকাআতের বেশি রয়েছে। যথা তিন রাকাআত, চার রাকাআত। হাদীস শরীফ থেকে বোঝা যায় যে, বিতর হল সর্বনিম্ন তিন রাকাআত।

হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত—

إِنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ؟ قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّيْ أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا. (مسلم : صلاة الليل والوتر)

তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কেমন হত?' উম্মুল মুমিনীন বললেন, '(শুধু রমযান কেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে ও অন্যান্য মাসেও এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। তিনি প্রথমে চার রাকাআত পড়তেন, তার দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কী বলব! এরপর চার রাকাআত পড়তেন। এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্যও বর্ণনাতীত! এরপর তিন রাকাআত (বিতর) পড়তেন।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৫৪)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ

أحد.(ترمذی : ما يقرء في الوتر) (قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. زيلعی)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা আলাক পড়তেন। দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়তেন।' (জামে তিরমিযী : ১/১০৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. (نسائی : باب كيف الوتر بثلث)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি রাতে আট রাকাআত তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তেন আর ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাআত পড়তেন।'

(সুনানে নাসায়ী : ১/১৯২)

ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামও তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। তিনি বলেন—

وَالَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، يَقْرَءُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذٰلِكَ بِسُورَةٍ. (ترمذی)

অধিকাংশ মনীষী সাহাবী ও পরবর্তীদের সিদ্ধান্ত এই যে, বিতর নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়া হবে। প্রত্যেক রাকাআতে এক এক সূরা। (জামে তিরমিযী : ১/১০৬)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন—

مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ بِثَلْثٍ وَأَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ. (موطا امام محمد : السلام في الوتر)

'যদি আমাকে তিন রাকাআত বিতর পরিত্যাগের জন্য লাল উটও প্রদান করা হয় তবুও আমি তা পরিত্যাগ করা পছন্দ করব না।' (মুয়াত্তা মুহাম্মদ : পৃ. ১৫০)

উপরোক্ত দলীলসমূহ থেকে প্রমাণ হয় যে, বিতরের নামায তিন রাকাআত। তিন রাকাআতের বৈধতার বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে।

অন্যদিকে এক রাকাআত বিতর পড়ার বিষয়ে রয়েছে মতানৈক্য। অনেকের মতেই এক রাকাআত বিতর পড়া দুরস্ত নয়। তাই দলীলের বিচারে যেমন, তেমনি সতর্কতার খাতিরেও বিতরের নামায তিন রাকাআতই পড়া উচিত।

৪. তৃতীয় রাকাআতে দুআ কুনূত

বিতরের তৃতীয় রাকাআতে রুকূর আগে দুআ কুনূত পড়া হবে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দুআ হাদীস শরীফে এসেছে।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এই দু'আ শিক্ষা দিতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা নতুন সংস্করণ : ৪/৫১৮)

শব্দের সামান্য ব্যতিক্রমসহ অন্যান্য বর্ণনায়ও এ দুআ এসেছে। হযরত উমর ফারূক (রা.) যেভাবে দুআটি পড়তেন তাতে وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، –এই বাক্যগুলো বর্ধিত রয়েছে।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা : ৩/৩৭, ১৫/৩৪৪)

তহাবীর বর্ণনায় (১/১৭৭) وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ শব্দ দুটিও রয়েছে।

এছাড়া হযরত আলী (রা.) যেভাবে পড়তেন তাতেও وَنَشْكُرُكَ শব্দটি পাওয়া যায়। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৩/১১৪)

এই বর্ণনাগুলোর আলোকে পূর্ণ দুআটি এভাবে পড়া যায় :

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ، وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ. إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ : ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমার প্রতিই ঈমান রাখি এবং তোমারই উপর ভরসা করি। আর তোমার উত্তম প্রশংসা করি। আমরা তোমার শোকরগোযারী করি, নাশোকরী করি না। যে তোমার অবাধ্য হয় তাকে আমরা পরিত্যাগ করি ও তার সংশ্রব বর্জন করি। ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমার জন্যই নামায পড়ি, তোমাকেই সাজদা করি এবং তোমার দিকেই ধাবিত হই। আর তোমারই দাসত্ব অবলম্বন করি। আমরা তোমার রহমতের আশা রাখি, তোমার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফেরদের উপর পতিত হবে।

সুনানে বায়হাকীর এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত জিব্রীল (আ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুনূত শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর শব্দের সামান্য তারতম্যসহ উপরোক্ত দুআটি উল্লেখিত হয়েছে।

(দেখুন– সুনানে বায়হাকী : ২/২১০)

আরেকটি দু'আ :

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

ইয়া আল্লাহ, যাদেরকে আপনি হেদায়েত দিয়েছেন তাদের সঙ্গে আমাকেও হেদায়েত দিন, যাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন তাদের সঙ্গে আমাকেও নিরাপত্তা দিন, যাদেরকে আপনার তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করেছেন তাদের সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করুন, আমাকে যা কিছু দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন আর আমাকে আপনার অকল্যাণের ফয়সালা থেকে হেফাযতে রাখুন। কেননা আপনিই ফয়সালাকারী, আপনার ওপর কোনো ফয়সালাকারী নেই। নিঃসন্দেহে যাকে আপনি সাহায্য করেন সে কখনো লাঞ্ছিত হয় না আর যাকে আপনি সাহায্য-বঞ্চিত করেন সে কখনো সম্মান লাভ করে না। হে আমাদের রব, আপনি মহান, সমুচ্চ! (সুনানে আবু দাউদ : ১/২০১; সুনানে নাসায়ী : ১/১৯৫; জামে তিরমিযী : ১/১০৬; সুনানে ইবনে মাজা : পৃ. ৮২)

হযরত আসওয়াদ বলেন—

صَحِبْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ. وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا.

'আমি ছয় মাস উমর (রা.)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি সর্বদা বিতরের নামাযে দুআ কুনূত পড়তেন। আবদুল্লাহ (রা.)ও সারা বছর বিতরের নামাযে দুআ কুনূত পড়তেন।' (কিয়ামুল লায়ল)

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেন—

وَجَبَ الْقُنُوتُ فِى الْوِتْرِ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ. (مروزى : قيام الليل ص ٢٢٥)

'বিতরের নামাযে দুআ কুনূত পড়া সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব।'

হাম্মাদ (রহ.) ও সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, 'কেউ যদি বিতর নামাযে দুআ কুনূত পড়তে ভুলে যায়, তবে সে সাহু সাজদা করবে।'

(কিয়ামুল লাইল : পৃ. ২৮৯)

৫. রুকূর পূর্বে দুআ কুনূত

হযরত আসিম (রহ.) বলেন—

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ : قَبْلَهُ، قُلْتُ : فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ : كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ... الحديث (بخارى : القنوت قبل الركوع أو بعده)

"আমি আনাস (রা.)কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, 'কুনূত পড়ার বিধান রয়েছে।' আমি এরপর জিজ্ঞাসা করেছি, 'রুকূর পরে না রুকূর আগে?' তিনি বলেছেন, 'রুকূর আগে।' আমি বললাম, 'অমুক আমাকে বলেছে, আপনি নাকি রুকূর পরে কুনূত পড়ার কথা বলেন।' তিনি বললেন, 'সে ভুল বলেছে। রুকূর পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এক মাস কুনূত পড়েছিলেন'।" (সহীহ বুখারী : ১/১৩৬)

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন—

وَقَدْ وَافَقَ عَاصِمًا عَلٰى رِوَايَتِهِ هٰذِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، كَمَا فِي الْمَغَازِي بِلَفْظِ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ، بَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ : بَلْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ. وَمَجْمُوعُ مَا جَاءَ عَنْ أَنَسٍ فِي ذٰلِكَ أَنَّ الْقُنُوتَ لِلْحَاجَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، لَا خِلَافَ عَنْهُ فِي ذٰلِكَ، أَمَّا لِغَيْرِ الْحَاجَةِ فَالصَّحِيحُ عَنْهُ أَنَّهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (فتح البارى : باب القنوت قبل الركوع أو بعده)

"আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব আসিম-এর উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, যা 'মাগাযী' অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। সে বর্ণনায় রয়েছে যে, 'এক ব্যক্তি আনাস (রা.)কে জিজ্ঞাসা করল, কুনূত রুকূর পরে পড়বে, না (রুকুর আগে) কিরাআত শেষ হওয়ার পর? তিনি উত্তরে বলেছেন, কিরাআত শেষ হওয়ার পর পড়বে'।"

ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, "কুনূত বিষয়ে আনাস (রা.) থেকে যতগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় তার সারনির্যাস এই যে, যে কুনূত বিশেষ উদ্দেশ্যে পড়া হয় তা হবে রুকূর পরে। আনাস (রা.) থেকে সকল বর্ণনায় একথাই এসেছে। আর সাধারণ কুনূত, যা সব সময় পড়া হয় সে সম্পর্কে (বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেলেও) রুকূর আগে পড়ার কথাই হল সহীহ বর্ণনা।" (ফাতহুল বারী : ২/৫৬৯)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ، فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (ابن ماجه : أبواب الوتر)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর পড়তেন এবং রুকূর আগে কুনূত পড়তেন।' (সুনানে ইবনে মাজা : পৃ. ৮৩)

সাহাবায়ে কেরামের আমল

আলকামা (রহ.) বলেন—

إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (مصنف ابن ابى شيبة)

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও অন্যান্য সাহাবী বিতর নামাযে রুকূর আগে দুআ কুনূত পড়তেন।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/৫২১ হাদীস ৬৯৮৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), বারা (রা.), আবু মূসা আশআরী (রা.), আনাস (রা.) এবং উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) থেকেও রুকূর আগে দুআ কুনূত পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

দুআ কুনূত পড়ার নিয়ম

দুআ কুনূত পড়ার নিয়ম এই যে, কিরাআত সমাপ্ত হওয়ার পর তাকবীর দিয়ে দুই হাত তুলবে এবং হাত বেঁধে দুআ পড়বে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَنَتَ فِى الْوِتْرِ. (مصنف ابن أبي شيبة ج ٢ ص ٣٠٧)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দুআ কুনূত পড়ার আগে দুই হাত ওঠাতেন।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৪/৫৩১; হাদীস ৭০২৮ নতুন সংস্করণ)

মারওয়াযী বর্ণনা করেন—

وَعَنْ عَلِيٍّ انه كَبَّرَ فِي الْقُنُوتِ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَحِينَ رَكَعَ ... وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي الْوِتْرِ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ حِينَ يَقْنُتُ، وإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ... وَعَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّوْرَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَنَتَ. وَعَنْ سُفْيَانَ، كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْنُتَ. (مروزى : قيام الليل ص ٢٢٩، ٢٣٠)

'হযরত আলী (রা.) কিরাআত শেষে কুনূতের জন্য তাকবীর দিয়েছেন, এরপর রুকূতে যাওয়ার সময় তাকবীর দিয়েছেন।...

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বিতরের নামাযে কিরাআত শেষে কুনূত পড়ার সময় তাকবীর দিতেন, এরপর কুনূত শেষ হওয়ার পর তাকবীর দিতেন।

বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি সূরা মেলানোর পর তাকবীর দিতেন, এরপর কুনূত পড়তেন।

সুফিয়ান (রহ.) বলেন, তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বিতরের তৃতীয় রাকাতে কিরাআতের পর তাকবীর দেওয়া ও কুনূত পড়া পছন্দ করতেন।'

(কিয়ামুল লায়ল : পৃ. ২৯৪)

ইবনে কুদামা বলেন—

إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الْقُنُوتِ إِلٰى صَدْرِهِ، وَرُوِىَ ذٰلِكَ عَنْ عُمَرَ و ابْنِ عَبَّاسٍ.

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কুনুতে বুক পর্যন্ত হাত উঠিয়েছেন। আর এটা, উমর (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।"

(আল-মুগনী : ২/৫৮৪)

ইমাম তহাবী (রহ.) বলেন—

وَأَمَّا التَّكْبِيرَةُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَإِنَّهَا تَكْبِيرَةٌ زَائِدَةٌ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ. وَقَدْ أَجْمَعَ الَّذِينَ يَقْنُتُونَ قَبْلَ الرُّكُوعِ عَلٰى الرَّفْعِ مَعَهَا. (طحاوى : رفع اليدين عند رؤية البيت)

"বিতরের নামাযে কুনূত-পূর্ব তাকবীর হল অতিরিক্ত তাকবীর। যারা রুকূর আগে দুআ কুনূত পড়েন তাদের সকলের ইজমা রয়েছে যে, দুআ কুনূতের তাকবীরের সঙ্গে দুই হাত ওঠাতে হবে।" (তহাবী : ১/৪১৬)

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, নামাযের কিছু স্থানে নির্দিষ্ট দুআ রয়েছে এবং আরও কিছু স্থানে দুআ করার সুযোগ রয়েছে। যথা আখেরী বৈঠকে দুআ রয়েছে, জলসায় (দুই সাজদার মধ্যে) দুআ রয়েছে, আবার নফল নামাযে সাজদার মধ্যেও দুআ করার সুযোগ রয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে দুআ করার সময় নামাযের স্বাভাবিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ যে রুকনে দুআ করা হচ্ছে দুআর কারণে সে রুকনের স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্তিত হয় না।

নামাযে দুআ করার এই সাধারণ নিয়ম থেকে বোঝা যায় যে, **বিতরের নামাযে রুকূর আগে যখন দুআ (দুআ কুনূত) করা হবে তখন হাত বাঁধা অবস্থায়ই দুআ করা হবে।**

প্রথম বৈঠক ও সালাম

বিতরের দুই রাকাআতের পর যথারীতি প্রথম বৈঠক হবে এবং আত্তাহিয়্যাতুর পর তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাড়াতে হবে। তৃতীয় রাকাআত সমাপ্ত হওয়ার পর সালাম ফেরাতে হবে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন—

إِنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا فَصْلَ فِيهِنَّ. (زاد المعاد ج ١ ص ٣١٩)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাআত বিতর পড়তেন যাতে কোনো ছেদ থাকত না।' (যাদুল মাআদ)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন—

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا فَصْلَ فِي الْوِتْرِ. (جامع المسانيد ج ١ ص ٤٠٢)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিতরের মধ্যে কোনো ছেদ নেই'।" (জামিউল মাসানীদ)

হযরত সা'দ ইবনে হিশাম বলেন—

إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ. (نسائی : كيف الوتر بثلاث) (قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. زيلعى)

"উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাযে দুই রাকাআতের পর সালাম ফেরাতেন না'।" (সুনানে নাসায়ী : ১/১৯১)

نقل ابن حجر حديث أبي بن كعب، وفيه : ولا يسلم إلا في آخرهن. وثبت عن عمر أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. وروي ذلك عن ابن مسعود وأنس، وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب. (ملخص فتح الباري ج ٢ ص ٤٨١، كتاب الوتر)

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তৃতীয় রাকাআতের শেষে সালাম ফেরাতেন। উমর (রা.) সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তিন রাকাআত বিতর পড়তেন এবং শুধু শেষ রাকাআতে সালাম ফেরাতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আনাস (রা.) ও আবুল আলিয়া সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা মাগরিবের নামাযের মতো তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। (ফাতহুল বারী : ২/৫৫৯)

মারওয়াযী আবু ইসহাক (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, 'আলী (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সকল শিষ্য উপরোক্ত নিয়মে বিতরের নামায পড়তেন। অর্থাৎ তাঁরা কেউ দুই রাকাআতের পর সালাম ফেরাতেন না।'
(কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ২১১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রহ.) থেকে বর্ণিত—

كان عبد الله بن عمر يقول : صلاة المغرب وتر صلاة النهار. (موطأ مالك : الأمر بالوتر)

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলতেন, 'মাগরিবের নামায হল দিনের নামাযের বিতর'।" (মুয়াত্তা মালিক)

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য নামাযের মতো বিতরের নামাযেও পূর্ণ নামায সমাপ্ত হওয়ার পর সালাম ফেরাতে হবে, নামাযের মধ্যে নয়।

বিতর নামায হচ্ছে মাগরিবের নামাযের মতো। যেভাবে মাগরিবের নামাযে যথারীতি দুই রাকাআতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়া হয় তেমনি বিতরের নামাযেও দুই রাকাআতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়া হবে।

জুমু'আ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ : فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ.

(مسلم : كتاب الجمعة)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিনের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, 'এ দিনে একটি বিশেষ সময় রয়েছে। এ সময় কোনো মুসলিম নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন'।" (সহীহ মুসলিম : ১/৩৮১)

জুমু'আর দিন গোসল করা

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত—

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. (مسلم : كتاب الجمعة)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন জুমু'আয় আসার ইরাদা করে তখন সে যেন গোসল করে'।"

(সহীহ মুসলিম : ১/২৭৯)

জুমু'আ না পড়ার শাস্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. (مسلم : التغليظ في ترك الجمعة)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাড়িয়ে বলেছেন, 'সাবধান! লোকেরা যেন জুমু'আ পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায়

আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরে মোহর করে দিবেন, এরপর তারা গাফেলীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'।" (সহীহ্ মুসলিম : ১/২৮৪)

জুমু'আর আযান

জুমু'আর নামাযে দুই আযান হবে। প্রথম আযান হবে খুতবা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে, যাতে মানুষ আযান শুনে মসজিদে জমায়েত হয়। এরপর দ্বিতীয় আযান হবে খুতবা শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে।

হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) বলেন—

إِنَّ الاذان يَوم الجُمعَةِ كَانَ أَوله حِينَ يَجلِس الإِمَام يَوم الجُمعَةِ عَلَى الْمِنبَرِ فِي عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، وَأَبِي بَكرٍ، و عُمَرَ، (رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا)، فَلَمَّا كَانَ فِى خِلَافَةِ عُثمَانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ) وكَثُرُوا أَمَرَ عُثمَان يَوم الجُمعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِنَ بِهِ عَلَى الزَّورَاءِ، فَثَبَتَ الأَمرُ عَلَى ذَٰلِكَ. (بخارى : التأذين عند الخطبة)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর যুগে ইমাম মিম্বরে বসার পর জুমু'আর প্রথম আযান দেওয়া হত। এরপর উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন জনসংখ্যা বেড়ে গেল তখন তিনি জুমু'আর আগে এক আযান বৃদ্ধি করার আদেশ দিলেন। একটি উঁচু স্থানে এই আযান দেওয়া হত। তখন থেকে এ নিয়মেই উম্মাহর আমল জারি হল।"

(সহীহ্ বুখারী : ১/১২৫)

মাসনূন খুতবা

জুমু'আর নামাযের আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি খুতবা দিতেন। দুই খুতবার মধ্যে অল্প সময় বসতেন এবং উভয় খুতবা আরবী ভাষায়। দুই খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া সুন্নত (মুয়াক্কাদাহ)। হাদীস শরীফ দ্বারা তা-ই প্রমাণিত। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং গোটা মুসলিম উম্মাহ সর্বযুগে এ অনুযায়ী আমল করেছেন। এজন্য এ নিয়মের খুতবাকে 'খুতবায়ে মাসনূনাহ' বলে।

জুমু'আর দিন যেহেতু মসজিদে অনেক মানুষের সমাগম হয় তাই এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কেউ যদি স্থানীয় ভাষায় কিছু দ্বীনী আলোচনা করে

তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এই আলোচনা 'খুতবায়ে মাসনূনাহ' বলে গণ্য হবে না। 'খুতবায়ে মাসনূনাহ' আরবী ভাষাতেই হতে হবে।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ বলেন—

وعربی بودن نیز بجہت عمل مستمر مسلمین در مشارق ومغارب باوجود آنکه دربسیارے ازاقالیم مخاطبان عجمی بودند -

(مصفی شرح موطا ص ١٥٤)

অর্থ : জুমু'আর খুতবা আরবী ভাষায় দিতে হবে। কেননা, মুসলিম জাহানের বহু অঞ্চলের ভাষা অনারবী হওয়া সত্ত্বেও গোটা মুসলিম জাহানে জুমার খুতবা আরবী ভাষায় হত। (মুসাফফা)

আজকাল গায়রে মুকাল্লিদ লোকেরা এক খুতবা স্থানীয় ভাষায় এবং অপর খুতবা আরবী ভাষায় দিয়ে থাকে। খুতবার এই নিয়ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ কিংবা সাহাবায়ে কেরামের আমল কোনো কিছু দ্বারাই প্রমাণিত নয়।●

জুমু'আর রাকাআত-সংখ্যা

৪ রাকাআত সুন্নত, ২ রাকাআত ফরয, ৬ রাকাআত সুন্নত

জুমু'আর মুসল্লীরা হয়তো ঘর থেকেই চার রাকাআত সুন্নত পড়ে আসবে কিংবা মসজিদে খুতবা শুরু হওয়ার আগে পড়বে। খুতবা চলা অবস্থায় সুন্নত পড়বে না; সে সময় মনোযোগের সঙ্গে খুতবা শুনবে। খুতবার পর দুই রাকাআত ফরয নামায পড়া হবে। এ নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কুরআন পড়বেন। ফরয নামাজের পর দুই রাকাআত অথবা চার রাকাআত অথবা ছয় রাকাআত সুন্নত পড়া হবে। কেননা এই তিন ধরনের আমলই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। বিভিন্ন অবস্থায় তিনি এই তিন ধরনের আমল করেছেন। তবে উত্তম হল ছয় রাকাআত আদায় করা। কেননা এতে পূর্ণ ছওয়াব পাওয়া যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

● এ প্রসঙ্গে গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ যেসব যুক্তি-কিয়াসের অবতারণা করে থাকেন সে সম্পর্কে পরিশিষ্টে আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা ৩৬৯

مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. (مسلم : فضل من استمع وأنصت للخطبة)

'যে গোসল করে জুমু'আর উদ্দেশ্যে আসে এবং যে পরিমাণ নফল নামায পড়ার তাওফীক হয় পড়ে এরপর ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে এবং ইমামের সঙ্গে নামায আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার দশ দিনের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেন।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৮৩)

ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) বলেছেন—

كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا أَرْبَعًا. (مصنف ابن ابى شيبه ٢٨/١٣١)

'তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) জুমু'আর আগে চার রাকাআত সুন্নত নামায পড়তেন।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)

সালিম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

(مسلم : الصلاة بعد الجمعة)

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার পরে দুই রাকাআত নামায পড়তেন।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৮৮)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا. (مسلم : الصلاة بعد الجمعة)

যে জুমু'আ পড়ল সে যেন জুমু'আর পরে চার রাকাআত নামায পড়ে।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৮৮)

عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْحَازُ عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ، قَالَ : فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ : ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذٰلِكَ، فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ؟ قَالَ : مِرَارًا. (ابو داود : الصلاة بعد الجمعة)

আতা (রহ.) বলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)কে দেখেছেন জুমু'আর নামায শেষ হওয়ার পর জায়নামায থেকে কিছুটা সরে দু' রাকাআত পড়লেন এরপর আরেকটু সরে চার রাকাআত পড়লেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আতা (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তাকে কতবার এমন করতে দেখেছেন ? আতা (রহ.) বললেন, বহুবার।

(সুনানে আবু দাউদ : ১/১৬১)

সারকথা, প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, জুমু'আর দিনের বরকতপূর্ণ সময়ে যে পরিমাণ সম্ভব নামায পড়া উচিত। আর খুতবার আগে অন্তত চার রাকাআত নামায তো অবশ্যই পড়া উচিত।

তৃতীয় হাদীস থেকে জুমু'আর পরের দুই রাকাআত আর চতুর্থ হাদীস থেকে জুমু'আর পরের চার রাকাআত নামাযের কথা জানা যাচ্ছে।

আর পঞ্চম হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে ছয় রাকাআতের কথা।

'আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—

وصح انه صلى الله عليه وسلم قال : من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا، وروى الست ركعات عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم. (مختصر فتاوى ابن تيمية ص ٧٩)

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে এসেছে যে, তিনি জুমু'আর পরে চার রাকাআত পড়ার কথা বলেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম থেকে ছয় রাকাআতের কথাও বর্ণিত হয়েছে।" (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া)

জুমু'আর নামাযের মাসনূন কিরাআত

ইবনে আবী রাফি' বলেন—

استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال : فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له : إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة رضى الله عنه : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. (مسلم : ما يقرأ في صلاة الجمعة)

"মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রা (রা.)কে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে নিজে মক্কায় চলে গেল। আবু হুরায়রা (রা.) জুমআর নামায পড়ালেন। প্রথম রাকাআতে সূরা জুমআ ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা মুনাফিকূন পড়লেন। নামায শেষে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, 'আপনি আজ যে দুই সূরা পড়লেন, কুফা নগরীতে আলী (রা.)ও এই দুই সূরা পড়তেন।' আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমআয় এই দুই সূরা পড়তে শুনেছি'।" (সহীহ মুসলিম : ১/২৮৭)

হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন—

كَتَبَ الضَّحَّاكُ بن قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَسْأَلُهُ أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ : كَانَ يَقْرَءُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ. (مسلم : ما يقرأ في يوم الجمعة)

"যাহহাক (রহ.) হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রা.)কে পত্র লিখলেন, জুমু'আর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা জুমু'আ ছাড়া আর কী সূরা পড়তেন ? নুমান (রা.) উত্তরে লিখলেন, সূরা 'হাল আতাকা' পড়তেন।" (সহীহ মুসলিম : ১/২৮৮)

তারাবী

আরবী শব্দ ((تَرَاوِيحُ)) এর বাংলা রূপ তারাবী। এ শব্দের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লেখেন—

اَلتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ، كَتَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلَامِ، سُمِّيَتِ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ التَّرَاوِيحَ لِأَنَّهُمْ أَوَّلَ مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا كَانُوا يَسْتَرِيحُونَ بَيْنَ كُلِّ تَسْلِيمَتَيْنِ. (فتح الباري : كتاب صلاة التراويح ٤/٢٩٤)

((تَرَاوِيحُ)) শব্দটি ((تَرْوِيحَةٌ)) -এর বহুবচন। ((تَرْوِيحَةٌ)) অর্থ একবার বিশ্রাম গ্রহণ করা। যেমন ((تَسْلِيمَةٌ)) অর্থ একবার সালাম দেওয়া। মাহে রমযানের বরকতময় রজনীতে জামাতের সঙ্গে যে নামায পড়া হয় তাকে تَرَاوِيحُ (তারাবী) বলে। এই নামকরণের কারণ হচ্ছে, যখন থেকে সাহাবায়ে কেরাম এ নামায সম্মিলিতভাবে আদায় করতে আরম্ভ করেন তখন থেকেই তাঁরা প্রতি দু' সালামের পর (অর্থাৎ চার রাকাআতের পর) বিশ্রাম নিতেন।' (ফাতহুল বারী)

লক্ষ করার বিষয় এই যে, تَرَاوِيحُ শব্দই বোঝাচ্ছে, এ নামাযের রাকাআত-সংখ্যা আট নয়, আটের অধিক। কেননা, ((تَرَاوِيحُ)) হল বহুবচন। আরবী ভাষায় একবচন, দ্বিবচন, এরপর বহুবচন। এজন্য তিন বা ততোধিক বোঝাতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়। তাহলে অন্তত তিন ((تَرْوِيحَةٌ)) হলে ভাষাগত দিক থেকে একে ((تَرَاوِيحُ)) বলা যায়। তাহলে চার রাকাআত = এক ((تَرْوِيحَهْ)), ৮ রাকাআত = ২ ((تَرْوِيحَةٌ)), ১২ বা ততোধিক রাকাআত = তিন ((تَرْوِيحَةٌ)) বা তারাবী)।

নবী-যুগে তারাবী নামায

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلّٰى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. قَالَ : وَذٰلِكَ فِي رَمَضَانَ.

(مسلم : الترغيب في صلاة التراويح)

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের এক রাতে মসজিদে তারাবী পড়লেন। সাহাবীগণও তাঁর সঙ্গে নামাযে শামিল হলেন। দ্বিতীয় রাতে মুকতাদী-সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। এরপর তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীর জন্য মসজিদে আসলেন না। সকালে সবাইকে লক্ষ করে বললেন, ‘আমি তোমাদের আগ্রহ ও উপস্থিতি লক্ষ করেছি, কিন্তু এ নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় আমি তোমাদের কাছে আসিনি’।” (সহীহ মুসলিম : ১/২৫৯)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى ذٰلِكَ. (مسلم : الترغيب في صلاة التراويح)

“নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘কিয়ামে রমযানে’র প্রতি উৎসাহিত করতেন, তবে তিনি তা অপরিহার্য করেননি। তিনি বলতেন, ‘যে রমযানের রাতে ঈমানের সঙ্গে ছওয়াবের আশায় দণ্ডায়মান হয় তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।’ নবী-যুগে, আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে এবং উমর (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল।” (সহীহ মুসলিম : ১/২৫৯)

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যাচ্ছে যে,

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তিন বার মসজিদে এসে জামাতের সঙ্গে তারাবী পড়েছেন।

২. পুরা রমযান তারাবী পড়া অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। এর দ্বারা নামাযীর গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবী নামাযের রাকাআত-সংখ্যা নির্ধারণ করেননি।

ইবনে তাইমিয়া বলেন—

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَدٌ مُوَقَّتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ. (فتاوى ابن تيمية مصرية ج ٢ ص ٤٠١)

'যে মনে করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবী নামাযের রাকাআত-সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন, যা থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে না, তার ধারণা ভুল।' (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া)

আল্লামা শাওকানী বলেন—

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَمَا يُشَابِهُهَا هُوَ مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ، وَالصَّلَاةُ فِيهِ جَمَاعَةً وَفُرَادَى، فَقَصْدُ الصَّلَاةِ الْمُسَمَّاةِ بِالتَّرَاوِيحِ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ وَتَخْصِيصُهَا بِقِرَاءَةٍ مَخْصُوصَةٍ لَمْ يَرِدْ بِهِ سُنَّةٌ. (نيل الاوطار ج ٣ ص ٦٤)

'সারকথা এই যে, তারাবী বিষয়ক সকল বর্ণনা সামনে রাখলে তারাবী নামায এবং তা একা বা জামাতে আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু এ নামাযের সুনির্দিষ্ট রাকাআত-সংখ্যা বা বিশেষ কিরাআত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়।' (নায়লুল আওতার)

খিলাফতে রাশিদায় তারাবী নামায

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে সবাই নিজেদের মতো তারাবী পড়ত।

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল

রমযানের প্রতি রাতে ইশার পর বিতরের আগে জামাতের সঙ্গে তারাবী নামায পড়ার এবং তাতে কুরআন খতম করার ধারাবাহিকতা হযরত উমর

(রা.)-এর খিলাফতকালে আরম্ভ হয়। সে সময় তারাবীর নামায বিশ রাকাআত পড়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বিশ রাকাআত নামায উপরোক্ত নিয়মেই আদায় করেছেন এবং এ বিষয়ে কারও দ্বিমত ছিল না। সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের আমলও এরূপ ছিল। আজ পর্যন্ত হারামাইন শরীফাইনে এই ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে।

যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবী নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, কিন্তু ফরয হওয়ার আশঙ্কায় এর নিয়মিত রূপ দিয়ে যাননি তাই তার রুচি ও ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর (রা.) আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তারাবী নামাযের নিয়মিত রূপ প্রদান করেন, যার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ– (لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ) যদি আমার পরে কোনো নবী হত তাহলে উমর নবী হত। বলাবাহুল্য; ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হওয়ার পর এখন আর তারাবী ফরয হওয়ার আশঙ্কা ছিল না।

এসব কিছু সত্ত্বেও এই পবিত্র মাসে একশ্রেণীর মানুষ আট রাকাআতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। উপরন্তু এর জন্য বিভিন্ন ধরনের হিলা-বাহানা অন্বেষণ

টীকা : জেনে রাখা ভালো যে, সর্বপ্রথম ১২৮৫ হিজরীতে প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলিম মুফতী মুহাম্মাদ হুসাইন বিটালভী এই ফতোয়া প্রচার করেছিলেন যে, 'আট রাকাআত তারাবী পড়া সুন্নত, আর বিশ রাকাআত পড়া বিদআত।' এই অদ্ভুত ফতোয়ার কারণে সে সময় উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ সে সময় এ ফতোয়ার জবাব দিয়েছেন। এমনকি ন্যায়নিষ্ঠ গায়রে মুকাল্লিদ আলিমগণও এর প্রতিবাদ করেছেন। ১২৯০ হিজরীতে প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ বুযুর্গ মাওলানা গোলাম রাসূল সাহেব এই ফতোয়ার জবাব দিয়ে লেখেন, "আমি বলি, যে হাদীসে এসেছে– 'তোমাদের কেউ কখনও মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তান থেকে এবং সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হই।' –সে হাদীস মোতাবেক খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিও মহব্বত রাখা এবং তাদের অনুসরণ করা অপরিহার্য সাব্যস্ত হয়। কেননা তাদের প্রতি মহব্বত ও অনুরাগ প্রকৃতপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও অনুরাগের দলীল। খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ এবং তাঁদের সম্পর্কে নবীজীর বাণী– 'তাঁদের সুন্নত দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দ্বারা আকড়ে রাখবে'— স্মরণ রাখাও নবী-মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ। এর বিপরীতে এমন অবস্থা কোনোভাবেই কাম্য নয় যে, কাপুরুষতার কারণে নিজেরা শুধু এগারো রাকাআত নামায পড়লাম আর সাহাবায়ে কেরামের আমলকে বিদআত ঘোষণা দিয়ে তাঁদের ইজমা বা সম্মিলিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে থাকলাম। এমনকি যারা তেইশ রাকাআত নামায আদায় করে থাকেন তাদের প্রতি 'মুশরিক সুলভ কর্মে'র ও 'পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের' অপবাদও দিয়ে দিলাম।

"তারাবী বিষয়ে আমাদের প্রথম দলীল হল রাসূলুল্লাহর হাদীস। ফাযাইলের ক্ষেত্রে এ পর্যায়ের হাদীস অনুসরণ-যোগ্য হওয়ার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। দ্বিতীয় দলীল হল সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন,

(পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করেন। এর মধ্যে একটি এই যে, 'তারাবী নামায বিশ রাকাআত হওয়া হযরত উমর (রা.)-এর যুগে সাব্যস্ত হয়েছে।'

প্রশ্ন এই যে, তারাবীর বর্তমান নিয়মিত রূপটিও তো উমর (রা.)-এর যুগেই নির্ধারিত হয়েছে। যথা : পুরা রমযান জামাতের সঙ্গে তারাবী পড়া, বিতরের নামায জামাতে আদায় করা ইত্যাদি। তাহলে শুধু তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা বিষয়ে এই আপত্তি কতটুকু যৌক্তিক ?

হযরত আবদুর রহমান আলকারী (রহ.) বলেন—

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ : نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ، يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. (موطأ مالك : ما جاء في قيام رمضان)

"আমি রমযান মাসে উমর (রা.)-এর সঙ্গে মসজিদে গেলাম। দেখলাম, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তারাবী পড়ছেন। কেউ একা পড়ছেন, আবার কেউ দু' চারজন সঙ্গে নিয়ে পড়ছেন। তখন উমর (রা.) বললেন, 'এদের সকলকে যদি এক ইমামের পিছনে জামাতবদ্ধ করে দেই তাহলে মনে হচ্ছে উত্তম

চার মুজতাহিদ ইমাম এবং মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত আমল, যা উমর ফারূক (রা.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মাশরিক-মাগরিব সর্বত্র জারি রয়েছে। তারা সকলে তেইশ রাকাআত নামায পড়েছেন। কিন্তু এই গোড়া লোকটি সকলের সম্মিলিত কর্মধারাকে বিদআত ঘোষণা করেছে এবং বলাবাহুল্য, সে সীমালংঘন করেছে।"

তিনি আরও লেখেন, "এই মুফতী সুন্নত অনুসরণকারীদের আমলকে বিদআত ঘোষণা দিয়েছে এবং উমর (রা.)-এর যুগ থেকে সাহাবা, তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং গোটা মুসলিম বিশ্বের আলিমদেরকে সুন্নাহ-বিরোধী আখ্যা দিয়েছে। তার এ কর্ম যে অন্যায় সিনাজুরি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বরং এই মুফতী তো এ পর্যায়ে পৌছেছে যে, মুসলিম উম্মাহর এই সর্ববাদীসম্মত আমলকে ইশারা-ইঙ্গিতে 'মুশরিকদের কর্ম' আখ্যা দিতে এবং তাদের সবাইকে 'পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারী' সাব্যস্ত করতেও তার বিবেক-বুদ্ধিতে বাধেনি।" (গোলাম রাসূল, রিসালা তারাবী পৃ. ২৮, ৫৬)

হয়।' এরপর তিনি তাদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে জামাতবদ্ধ করে দিলেন।"

আবদুর রহমান বলেন, "আরেক রাতে আমরা বের হলাম। লোকেরা এক ইমামের পিছনে তারাবীর নামায পড়ছিল। উমর (রা.) বললেন, 'এই নিয়ম কত ভালো। তবে রাতের যে অংশে তোমরা নামাযে দণ্ডায়মান হও তা থেকে ওই অংশ উত্তম যে অংশে তোমরা ঘুমিয়ে থাক। অর্থাৎ শেষ রাত।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন প্রথম রাতেই নামায পড়া হত।" (মুয়াত্তা মালিক)

ইয়াযীদ ইবনে রুমান বলেন—

كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ رَكْعَةً. (موطأ مالك : ما جاء في قيام رمضان)

'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম তেইশ রাকাআত নামায আদায় করতেন।' (মুয়াত্তা মালিক)

ইমাম বায়হাকী 'কিতাবুল মারিফা'য় সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন—

كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ. (اسناده صحيح. نصب الراية ج ٢ ص ١٥٤)

'আমরা উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে বিশ রাকাআত তারাবী ও বিতর পড়তাম।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর গবেষণা

فَلَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ. (الفتاوى المصرية ج ٢ ص ٤٠١)

'যখন উমর (রা.) লোকদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে একত্র করে দিলেন তখন তিনি বিশ রাকাআত তারাবী ও বিতর পড়তেন।'

(আল-ফাতাওয়াল মিসরিয়্যা)

আরও লেখেন—

فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَهُمْ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الَّذِي جَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ بِأَمْرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ هُوَ مِنَ

الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ حَيْثُ يَقُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. يَعْنِي الْأَضْرَاسَ، لِأَنَّهَا أَعْظَمُ فِي الْقُوَّةِ. وَهٰذَا الَّذِيْ فَعَلَهُ هُوَ سُنَّةٌ. (فتاوى ابن تيمية ج ٢٢ ص ٢٣٤)

"উমর (রা.) সকল সাহাবীকে উবাই ইবনে কাব (রা.)-এর পিছনে এক জামাতে একত্র করেছেন। বলাবাহুল্য, উমর (রা.) খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাহকে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে রাখবে।'

"মাড়ির দাঁতের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য বলেছেন যে, এভাবে ধারণ করলে তা মজবুত হয়ে থাকে। তারাবী বিষয়ে উমর (রা.)-এর এই কাজ সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।" (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া)

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর খিলাফতকাল

তৃতীয় খলীফায়ে রাশেদ হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর খিলাফত-কালেও তারাবী নামায বিশ রাকাআত পড়া হত।

সাইব ইবনে ইয়াযীদ বলেন—

كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً، وَكَانُوْا يَقْرَؤُوْنَ بِالْمِئِيْنَ، وَكَانُوْا يَتَوَكَّؤُوْنَ عَلٰى عِصِيِّهِمْ فِيْ عَهْدِ عُثْمَانَ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ. (بيهقى : عدد ركعات القيام في رمضان) (رجاله ثقات : آثار السنن)

'উমর (রা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম তারাবীর নামায বিশ রাকাআত পড়তেন এবং শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন। উসমান (রা.)-এর যুগে দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকার কারণে তারা লাঠিতে ভর দিতেন।'

(সুনানে বায়হাকী : ২/৪৯৬)

হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল

তৃতীয় খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রা.)ও তাঁর খিলাফতকালে তারাবী নামায বিশ রাকাআত পড়ার আদেশ দিয়েছেন।

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : دَعَا الْقُرَّاءَ فِيْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً. قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يُوْتِرُ بِهِمْ.

(بيهقى : عدد ركعات القيام في رمضان)

আবু আবদুর রহমান আস্ সুলামী বলেন, "আলী (রা.) রমযান মাসে কারীদেরকে ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন, তারা যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবী পড়েন। আর বিতর পড়াতেন স্বয়ং আলী (রা.)।"

(সুনানে বায়হাকী : ২/৪৯৬)

عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً، وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَفِيْ ذٰلِكَ قُوَّةٌ. (بيهقى : عدد ركعات القيام)

আলী (রা.)-এর একজন শিষ্য শুতাইর ইবনে শাক্‌ল রমযান মাসে বিশ রাকাআত তারাবী এবং তিন রাকাআত বিতর পড়াতেন।

(সুনানে বায়হাকী : ২/৪৯৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক সহচর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)ও বিশ রাকাআত তারাবী পড়তেন।

আ'মাশ (রহ.) বলেন—

كَانَ (ابْنُ مَسْعُوْدٍ رض) يُصَلِّيْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً، وَيُوْتِرُ بِثَلٰثٍ. (مروزى : قيام الليل ص ١٥٧)

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বিশ রাকাআত তারাবী এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তেন।' (কিয়ামুল লায়ল)

সাহাবায়ে কেরাম ও মক্কাবাসীদের আমল

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন—

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رض وَ عُمَرَ رض وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهٰكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ، يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً... (ترمذى : ما جاء في قيام شهر رمضان)

"(তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা বিষয়ে) অধিকাংশ মনীষী ওই মতই পোষণ করেন যা আলী (রা.), উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিশ রাকাআত। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সিদ্ধান্তও তাই। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, 'আমি মক্কাবাসীকে বিশ রাকাআত তারাবীই পড়তে দেখেছি'।" (জামে তিরমিযী : ১/১৬৬)

এখানে জেনে রাখা ভালো যে, অধিকাংশ মনীষী বিশ রাকাআত তারাবীর মত পোষণ করলেও কিছু মনীষী (বিতরসহ) ৪১ রাকাআত তারাবী পড়তেন। এ মতটিও ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। এর প্রেক্ষাপট সামনের এক রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) মক্কাবাসী ও মদীনাবাসীদের আমল উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাদের কেউ আট রাকাআত তারাবী পড়তেন এমন কথা কোথাও বর্ণনা করেননি।

সালাফের ইজমা

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও ফুকাহায়ে উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, তারাবী নামায বিশ রাকাআত পড়া সুন্নত।

ইবনে কুদামাহ লেখেন—

وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَحْمَدَ فِيْهَا عِشْرُوْنَ رَكْعَةً، وَبِهٰذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى أُبَيٍّ كَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً، وَرِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ (كَمَا مَرَّ) وَرِوَايَةِ عَلِيٍّ رض (كَمَا مَرَّ) وَيَقُوْلُ : وَهٰذَا كَالْإِجْمَاعِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلٰى وَأَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ. (ملخص المغني ج ٢ ص ١٣٩ صلاة التراويح)

'ইমাম আহমদ (রহ.)-এর কাছে পছন্দনীয় আমল হল বিশ রাকাআত তারাবী পড়া। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)ও তাই বলেন। তাঁদের দলীল এই যে, উমর (রা.) যখন উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে সাহাবায়ে কেরামকে একত্র করেছেন তখন তারা বিশ রাকাআত তারাবী পড়েছেন। তাছাড়া ইয়াযীদ (রা.) ও আলী (রা.)-এর হাদীস থেকেও ইমাম আহমদ (রহ.) প্রমাণ গ্রহণ করেছেন।' ইবনে কুদামাহ (রহ.) বলেন, 'এটা মূলত সাহাবায়ে কেরামের ইজমাকেই প্রকাশ করে। আর সাহাবায়ে কেরাম যে বিষয়কে অবলম্বন করেছেন তা-ই গ্রহণীয় ও অনুসরণীয়।' (আল-মুগনী)

আতা (রহ.) বলেন—

أَدْرَكْتُهُمْ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ.

(مروزی : قيام الليل ص ٥٧)

'আমি সাহাবায়ে কেরামকে রমযান মাসে বিশ রাকাআত তারাবী পড়তে এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তে দেখেছি।' (কিয়ামুল লায়ল)

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন—

وَالْمُرَادُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا، وَاخْتَلَفُوا أَنَّ الْأَفْضَلَ صَلَاتُهَا مُنْفَرِدًا فِي بَيْتِهِ أَمْ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ : الْأَفْضَلُ صَلَاتُهَا جَمَاعَةً كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالصَّحَابَةُ، وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ.

(شرح مسلم للنووی، ملخصا، الترغيب في قيام رمضان)

"কিয়ামে রমাযান-এর অর্থ হল তারাবী। এই নামায অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ– এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। তবে তা ঘরে একা আদায় করা উত্তম, না মসজিদে জামাতের সঙ্গে–এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ ও মালেকী মাযহাবের কিছু আলিম এবং অন্য অনেকের মতে

জামাতের সঙ্গে পড়া উত্তম। কেননা, উমর (রা.) ও সাহাবায়ে কেরাম এভাবেই তা নির্ধারণ করেছেন। আর মুসলিম উম্মাহর সর্বযুগের আমলও এরূপ ছিল। কেননা, এটা ইসলামের প্রকাশ্য ইবাদতগুলোর অন্যতম।' (শরহু মুসলিম)

ইমাম নববী আরও বলেন—

إِعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. (الأذكار ص ٨٣)

'তারাবী নামায সুন্নত হওয়ার বিষয়ে সকল আলিম একমত। এ নামায বিশ রাকাআত, যার প্রতি দু' রাকাআতে সালাম ফেরাতে হয়।' (শরহু মুসলিম)

আ'রাজ (রহ.) বলেন—

مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِيْ رَمَضَانَ. قَالَ : وَكَانَ الْقَارِئُ يقرء سورة الْبَقَرَةِ فِيْ ثَمَانِ رَكْعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا فِيْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَاتٍ رأى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ. (قَالَ الْبَاجِيُّ : ادركت النَّاسَ أى الصَّحَابَةَ. قَدْرُ الْقِرَاءَةِ فِيْ رَمَضَانَ)

"আমি সকল সাহাবীকে দেখেছি তারা রমযান মাসে কাফেরদের জন্য বদদুআ করতেন।" তিনি আরও বলেন, "ইমাম আট রাকাআতে সূরা বাকারা

টীকা : তাবেয়ী যুগে মদীনাবাসীদের কেউ কেউ ছত্রিশ বা চল্লিশ রাকাআত নামাযও আদায় করতেন। তবে তাদেরও মূল তারাবী ছিল বিশ রাকাআত। অবশিষ্ট রাকাআত সম্পর্কে ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন–

إِنَّمَا فَعَلَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا مُسَاوَاةَ أَهْلِ مَكَّةَ، فَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يَطُوفُونَ سَبْعًا بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ. فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مَكَانَ كُلِّ سَبْعٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَأَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ. (المغنى ج ٢ ص ١٣٩ صلاة التراويح)

"আলিমগণ বলেছেন যে, মদীনাবাসীরা এটা করেছেন ছওয়াবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মানসিকতা থেকে। কেননা, মক্কাবাসীরা প্রতি চার রাকাআত নামাযের পর সাত বার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতেন। এ সংবাদ শুনে মদীনাবাসীরা (তারাবীর) প্রতি চার রাকাআতের চার রাকাআত (নফল) পড়তে আরম্ভ করলেন। তবে সাহাবায়ে কেরামের আমলই অধিকতর অনুসরণীয়'।" (আলমুগনী)

সমাপ্ত করতেন। কখনো যদি বারো রাকাআতে সূরা বাকারা সমাপ্ত করা হত তাহলে সাহাবীগণ মনে করতেন যে, আজ ইমাম নামাযকে সহজ করেছেন।"

এই বর্ণনা থেকেও স্পষ্ট হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের তারাবী আট রাকাআতের বেশি হত। অন্যান্য বর্ণনায় পরিষ্কার এসেছে যে, তাঁরা বিশ রাকাআত পড়তেন। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদের আলোকে এবং সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত আমলের অনুসরণে আমাদেরও বিশ রাকাআতই পড়া উচিত। তাবেয়ীন ও পূর্ববর্তী ফুকাহা মুজতাহিদীনের কর্মপন্থাও তা-ই ছিল।

তারাবী নামাযের চৌদ্দ শ' বছরের ইতিহাস

হারাম শরীফের আমল

মক্কা মুকাররমায় উমর ফারূক (রা.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তারাবী নামায বিশ রাকাআত পড়া হয়েছে। কোনো যুগে এর কম বা বেশি পড়া হয়েছে– এমন কোনো কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। এজন্য আজও মক্কা মুকাররমায় তারাবী নামায বিশ রাকাআত পড়া হয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মক্কাবাসীর কর্মপন্থা উল্লেখ করে লেখেন—

وَأَحَبُّ إِلَيَّ عِشْرُونَ، لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَكَذٰلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ، وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ. (الأم ج ١ ص ١٤٢)

"তারাবী নামায বিশ রাকাআত পড়া আমার কাছে এজন্য পছন্দনীয় যে, উমর (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। মক্কাবাসীও তারাবী নামায এভাবেই আদায় করেন। আর তারা বিতর নামায তিন রাকাআত পড়ে থাকেন।"

(কিতাবুল উম্ম)

ইমাম তিরমিযী (রহ.) লেখেন—

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهٰكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً. (ترمذى : ما جاء في قيام رمضان)

"অধিকাংশ আহলে ইলম ওই মতই পোষণ করেন, যা উমর (রা.), আলী (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তারাবী নামায বিশ রাকাআত পড়া। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতও তাই। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন, 'আমি মক্কাবাসীকে বিশ রাকাআত তারাবী নামায পড়তে দেখেছি'।"

(জামে তিরমিযী : ১/১৬৬)

মোটকথা, তারাবী নামায বিশ রাকাআত পড়া সাহাবায়ে কেরাম, পরবর্তী আহ্লে ইলম এবং সকল মক্কাবাসীর আমল ছিল।

মদীনা মুনাওয়্যারা

চৌদ্দ শ' বছরের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, মদীনাবাসীও সর্বদা তারাবী নামায বিশ রাকাআত পড়েছেন। তবে কিছু উদ্যমী মানুষ ছত্রিশ রাকাআত তারাবী এবং তিন রাকাআত বিতরও পড়েছেন। এর কারণও ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সৌদী আরবের প্রসিদ্ধ আলিম, মসজিদে নববীর মশহুর মুদাররিস এবং মদীনা শরীফের বর্তমান কাযী শায়খ আতিয়্যা সালিম আরবী ভাষায় একটি কিতাব লিখেছেন, যার বিষয়বস্তু হল মসজিদে নববীতে তারাবী নামাযের চৌদ্দ শ' বছরের ইতিহাস। ভূমিকায় তিনি কিতাব রচনার কারণ উল্লেখ করে বলেন,

'মসজিদে নববীতে তারাবী নামায হতে থাকে, ওদিকে কিছু মানুষ আট রাকাআত পড়ে নামায সমাপ্ত করে দেয়। তাদের ধারণা, তারাবী নামায আট রাকাআত পড়া উচিত, এর বেশি পড়া জায়েয নয়। এভাবে এই মানুষগুলো মসজিদে নববীর অবশিষ্ট নামাযের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকে। তাদের মন্দ নসীব দেখে দুঃখ হয়। তাই আমি এই কিতাব রচনার ইচ্ছা করেছি, যাতে তাদের সন্দেহ-সংশয় দূর হয় এবং তারাবী নামায বিশ রাকাআত পড়ার তাওফীক হয়। আর যে গোড়া কিসিমের মানুষ ইশার নামায সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এজন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় যে, দূরের কোনো মসজিদে গিয়ে আট রাকাআত তারাবী আদায় করবে তাদেরকে শুধু এটুকু বলে দেওয়াই যথেষ্ট যে, মসজিদ থেকে বের হয়ে না তোমরা ওই হাদীস মোতাবেক আমল করলে যে হাদীসে ঘরে যেয়ে নফল পড়ার ফযীলত উল্লেখিত হয়েছে, আর না মসজিদে নববীতে তারাবী পড়ার ফযীলত লাভ করলে, যে মসজিদে এক রাকাআত নামায পড়া অন্যত্র এক হাজার রাকাআত নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।'

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে তারাবী নামায

এ শতাব্দীর ইতিহাস এতক্ষণের আলোচনায় এসে গেছে, যার সারকথা এই যে, খিলাফতে রাশেদার পুণ্য যুগে এবং তার পরেও সাহাবায়ে কেরাম বিশ রাকাআত তারাবী পড়েছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দী

শায়খ আতিয়্যা সালিম লেখেন—

مَضَتِ الْمِئَةُ الثَّانِيَةُ وَالتَّرَاوِيحُ سِتٌّ وَثَلاثُونَ وَثَلاثُ وِتْرٍ، ودَخَلَتِ الْمِئَةُ الثَّالِثَةُ، وَكَانَ الْمَظْنُونُ أَنْ تَظَلَّ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ تِسْعٌ وثَلاثُونَ بِمَا فِيْهِ الْوِتْرُ، (التراويح أكثر من ألف عام ص ٤١)

'দ্বিতীয় শতাব্দীতে তারাবী নামায ছত্রিশ রাকাআত পড়া হত এবং তিন রাকাআত বিতর পড়া হত। তৃতীয় শতাব্দীতেও তা-ই হয়ে থাকবে। (কেননা এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটার প্রমাণ পাওয়া যায় না)। (আত-তারাবীহ আকছারা মিন আলফি আম)

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী

عَادَتِ التَّرَاوِيحُ فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ كُلِّهَا إِلَى عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فَقَطْ بَدَلاً مِنْ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ فِي السَّابِقِ. (التراويح ... ص ٤٢)

'এই তিন শতাব্দীতে ছত্রিশ-এর পরিবর্তে পুনরায় বিশ রাকাআত তারাবী পড়া আরম্ভ হল।' (প্রাগুক্ত)

অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী

فَكَانَ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً عَلَى الْمُعْتَادِ، ثُمَّ يَقُوْمُ آخِرَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ بِسِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (التراويح ... ص ٤٧)

'প্রথম রাতে যথারীতি বিশ রাকাআত তারাবী নামায পড়া হত এবং শেষ রাতে ষোল রাকাআত নামায আদায় করা হত।' (প্রাগুক্ত)

নবম শতাব্দীর কর্মধারাও এরূপ ছিল। (প্রাগুক্ত)

দশম শতাব্দীতেও এর অনুরূপ। (প্রাগুক্ত)

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও অনুরূপ আমল ছিল। (প্রাগুক্ত)

চর্তুদশ শতাব্দী

دَخَلَ الْقَرْنُ الرَّابِعَ عَشَرَ وَالتَّرَاوِيْحُ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ عَلَىٰ مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، وَظَلَّتْ إِلَىٰ قَرَابَةِ مُنْتَصَفِهِ. (التراويح ... ص ٥٨)

'এ শতাব্দীর প্রথম দিকে মসজিদে নববীতে তারাবী নামায পূর্বের মতোই ছিল।' অর্থাৎ প্রথম রাতে বিশ রাকাআত পড়া হত এবং শেষ রাতে ষোল রাকাআত।

এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বিষয়ে তিনি লেখেন—

ثُمَّ جَاءَ الْعَهْدُ السُّعُودِيُّ، فَتَوَحَّدَتْ فِيْهِ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ وَفِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَلِلتَّرَاوِيْحِ، وَعَادَتْ حَالَةُ الْإِمَامَةِ إِلَىٰ أَصْلِهَا مُوَحَّدَةً مُنْتَظِمَةً. أَمَّا عَدَدُ الرَّكَعَاتِ وَكَيْفِيَّةُ الصَّلَاةِ فَكَانَتْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَثَلَاثًا وِتْرًا، وَذٰلِكَ طِيْلَةَ الشَّهْرِ ... وَعَلَيْهِ فَتَكُوْنُ التَّرَاوِيْحُ قَدِ اسْتَقَرَّ عَلَىٰ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً عَلَىٰ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِيْ جَمِيْعِ الْبِلَادِ. (التراويح ... ص ٦٥)

'এ সময় সৌদী শাসনামলের সূচনা হল এবং মক্কা ও মদীনার পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তারাবীর ব্যবস্থাপনা অধিক সুসংহত করা হল। এ সময় পুরা রমযান ইশার পর বিশ রাকাআত তারাবী ও তিন রাকাআত বিতর পড়া হত।

'এভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদে নববীতে তারাবী নামায বিশ রাকাআত হওয়া ছিল সর্বযুগের সাধারণ আমল। অন্যান্য ভূখণ্ডেও এ নিয়ম জারি ছিল।' (প্রাগুক্ত)

তারাবী নামাযের হানাফী ইমাম

وَكَانَ الشَّيْخُ أَسْعَدُ تَوْفِيْقُ مِنْ أَئِمَّةِ الْأَحْنَافِ قَبْلَ الْعَهْدِ السُّعُوْدِيِّ، فَأُسْنِدَتْ إِلَيْهِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ... وَالشَّيْخُ أَسْعَدُ هُوَ الَّذِيْ تَوَلّٰى صَلَاةَ التَّرَاوِيْحِ. (التراويح ... ص ١٠٠ ص ٦٩)

'সৌদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে শায়খ আসআদ তাওফীক হানাফী (রহ.) মসজিদে নববীর ইমাম ছিলেন। সৌদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও

ইশার নামাযের ইমামতের দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল। শায়খ আসআদ (রহ.) তারাবী নামাযও পড়াতেন।' (প্রাগুক্ত)

তারাবী নামায যে নিয়মে হত

يَبدأُها فَضِيلَةُ الشَّيخِ عَبدُ العَزِيزِ، فَيُصَلِّي عَشر رَكعَاتٍ فِي خَمسِ تَسلِيمَاتٍ، وتَستَمِرُّ إِلىٰ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ إِلَّا خَمس دقَائِق، اى تَستَغرِقُ نِصفَ سَاعَةٍ تَمَامًا، ثُم يَبدأُها فَضِيلَةُ الشَّيخِ عَبدُ المَجِيدِ فِي العَشرِ رَكعَاتٍ الأُخرى مُبَاشِرَةً، يُصَلِّيهَا بِخَمسِ تَسلِيمَاتٍ ... فَيَكُونُ العِشرُون رَكعَةً كَامِلَةً بِجُزءٍ كَامِلٍ. (التراويح ص ٧٩ ص ٧٨)

'প্রথমে শায়খ আবদুল আযীয পাঁচ সালামে দশ রাকাআত পড়াতেন। (আরবের সময় হিসেবে) দুইটা পঞ্চান্ন মিনিট পর্যন্ত আধা ঘন্টায় দশ রাকাআত নামায পড়াতেন। এরপর শায়খ আবদুল মজীদ দশ রাকাআত পড়াতেন। এভাবে বিশ রাকাআত পূর্ণ হত এবং এক পারা কুরআন পড়া হত।' (প্রাগুক্ত)

পঞ্চদশ শতাব্দী

অধম ফয়সল (মূল গ্রন্থকার) বলছি, শায়খ আবদুল আযীয ও শায়খ আবদুল মজীদ ২২ সফর ১৪০৫ হিজরী পর্যন্ত বা-হায়াত ছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম চার বছরও তাঁরাই উপরোক্ত নিয়মে তারাবী পড়িয়েছেন। মসজিদে নববীর মতো মক্কা মুকাররমায়ও তারাবীর নামায বিশ রাকাআত পড়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, আল্লাহ যেন সকল মুসলমানকে মক্কা-মদীনার মতো বিশ রাকাআত তারাবী পড়ার তাওফীক দান করেন।

দু'টি প্রশ্ন

উপরের সম্পূর্ণ আলোচনা শেষে শায়খ আতিয়্যা সালিম লেখেন—

وَفِي نِهَايَةِ هٰذَا العَرضِ التَّارِيخِي نَستَوقِفُ القَارِئَ الكَرِيم نَتَسَاءَلُ مَعَهُ هَل وجد التَّراوِيح عَبر التَّارِيخِ الطَّوِيلِ أَكثَر مِن أَلفِ عَامٍ فِي مَسجِدِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ مُنذُ نَشأَتِهَا إِلىٰ اليَومِ قَدِ اقتَصرت عَلىٰ ثَمَانِ رَكعَاتٍ

أو قلت عن العشرين ركعة، أم أنها أربعة عشر قرنا وهي على هذا الحال ما بين العشرين والأربعين، وهل سمع قولا ممن تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أو الذين سبقونا بالإيمان ولو من شخص واحد يقول : لا تجوز الزيادة على الثمان ركعات أخذا بحديث عائشة رضي الله عنها... وإذا لم يوجد طيلة تلك المدة من يقول : لاتجوز الزيادة على الثمان ركعات، ولا وجد طيلة هذا المدة من يقتصر على ثمان ركعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، فإن أقل ما يقال لهؤلاء الذين لايرون جواز الزيادة على الثمان ركعات ولا يقتصرون على أنفسهم فيما ارتأوه، بل يدعون غيرهم إليه، فيقال لهم : إن اتباع الأمة من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم، وموافقة الجماعة من الصدر الأول إلى هذا العهد خير من المخالفة، وخصوصا من يصلي في المسجد ومع الإمام.

(التراويح ... ص ١٠٨ ص ١٠٩)

"উপরের এই দীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনার পর পাঠকের খেদমতে আমাদের প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই সুদীর্ঘ এক হাজার বছরেরও বেশি সময়ে কখনো কি মসজিদে নববীতে তারাবী নামায আট রাকাআত পড়া হয়েছে? কিংবা বিশ রাকাআতের কম পড়া হয়েছে? হয়নি। বরং ইতিহাস একথাই প্রমাণ করে যে, পুরা চৌদ্দ শ' বছর তারাবী নামায বিশ রাকাআত বা তারও বেশি পড়া হয়েছে।

"দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোনো মুহাজির বা আনসারী সাহাবী কি এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, তারাবী নামায আট রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়া জায়েয নয়? তাদের কেউ কি আয়েশা (রা.)-এর হাদীসকে আট রাকাআত তারাবীর পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন?

"যখন এই দীর্ঘ সময়ে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিও এমন পাওয়া যায় না, যিনি বলেছেন– তারাবী নামায আট রাকাআতের বেশি পড়া জায়েয নয়, আর না মসজিদে নববীতে তারাবী নামায আট রাকাআত হওয়ার কোনো প্রমাণ রয়েছে, তারপরও যারা আট রাকাআত নিয়েই অটল হয়ে আছেন এবং অন্যদের সেদিকে আহ্বান জানাচ্ছেন তাদেরকে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলিমের যে অবিচ্ছিন্ন

কর্মধারা, তার বিরোধিতা করার চেয়ে অনুসরণ করাই অধিক শ্রেয়, বিশেষত যিনি মসজিদে জামাতের সঙ্গে তারাবী পড়তে ইচ্ছুক।"

একটি মুখলিসানা নসীহত

মাহে রমযানে আল্লাহ তাআলার সীমাহীন রহমত বান্দার জন্য অবারিত হয়। এ মাসে এক রাকাআতের ছওয়াব অন্তত সত্তর গুণ হয়ে থাকে। এরপর প্রত্যেকের ইখলাস ও খুশুখুযু অনুযায়ী সাত শ' গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এমনকি আল্লাহ যাকে দান করতে চান এর চেয়েও বেশি দান করে থাকেন। এজন্য এই সময়কে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে সর্বোচ্চ অর্জনে মনোনিবেশ করা উচিত। এ অমূল্য সময়ে অলসতা করে বা ফের্কাগত সংকীর্ণতার শিকার হয়ে কেউ যদি এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে এবং পূর্ণ তারাবী না পড়ে আল্লাহর দান থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে তবে সে নিতান্তই মন্দনসীব। কিয়ামতের দিন বুঝে আসবে, মৃত্যুর আগে অতি সহজেই যা অর্জন করা সম্ভব ছিল তার মূল্য কত। নিচের নকশা থেকে বিশ রাকাআত তারাবী ও আট রাকাআত তারাবীর ছওয়াবের ন্যূনতম তারতম্য লক্ষ্য করুন, এরপর নিজের জন্য কোনো একটিকে পছন্দ করুন।

বিশ রাকাআত তারাবী : ২০×৩০ = ৬০০   ৬০০×৭০ = ৪২,০০০

আট রাকাআত তারাবী : ৮×৩০ = ২৪০   ২৪০×৭০ = ১৬,৮০০

তাহলে বিশ রাকাআত তারাবী আদায়কারী মাত্র এক মাসে অন্তত ৪২,০০০ রাকাআত নামায পড়ার ছওয়াব পেয়ে থাকেন (বরং এর চেয়েও বেশি)। অন্যদিকে আট রাকাআত তারাবী আদায়কারীর হিসাবে আসছে ষোল হাজার আট শ' রাকাআত নামাযের ছওয়াব।

আমাদের কি অধিক ছওয়াব অর্জনের পথ অবলম্বন করা উচিত নয়?

কিছু রেওয়ায়াত ও আলোচনা

পিছনের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, সাহাবায়ে কেরাম পুরা রমযান ইশার পর বিশ রাকাআত তারাবী জামাতের সঙ্গে আদায় করতেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও জানা গেছে যে, একশ্রেণীর মানুষ তারাবী প্রসঙ্গে উপরোক্ত সকল বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করেও শুধু রাকাআত সংখ্যার বিষয়ে নিজেদের চিন্তা-ভাবনার উপর নির্ভর করতে আগ্রহী।

তারা কিছু 'অপ্রাসঙ্গিক' কিংবা 'ভিত্তিহীন' রেওয়ায়াত দ্বারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে প্রমাণসিদ্ধ করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন। এরূপ কিছু বর্ণনা প্রয়োজনীয় পর্যালোচনাসহ উল্লেখ করছি।

১. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি বর্ণনা

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. (مسلم : صلاة الليل والوتر)

আবু সালামা বলেন যে, তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করেছেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কেমন হত? আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে **এবং অন্য মাসে** এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। তিনি চার রাকাআত নামায এমনভাবে পড়তেন যে, এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কী বলব! এরপর আবার চার রাকাআত এভাবে পড়তেন যে, এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্যের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এরপর তিনি তিন রাকাআত নামায পড়তেন।' আয়েশা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বিতর পড়ার আগে ঘুমাচ্ছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছেন, 'আয়েশা! আমার চোখ নিদ্রিত হয়, কিন্তু অন্তর সজাগ থাকে।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৫৪)

আলোচনা

এই হাদীসে আট রাকাআত তারাবীর ভিত্তি খোঁজা হয়, অথচ হাদীসটি তারাবী বিষয়ক নয়। কেননা,

১. তারাবী নামায শুধু রমযান মাসে পড়া হয়, আর হাদীসে এমন নামাযের কথা বলা হয়েছে, যা রমযান ছাড়া অন্য মাসেও পড়া হয়। বলাবাহুল্য, তা হচ্ছে তাহাজ্জুদ নামায।

যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে ইবাদতে বেশি নিমগ্ন থাকতেন তাই সম্ভাবনা ছিল যে, তাহাজ্জুদ নামাযের রাকাআত-সংখ্যা অন্য মাসের চেয়ে বেশি হবে। আয়েশা (রা.) জানিয়ে দিলেন যে, তাহাজ্জুদের রাকাআত সংখ্যা রমযান মাসেও অপরিবর্তিত থাকত।

রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত-মগ্নতা কীরূপ হত তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে অনুমান করা যায়।

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. (مسلم : الاجتهاد في العشر الأواخر)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে এত পরিশ্রম করতেন, যা অন্য সময় করতেন না।' (সহীহ মুসলিম : ১/৩৭২)

২. সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। হাদীস শরীফের অর্থ ও মর্ম তাঁরাই জানতেন ও বুঝতেন সবচেয়ে বেশি। তাঁরা উপরোক্ত হাদীসকে গ্রহণ করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ হিসেবে, তারাবীর বিবরণ হিসেবে নয়। কেননা, এই হাদীস যদি তারাবী প্রসঙ্গে হত তাহলে সাহাবায়ে কেরামও তারাবী নামায আট রাকাআত পড়তেন, বিশ রাকাআত নয়।

এই হাদীস থেকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হচ্ছে যে, তারাবী ও তাহাজ্জুদ ভিন্ন দুই নামায। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম আট রাকাআত তাহাজ্জুদের হাদীস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারাবী নামায বিশ রাকাআত পড়তেন। যদি রমযান মাসে তারাবী তাহাজ্জুদ এক বিষয় হত তাহলে তারা এই হাদীসের কারণে তারাবী নামায আট রাকাআতই পড়তেন। কেননা তাঁরা সামান্য বিষয়েও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করতেন না।●

মোটকথা, উপরোক্ত হাদীসের প্রকৃত অর্থ তা-ই যা সাহাবায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন আর তা হল তাহাজ্জুদ। পরবর্তীতে একে তারাবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণীয়।

৩. এ হাদীসে এমন নামাযের কথা রয়েছে যা একা আদায় করা হয়। আর তা হচ্ছে তাহাজ্জুদ। অন্য দিকে তারাবী নামায আদায় করা হয় জামাতের সঙ্গে।

আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই হাদীসে বিতরের নামায তিন রাকাআত হওয়ার কথা আছে। আশ্চর্য মিল এই যে, তারাবীর বিষয়ে তারা যেমন সাহাবায়ে কেরামের সকল নিয়ম গ্রহণ করেও রাকাআত-সংখ্যা হ্রাস করে থাকেন তদ্রূপ তাহাজ্জুদের হাদীস থেকে আট রাকাআত গ্রহণ করলেও একই হাদীসে উল্লেখিত বিতরের রাকাআত-সংখ্যা গ্রহণ করতে অনীহা বোধ করেন।

● টীকা : গায়রে মুকাল্লিদদের দায়িত্বশীল আলিমগণও মনে করেন, তারাবী-তাহাজ্জুদ এক নামায নয়। এ প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি পরিশিষ্টে দেখুন। পৃষ্ঠা ৩৭০

তারা তিন রাকাআত বিতরের স্থলে এক রাকাআত পড়তেই আগ্রহী। কুরআন মজীদে এসেছে–

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে নামায কঠিন আমল, তবে যাদের অন্তরে খুশু রয়েছে তাদের জন্য কঠিন নয়।

উপরের হাদীস থেকে রাকাআত-সংখ্যা আট গ্রহণ করা হলেও সেই আট রাকাআত আদায়ের যে নবী-পদ্ধতি হাদীস শরীফে এসেছে, তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এত দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত। যদি এই হাদীসকেই গ্রহণ করতে হয় তাহলে দীর্ঘ কিয়ামের এই বিষয়টি কেন পরিত্যাগ করা হল। অথচ এটাও তো সুন্নাহরই অংশ?

খুব শান্ত মনে ভাবা দরকার যে, দুনিয়াবী বিষয়ে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের প্রতি আগ্রহী হতে পারলে আখেরাতের বিষয়ে এ আগ্রহ কি আরও বেশি হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা সকলকে চিন্তা ও মানসিকতার বিশুদ্ধতা দান করুন।

দ্বিতীয় বর্ণনা

আট রাকাআত তারাবীর প্রবক্তাদের সর্বশেষ নির্ভর হচ্ছে এমন এক রেওয়ায়েত, যা জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়। হাদীস বিশারদদের মতে রেওয়ায়াতটি জয়ীফ। এখানে তা পর্যালোচনাসহ উল্লেখ করা হল।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ. (ابن خزيمة، ابن حبان)

জাবির (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে আট রাকাআত নামায পড়েছেন।' (ইবনে হিব্বান : ৬/১৬৯)

পর্যালোচনা

এই রেওয়ায়াত এত জয়ীফ যে, শরীয়তের বিধি-বিধান আহরণের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। সনদে (সূত্রে) 'ঈসা ইবনে জারিয়া' নামক একজন রাবী রয়েছে, যার সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) হাদীস বিশারদ ইমামগণের নিম্নোক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, "عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ" তাঁর বর্ণনায় অনেক 'মুনকার' কথা রয়েছে।

সাজী ও উকাইলী তাকে 'জয়ীফ' রাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

ইবনে আদী বলেছেন, أَحَادِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ তার বর্ণনাগুলো 'মাহফুয' নয়। (তাহযীবুত তাহযীব)

অতএব, এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, এ ধরনের 'মুনকার' বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের সুযোগ নেই।

শবে কদর

রমযানের শেষ দশকের কোনো এক বেজোড় রাত হচ্ছে শবে কদর। শবে কদরের ইবাদত এক হাজার রাতের মকবূল ইবাদত থেকেও উত্তম। রমযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ এই পাঁচ রাত জেগে ইবাদতকারী শবে কদর লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (القدر)

'নিশ্চয় আমি এই (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি লায়লাতুল কদরে। আপনি কি জানেন লায়লাতুল কদর কী? লায়লাতুল কদর সহস্র মাস থেকেও উত্তম। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীল) (পৃথিবীতে) অবতীর্ণ হন তাদের পালনকর্তার আদেশে সকল কল্যাণ কাজের জন্য। শান্তিই শান্তি, সেই রজনী সুবহে সাদিক পর্যন্ত।' (সূরা কদর)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত—

خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نَسِيتُهَا أَوْ أُنسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ. (مسلم : فضل ليلة القدر)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং বললেন, 'আমাকে লায়লাতুল কদর দেখানো হয়েছিল, কিন্তু পরে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লায়লাতুল কদর অন্বেষণ কর'।" (সহীহ মুসলিম : ১/৩৭০)

তাহাজ্জুদ নামায

ইশার নামাযের পর কিছু সময় ঘুমিয়ে শেষ রাতে যে নামায পড়া হয়, তা তাহাজ্জুদ নামায। এ নামায আট রাকাআত বা যে পরিমাণ সম্ভব হয় পড়া যায়। কুরআন-সুন্নাহ্‌তে এ নামাযের অনেক ফযীলত ও ছওয়াবের কথা এসেছে।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا. (الفرقان ٦٣)

অর্থ : 'রহমান'-এর বান্দা তারাই যারা ভূমিতে নম্রভাবে চলে এবং যখন মূর্খ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম'। আর তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে। (সূরা ফুরকান : ৬৩)

হযরত আবু উমামা বাহিলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ. (بيهقى : الترغيب فى قيام الليل)

'তোমরা কিয়ামুল লায়ল (তাহাজ্জুদের) বিষয়ে যত্নবান হও। কেননা, তা ছিল তোমাদের পূর্ববর্তী পুণ্যবান মানুষের অভ্যাস। আর তা হচ্ছে তোমাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায়, গুনাহ মোচনকারী এবং মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী।' (বায়হাকী : ২/৫০২)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ : أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا. (بخارى : تفسير سورة الفتح)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এত দীর্ঘ সময় নামাযে দণ্ডায়মান থাকতেন যে, তার কদম মোবারক ফুলে যেত। এ অবস্থা দেখে উম্মুল মুমিনীন বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এত পরিশ্রম আপনি কেন করছেন অথচ আল্লাহ আপনার বিগত-আগত সকল কিছুই ক্ষমা করে দিয়েছেন?' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তবে কি আমি কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না'?" (সহীহ বুখারী : ২/৭১৬)

তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত

দুআ ও তাহাজ্জুদ নামাযের সর্বোত্তম ওয়াক্ত হল রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. (وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ) وَلَا يَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُضِيْئَ الْفَجْرُ. (بخارى : الدعاء والصلاة من اخر الليل)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমাদের পরওয়ারদেগার প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলেন, 'কোনো দুআকারী আছে কি? আমি তার দুআ কবুল করব। কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তার প্রার্থিত বস্তু দান করব। কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব'।" (তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় একথাও আছে যে, এই আহ্বান সুবহে সাদিক পর্যন্ত চলতে থাকে।) (সহীহ বুখারী : ১/১৫৩)

তাহাজ্জুদ নামাযের রাকাআত-সংখ্যা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. (مسلم : صلاة الليل والوتر)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে ও রমযানের বাইরে বারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। চার রাকাআত নামায পড়তেন, যার দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কী বলব! এরপর চার রাকাআত পড়তেন, যার দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! এরপর তিন রাকাআত পড়তেন।'

(সহীহ মুসলিম : ১/২৫৪)

তাহাজ্জুদ নামায চার থেকে বারো রাকাআত পড়া যায়। যার পক্ষে যত রাকাআত সম্ভব পড়বে। শেষরাত্রে উঠতে পারবে-এই আত্মবিশ্বাস যাদের রয়েছে তারা বিতর শেষরাতে পড়বে। অন্যরা ইশার নামাযের পরই বিতর পড়বে।

ইশরাক নামায

সূর্যোদয়ের আনুমানিক বিশ মিনিট পর দুই, চার, ছয়, আট বা বারো রাকাআত নফল নামাযকে সালাতুয যুহা বা ইশরাক নামায বলে। হাদীস শরীফে এ নামাযের অনেক ফযীলত এসেছে।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، (حسن غريب) (ترمذى : ما يستحب من الجلوس)

'যে ফজরের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করে, এরপর সূর্যের আলোয় চারদিক আলোকিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকে, এরপর দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করে সে এক হজ্জ ও এক ওমরার ছওয়াব লাভ করবে।' (জামে তিরমিযী : ১/১৩০)

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. (مسلم : استحباب صلاة الضحى)

'প্রতি সকালে তোমাদের শরীরের প্রতি জোড়ার উপর সদকা ওয়াজিব হয়। সুবহানাল্লাহ বলা সদকা, আলহামদুলিল্লাহ বলা সদকা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সদকা, আল্লাহু আকবার বলা সদকা, সৎ কাজে আদেশ করা সদকা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখাও সদকা। আর দুই রাকাআত ইশরাক নামায (সকল জোড়ার) সদকা আদায়ের পক্ষে যথেষ্ট।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৫০)

عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : كَمْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ : أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ. (مسلم : استحباب صلاة الضحى)

মুয়াযা (রা.) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশরাকের নফল নামায কত রাকাআত আদায় করতেন? উম্মুল মুমিনীন বললেন, চার রাকাআত পড়তেন, (কখনো) বেশিও পড়তেন। (সহীহ মুসলিম : ১/২৪৯)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ. (حسن غريب) (ترمذى : صلاة الضحى)

হযরত আবু যর (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন— আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে আদমসন্তান! দিনের শুরুতে তুমি আমার জন্য চার রাকাআত নামায আদায় কর, দিনের শেষ পর্যন্ত আমি তোমার যিম্মাদার হয়ে যাব।' (জামে তিরমিযী : ১/১০৮)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ : لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ. (موطا مالك : صلاة الضحى)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আট রাকাআত ইশরাক নামায পড়তেন এবং বলতেন, 'যদি আমার পিতার পুনর্জীবনের প্রতিশ্রুতিও আমাকে দেওয়া হয়, তবুও আমি এ নামায পরিত্যাগ করব না।'

(মুয়াত্তা মালেক ২০৭)

ইশরাকের নামায সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত এসেছে। এ রেওয়ায়াতগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তা কোন নামায এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামতও রয়েছে। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ওই আলোচনাগুলো উল্লেখ করার পর লেখেন–

وارجح اقوال آنست كه سنت مستحب ست (مسك الختام ج ١ ص ٥٥٦)

অর্থ : সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত এই যে, ইশরাকের নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (মিসকুল খিতাম)

মাগরিব-ইশার মাঝের নফল

মাগরিব-ইশার মধ্যবর্তী সময়টি অতি মূল্যবান। তাই এ সময় কিছু নফল নামায আদায় করা অতি ছওয়াবের কাজ। কুরআন মজীদে এই মানুষগুলোর প্রশংসা করে বলা হয়েছে—

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ... الاية (السجدة ١٦)

'তাদের পাঁজর বিছানা থেকে আলাদা থাকে।' (সূরা সাজদা : ১৬)

হযরত আনাস (রা.) বলেন—

إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (ابن الجوزى : زاد المسير ج ٦ ص ٢٣٩)

'এই আয়াত ওইসব সাহাবী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা মাগরিব-ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায পড়তেন।' (যাদুল মাসীর)

মুহাম্মাদ ইবনে নসর আল মারওয়াযী (মৃত্যু : ২৯৪ হি.) 'কিয়ামুল লায়ল' গ্রন্থে (পৃ. ৫৬) অনেক সাহাবী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তারা এ সময় নফল নামায পড়তেন।

নফল নামায বসে পড়ার বৈধতা

তাহাজ্জুদ নামায, ইশরাক নামায ও অন্যান্য নফল নামায দাড়িয়ে পড়া উত্তম এবং বসে পড়াও জায়েয। তবে বসে পড়লে অর্ধেক ছওয়াব হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত—

حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ. (مسلم : جواز النافلة قائما وقاعدا)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বসে নামায পড়া হল অর্ধেক নামায।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৫৩)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক আল-উকাইলী বলেন—

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ. فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيْلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيْلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَءَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا قَرَءَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

(مسلم : جواز النافلة قائما و قاعدا)

আমি আয়েশা (রা.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে নামায পড়তেন এবং দীর্ঘ সময় বসে নামায পড়তেন। দাড়িয়ে কিরাআত পড়লে দাড়ানো অবস্থা থেকে রুকূ করতেন। আর বসে কিরাআত পড়লে বসা অবস্থা থেকে রুকূ করতেন।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৫২)

ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা

মুসলমানদের ঈদ দুইটি : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। রমযান শেষে ঈদুল ফিতর আসে আর জিলহজ্জের দশ তারিখে হয় ঈদুল আযহা। ঈদ মুসলমানদের জন্য নিয়ে আসে আনন্দ ও কল্যাণের বার্তা। মুসলিমজাতি অত্যন্ত আনন্দ-উদ্দীপনা এবং ঈমানী অনুভূতি নিয়ে এই দুই ঈদ পালন করে থাকেন।

ঈদের মূল বিষয় হচ্ছে, দুই রাকাআত নামায। এ নামাযের মাধ্যমে বান্দা পালনকর্তার সামনে সাজদাবনত হয় এবং তাঁর দান ও অনুগ্রহ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

আত্মনিবেদনের নতুন অঙ্গীকারে বান্দার হৃদয় হয় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, যার সারকথা হচ্ছে, ইয়া আল্লাহ! আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ কোনো অবস্থাতেই আমরা আপনার স্মরণ থেকে গাফেল হব না, আর ইসলামের শিক্ষা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হব না।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ : مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا : كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. (أبو داود : صلاة العيدين)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় তাশরীফ আনলেন তখন মদীনাবাসীর ছিল দু'টি উৎসবের দিন। তারা এ দিনগুলো কাটাত ক্রীড়া ও কৌতুকের মাধ্যমে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উৎসব সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, 'জাহেলী যুগ থেকেই আমরা এ দিনে আনন্দ-উৎসব করে আসছি।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এ দু'দিনের পরিবর্তে উত্তম দুই দিন দান করেছেন। তা হচ্ছে, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর'।" (সুনানে আবু দাউদ : ১/১৬১)

ঈদের নামাযের পদ্ধতি

ঈদের নামায পড়তে হয় সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর থেকে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। আযান-ইকামত ছাড়া দুই রাকাআত নামায অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সঙ্গে আদায় করতে হয়। ঈদের নামাযের বিস্তারিত বিবরণ এই– প্রথম রাকাআতে ছানার পর তিন তাকবীর দেওয়া হবে। প্রথম দুই তাকবীরে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলে ছেড়ে দিতে হবে এবং তৃতীয় তাকবীরের পর হাত বাঁধতে হবে। ঈদের নামাযে ইমাম জাহরী কিরাআত অর্থাৎ উচ্চস্বরে কুরআন পড়বে। এরপর যথারীতি রুকূ-সাজদার পর দ্বিতীয় রাকাআত আরম্ভ হবে। এ রাকাআতে তিন তাকবীর হবে কিরাআতের পর, রুকূর আগে। এ তাকবীরগুলোতে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলে ছেড়ে দিতে হবে। চতুর্থ তাকবীরের পর রুকূ করা হবে। এরপর যথারীতি নামাযের অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করবে।

এ নামাযের তাকবীরগুলোর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, প্রথম রাকাআতে কিরাআতের আগে সর্বমোট তাকবীর-সংখ্যা চার। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর। তদ্রূপ দ্বিতীয় রাকাআতেও কিরাআতের পরে তাকবীর-সংখ্যা চার। অতিরিক্ত তিন তাকবীর এবং রুকূর তাকবীর।

ঈদের নামাযে চার তাকবীর

رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِهِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : صَدَقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. (سنن أبى داود: التكبير في العيدين)

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বর্ণনা করেন যে, সায়ীদ ইবনুল আ'স হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) ও হযরত হুযায়ফা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামাযে কয় তাকবীর দিতেন? আবু মূসা আশআরী (রা.) বললেন, 'চার তাকবীর দিতেন, যেভাবে জানাযার নামাযে চার তাকবীর দেওয়া হয়।' হুযাইফা (রা.) তাঁর কথা সমর্থন করলেন। আবু মূসা (রা.) আরও বললেন, 'আমি যখন বসরার শাসনকর্তা ছিলাম তখন এভাবেই তাকবীর দিয়েছি।' (সুনানে আবু দাউদ : ১/১৬৩)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন—

اَلتَّكْبِيْرُ فِي الْعِيْدَيْنِ أَرْبَعٌ، كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ. وَفِي رِوَايَةٍ اَلتَّكْبِيْرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعٌ كَالتَّكْبِيْرِ فِي الْعِيْدَيْنِ. (طحاوى : التكبير على الجنائز كم هو؟)

'দুই ঈদের নামাযে চার তাকবীর হবে, জানাযার নামাযের মতো।' অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, 'জানাযার নামাযে চার তাকবীর হবে, দুই ঈদের নামাযের মতো।' (তহাবী : ১/৩২০)

ইজমায়ে উম্মত

ইমাম তহাবী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিল যে, জানাযার নামাযে তাকবীর সংখ্যা কত? চার না পাঁচ না সাত? উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর খিলাফতের সময় সাহাবায়ে কেরামকে একত্র করে বললেন—

إِنَّكُمْ مَعَاشِرُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى تَخْتَلِفُوْنَ عَلَى النَّاسِ يَخْتَلِفُوْنَ مِنْ بَعْدِكُمْ، وَمَتَى تَجْتَمِعُوْنَ عَلَى أَمْرٍ يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ. فَانْظُرُوْا أَمْرًا تَجْتَمِعُوْنَ عَلَيْهِ فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَهُمْ. فَقَالُوْا : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَأَشِرْ عَلَيْنَا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : بَلْ أَشِيْرُوْا أَنْتُمْ عَلَيَّ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. فَتَرَاجَعُوا الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ، فَأَجْمَعُوْا أَمْرَهُمْ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا التَّكْبِيْرَ عَلَى الْجَنَائِزِ مِثْلَ التَّكْبِيْرِ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ، فَأَجْمَعَ أَمْرَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ.

(طحاوى : التكبير على الجنائز كم هو؟)

"আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। কোনো বিষয়ে আপনাদের মতৈক্য বা মতানৈক্য পরবর্তীদের মধ্যেও মতৈক্য বা মতানৈক্য সৃষ্টি করবে।" তাঁর এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম বললেন, "আমীরুল মুমিনীন! আপনি ঠিক বলেছেন। আলোচিত বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বলুন।" উমর (রা.) বললেন, "বরং আপনারা আপনাদের মতামত বলুন। কেননা, আমিও আপনাদের মতোই একজন মানুষ।" এরপর সাহাবায়ে কেরাম

পরস্পর মতবিনিময় করলেন এবং এ বিষয়ে একমত হলেন যে, যেভাবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় চার তাকবীর হয়ে থাকে, জানাযার নামাযেও চার তাকবীর হবে। (তহাবী : ১/৩১৯)

এ বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঈদের নামাযে চার তাকবীর হওয়া ছিল একটি স্বীকৃত বিষয়, যার সঙ্গে জানাযার নামাযের তাকবীর-সংখ্যাকে তুলনা করা হয়েছে।

তাকবীর কখন হবে

ঈদের নামাযের তাকবীরগুলো অন্যভাবেও হিসাব করা যায়। প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়ে সূরা ফাতিহার আগে অতিরিক্ত তিন তাকবীর। রুকূর তাকবীরসহ এ রাকাআতে তাকবীর-সংখ্যা হবে পাঁচ। দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা-কিরাআত সমাপ্ত করে রুকূতে যাওয়ার আগে অতিরিক্ত তিন তাকবীর। রুকূর তাকবীরসহ একসঙ্গে চার তাকবীর। নিম্নোক্ত হাদীসে তাকবীরের কথা এভাবেই এসেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন—

تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ، فِي الرَّكْعَةِ الأُولى خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَءُ بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا. (ترمذى : التكبير في العيدين)

'ঈদের নামাযে তাকবীর-সংখ্যা হল নয়। প্রথম রাকাআতে পাঁচ তাকবীর, (অতিরিক্ত তাকবীরগুলো হবে) কিরাআতের আগে। আর দ্বিতীয় রাকাআতে রুকূর তাকবীর সহ চার তাকবীর, কিরাআতের পরে। (জামে তিরমিযী : ১/৭০)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবী থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

দুই ঈদের খুতবা

নামাযের পর দুই খুতবা পড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। এ খুতবায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ-নসীহত করতেন এবং দুই খুতবার মধ্যে কিছু সময় বসতেন।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত—

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

(بخارى : الخروج إلي المصلى)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম এই ছিল যে, তিনি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় ঈদগাহে আসতেন এবং প্রথমে ঈদের নামায আদায় করতেন। এরপর মুসল্লীদের দিকে মুখ করে দাড়াতেন। সবাই কাতারবদ্ধভাবে নিজ নিজ স্থানে থাকত। তিনি ওয়াজ-নসীহত করতেন, বিধান জারি করতেন, কোথাও বাহিনী প্রেরণ করতে হলে তা প্রেরণ করতেন এবং কোনো আদেশ জারি করতে হলে তা জারি করতেন। এরপর ঈদগাহ থেকে ফিরতেন।'

(সহীহ বুখারী : ১/১৩১)

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেন—

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ. (إسناده صحيح من طريق بشر. ابن خزيمة : عدد الخطب في العيدين)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে দুই খুতবা দিতেন এবং দুই খুতবার মধ্যে বসতেন।' (ইবনে খুযাইমা : ১/৭০০)

মুসাফিরের নামায

কেউ যদি নিজ এলাকা থেকে আটচল্লিশ মাইল দূরে যাওয়ার এবং সেখানে পৌছে পনেরো দিনের কম থাকার নিয়ত করে তাহলে সে কসর পড়বে। নিজ এলাকা থেকে বের হওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত। কসর অর্থ হচ্ছে চার রাকাআত-বিশিষ্ট নামায দুই রাকাআত পড়া। যথা জোহর, আসর ও ইশা। দুই বা তিন রাকাআত-বিশিষ্ট নামাযে কসর নেই। যেমন ফজর ও মাগরিবের নামায এবং বিতর নামায।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا.

(النساء : ١٠١)

'যখন তোমরা ভূমিতে সফর কর তখন নামায সংক্ষিপ্ত করতে গুনাহ নেই। যদি আশঙ্কা হয় যে, কাফেররা তোমাদেরকে কষ্ট দিবে। নিশ্চয়ই কাফের তোমাদের স্পষ্ট দুশমন।' (সূরা নিসা : ১০১)

ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া বলেন—

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. (مسلم : صلاة المسافرين)

"আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলাম, (কুরআনে এসেছে–) যদি কাফেরদের সম্পর্কে তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তারা তোমাদেরকে কষ্ট দিবে, তাহলে নামায সংক্ষিপ্ত করতে পার। এখন তো এই আশঙ্কা নেই (অর্থাৎ এখনও কি এই বিধান বিদ্যমান রয়েছে?) উমর (রা.) বললেন, এ প্রশ্ন আমারও

ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, 'এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ। অতএব তোমরা তাঁর দান গ্রহণ কর'।" (সহীহ মুসলিম : ১/২৪১)

সফরের দূরত্ব

কী পরিমাণ দূরত্বে সফর করলে কসর করা যায়– এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এ বিষয়ক অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়, আটচল্লিশ মাইল বা তার বেশি দূরত্বে সফরের নিয়ত করলে কসর করা যাবে, অন্যথায় করা যাবে না। ওই রেওয়ায়াতগুলোতে এ প্রসঙ্গে 'আরবাআতু বুরুদ' (চার 'বারীদ') শব্দ এসেছে। আর ১২ মাইলে ১ বারীদ হয়ে থাকে। (মুখতারুস সিহাহ)

জেনে রাখা ভালো যে, কিলোমিটারের হিসাবে ৪৮ মাইল প্রায় সাড়ে ৭৭ কিলোমিটারের সমান।

ইমাম মালিক (রহ.) থেকে বর্ণিত—

بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِيْ مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفِيْ مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ، وَفِيْ مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ. قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ فِيْهِ الصَّلَاةُ. قَالَ مَالِكٌ : لَايَقْصُرُ الَّذِيْ يُرِيْدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوْتِ الْقَرْيَةِ، وَلَا يُتِمُّ حَتّٰى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوْتِ الْقَرْيَةِ. (موطا مالك : ما يجب فيه قصر الصلاة)

'আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সম্পর্কে জেনেছি যে, তিনি মক্কা ও তায়েফ, মক্কা ও আসফান এবং মক্কা ও জিদ্দার সফরে নামায কসর করতেন।' ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, এ দূরত্ব হচ্ছে চার 'বারীদ'। আমার মতে এটাই হল কসরের দূরত্ব।' তিনি আরও বলেন, 'নিজ এলাকার বসতি থেকে বের হওয়ার পর কসর আরম্ভ করবে এবং পুনরায় বসতিতে পৌছার পর পূর্ণ নামায পড়বে।' (মুয়াত্তা মালিক : পৃ. ৫২)

উল্লেখ্য, মক্কা ও জিদ্দার মধ্যবর্তী দূরত্ব হল ৭২ কিলোমিটার। মক্কা ও তায়েফের দূরত্ব ৮৮ কিলোমিটার এবং মক্কা ও আসফানের দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার।

সহীহ বুখারীতে এসেছে—

كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا. (بخارى : في كم يقصر الصلاة)

'আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) চার 'বারীদ' দূরত্বের সফরে নামায কসর পড়তেন এবং রোযা না রাখার অবকাশ গ্রহণ করতেন। চার 'বারীদ' হল ষোল 'ফরসখ'। (সহীহ বুখারী : ১/১৪৭)

তিন মাইলে এক ফরসখ হয়। তাহলে ১৬ ফরসখ = ৪৮ মাইল।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ أَتُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلٰى عَرَفَةَ، قَالَ : لَا، وَلٰكِنْ إِلٰى عُسْفَانَ، وَإِلٰى جُدَّةَ، وَإِلٰى الطَّائِفِ. صَحَّحَهُ ابْنُ حَجَرٍ

(التلخيص الحبير ج ٢ ص ٤٦ صلاة المسافرين)

'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, আরাফার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করলে কি পথিমধ্যে নামায কসর করা যাবে? তিনি উত্তরে বললেন, 'না। তবে আসফান, জিদ্দা ইত্যাদি স্থানের উদ্দেশে সফর করলে নামায কসর করা যাবে।' (আত-তালখীসুল হাবীর : ২/৪৬)

মুহাদ্দিসীন ও সালাফে সালেহীনের মতামত

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ মুফতী মাওলানা আবু সায়ীদ শরফুদ্দীন কসরের দূরত্ব বিষয়ক বিভিন্ন বর্ণনা আলোচনার পর 'ফাতাওয়া ছানাইয়্যা'তে লেখেন,

'সারকথা এই যে, কসরের দূরত্ব আটচল্লিশ মাইল হওয়াই শুদ্ধ, নয় মাইল হওয়া ভুল। ইমাম নববী বলেন—

قَالَ الْجُمْهُوْرُ : لَا يَجُوْزُ الْقَصْرُ إِلَّا فِي سَفَرٍ يَبْلُغُ مَرْحَلَتَيْنِ.

অর্থাৎ মুহাদ্দিসীন ও সালাফে সালেহীনের মত এই যে, আটচল্লিশ মাইল দূরত্বের সফরে কসর করা যাবে, তার কমে নয়'।" (ফাতাওয়া ছানাইয়্যাহ : ১/৪৬২)

উপরের বর্ণনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, আটচল্লিশ মাইল বা ততোধিক দূরত্বের সফরে নামায কসর করা যাবে, তার কম দূরত্বে করা যাবে না।

আরও প্রমাণিত হয় যে, নিজ এলাকার বসতি অতিক্রম করার পর থেকে কসরের অবকাশ আরম্ভ হয়। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার উদ্দেশে সফরের ইরাদা করেছেন তখন মদীনার বাইরে যুলহুলায়ফা নামক স্থানে এসে কসর পড়েছেন।

কসরের সময়সীমা

সফরে কোনো স্থানে পনেরো দিন বা তার বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করলে পূর্ণ নামায পড়বে। আর যদি পনেরো দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করে তাহলে কসর করবে। যদি এমন হয় যে, সুনির্দিষ্টভাবে কত দিন অবস্থান করবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হল না, আর আজ যাব, কাল যাব করতে করতে পনেরো দিনের বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেল তবুও কসরই করতে থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়সীমা বর্ণিত হয়েছে। তবে সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু এগুলোর প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও অবগত ছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপদ্ধতি, বিশেষত তাঁর পবিত্র জীবনের শেষ আমল ছিল সাহাবীদের সামনে তাই তারা যখন এ সময়সীমা পনেরো দিন নির্ধারণ করেন তখন তা সুন্নাহ থেকে আহরিত হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

আল-মুগনী গ্রন্থে এসেছে—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا قَدِمْتَ وَفِيْ نَفْسِكَ أَنْ تُقِيْمَ بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَكْمِلِ الصَّلَاةَ. (المغني ج ٢ ص ٢٨٨ صلاة المسافر)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'যদি তুমি কোনো স্থানে পনেরো দিন অবস্থানের নিয়ত কর তাহলে পূর্ণ নামায আদায় করবে।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ : مَنْ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ. (ترمذى : في كم تقصر الصلاة)

'যে পনেরো দিন অবস্থানের নিয়ত করল সে পূর্ণ নামায আদায় করবে।'
(জামে তিরমিযী : ১/৭১)

জমা বাইনাস সালাতাইন

এ শব্দের অর্থ হল, দুই নামায একত্রে আদায় করা। যেমন, জোহর ও আসর, কিংবা মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করা। এটা দু'ভাবে হতে পারে। এক. 'জমউত তাকদীম' ও 'জমউত তাখীর'। 'জমউত তাকদীম' অর্থ হল–

দ্বিতীয় নামাযকে এগিয়ে এনে প্রথম নামাযের সময়ে আদায় করা। যেমন জোহর ও আসরের নামায জোহরের সময় একত্রে আদায় করা হল। আর 'জমউত তাখীর' অর্থ হল– প্রথম নামাযকে বিলম্বিত করে দ্বিতীয় নামাযের সময় আদায় করা। যথা মাগরিব ও ইশার নামায ইশার সময় একত্রে আদায় করা।

দ্বিতীয় পদ্ধতিকে বলা হয় 'জময়ে জাহিরী'। এর অর্থ হচ্ছে প্রথম নামায তার ওয়াক্তের শেষ অংশে আর দ্বিতীয় নামায পরের ওয়াক্তের প্রথম অংশে আদায় করা। এভাবে বাহ্যত দুই নামায একত্রে পড়া হলেও কোনো নামাযকেই তার ওয়াক্ত থেকে সরানো হয়নি। যথা : জোহরের নামাযের সময় যদি বেলা ১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত হয় এবং আসরের সময় ৪টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাহলে 'জময়ে জাহিরী' এভাবে হতে পারে যে, জোহরের নামায পৌনে ৪টায় আদায় করা হল আর আসর ৪ টায়।

দুই নামায একত্র করার বিধান

আল্লাহ তাআলা প্রতি নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই নির্ধারিত ওয়াক্তেই নামায আদায় করতে হবে। ওয়াক্ত আসার আগেও যেমন নামায হয় না তেমনি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর আদায় করলে তা কাযা গণ্য হয়। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ চলা অবস্থায় 'সালাতুল খাওফ' (ভীতির অবস্থার নামায) পড়ার আদেশ করা হয়েছে, দুই নামায একত্রে পড়ার আদেশ দেওয়া হয়নি। যদি যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে তা কাযা বলে গণ্য হয়। তখনও একে 'জমউত তাখীর' বলা হয় না। খন্দক যুদ্ধে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের কিছু নামায বিলম্বিত হয়ে গেল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব আফসোস করেছেন। যদি ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর অন্য নামাযের সঙ্গে আদায় করে 'জমউত তাখীরে'র অন্তর্ভুক্ত করা যেত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত আফসোস করতেন না।

কুরআন মজীদে এসেছে—

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء : ١٠٣)

'নিশ্চয়ই নামায মুমিনদের জন্য সময়-নির্ধারিত ফরয।' (সূরা নিসা : ১০৩)

হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত—

... ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. (مسلم : قضاء الفائتة)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার কারণে নামায ছুটে গেলে গুনাহ নেই। গুনাহ এই যে, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বিলম্বিত করল, আর পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত এসে গেল।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৩৯)

উল্লেখ্য, দু'নামায একত্র করার বিষয়ে যে রেওয়ায়াতগুলো রয়েছে সেগুলোর অর্থ হচ্ছে 'জমেয়ে জাহিরী' (বাহ্যত একত্রকরণ)। ইতোপূর্বে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ বিষয়ের সকল রেওয়ায়েত সামনে রেখে চিন্তা করলে এ অর্থই প্রতিভাত হয়। শুধু হজ্জের সময় আরাফায় 'জমউত তাকদীম' অর্থাৎ জোহর ও আসরের নামায একত্রে জোহরের সময় আদায় করা, আর মুযদালিফায় 'জমউত তাখীর' অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার নামায ইশার সময় আদায় করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাওয়া যায়। তাই এ দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে নামাযের ওয়াক্ত পরিবর্তন করা কারও জন্য বৈধ নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، إِلَّا بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ. (نسائى الجمع بين الظهر والعصر بعرفة)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাসময়ে নামায আদায় করতেন। শুধু আরাফা ও মুযদালিফায় এর ব্যতিক্রম হত।' (নাসায়ী : ২/৩৬)

হযরত উমর (রা.) তার এক প্রশাসককে লিখেছিলেন—

ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ، الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا فِي عُذْرٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَالنُّهْبَى. (بيهقى : ذكر الأثر الذي روي في أن الجمع من غير عذر من الكبائر)

'তিনটি বিষয় কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত : এক. বিনা ওজরে দুই নামায একত্র করা। দুই. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা। তিন. অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করা।' (বায়হাকী : ৩/১৬৯)

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেন—

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا، إِلَّا صَلَاتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا.

(بخاری : كتاب الحج، متى يصلي الفجر يجمع)

'আমি কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিনি যে, তিনি নামাযকে নির্ধারিত সময় থেকে সরিয়ে আদায় করেছেন, তবে দুই নামায এর ব্যতিক্রম। (হজ্জের মধ্যে) মাগরিব-ইশা একত্রে পড়েছেন, আর ফজর নামায অন্য দিনের তুলনায় আগে পড়েছেন।' (সহীহ বুখারী : ১/২২৮)

আল-জামউয্ যাহিরী

'জাময়ে যাহিরী' অর্থাৎ নামাযকে তার নির্ধারিত ওয়াক্ত থেকে না সরিয়ে দুই নামায একত্রে পড়ার যে পদ্ধতি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সফরের হালতে কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে তা অনুসরণ করার অনুমতি রয়েছে। কেননা, এ পদ্ধতিতে নামাযের মূল ওয়াক্তে পরিবর্তন করা হয় না। আরাফা ও মুযদালিফা ছাড়া দুই নামায একত্রে আদায় করার যেসব বর্ণনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে সেখানে উপরোক্ত পদ্ধতির কথাই বলা হয়েছে।

এর একটি স্পষ্ট আলামত এই যে, এ ধরনের বর্ণনাগুলোতে শুধু জোহর-আসর এবং মাগরিব-ইশা একত্র করার কথা এসেছে, অন্য দুই নামায একত্র করার কথা নেই। আর নির্ধারিত সময় থেকে না সরিয়ে দুই নামায পাশাপাশি আদায় করা কেবল এই নামাযগুলোতেই সম্ভব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ফজর-জোহর একত্র করেছেন–এমন কথা কোনো বর্ণনায় নেই। কেননা, এক নামাযকে তার নির্ধারিত ওয়াক্ত থেকে সরানো ছাড়া এই দুই নামায পাশাপাশি আদায় করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) বলেন—

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ. (مسلم : جواز الجمع بين الصلاتين في السفر)

'কোনো সফরে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাড়া থাকত তাহলে তিনি জোহরকে আসরের ওয়াক্তের সূচনা পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন, আর

দুই নামায একত্রে পড়তেন এবং মাগরিবকে লালিমা ডোবা পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন, আর মাগরিব-ইশা একত্রে আদায় করতেন।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৪৫)

যেহেতু এই একত্রকরণের অর্থ হল এক নামাযকে শেষ-ওয়াক্তে এবং অপর নামাযকে সূচনা-ওয়াক্তে পড়া, এজন্য ভয়-ভীতি, সফর ইত্যাদি ওজর ছাড়াও তিনি দুই নামাযকে একত্র করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, প্রয়োজনের মুহূর্তে উম্মতের সামনে সহজ পথের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান থাকা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. (مسلم : الجمع بين الصلاتين فى الحضر)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় জোহর ও আসর একত্রে আদায় করেছেন, ভয়-ভীতি কিংবা সফরের অবস্থা ছাড়াই।' আবু যুবায়ের বলেন, 'আমি সায়ীদ (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন দুই নামায একত্র করেছিলেন? সায়ীদ (রহ.) বললেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)কে এ প্রশ্ন করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল যাতে তাঁর উম্মতের কেউ কষ্টে পড়ে না যায়'।" (সহীহ মুসলিম : ১/২৪৬)

টীকা : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উপরোক্ত রেওয়ায়েত সম্পর্কে ফাতাওয়া নাযীরিয়্যাহতে লেখা হয়েছে–

"উপরোক্ত হাদীসে দুই নামায একত্র করার অর্থ হচ্ছে জোহরের নামায জোহরের ওয়াক্তের শেষ দিকে এবং আসরের নামায আসরের ওয়াক্তের প্রথম দিকে আদায় করেছেন। এভাবে দুই নামায পর পর আদায় করা হয়েছে। মাগরিব ও ইশার নামায একত্র করার অর্থও তাই। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। ইমামুল হারামাইন একে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে ইবনুল মাজিশুন ও তহাবী এ ব্যাখ্যাই দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। ইবনে সাইয়েদুন নাস এ ব্যাখ্যাকে শক্তিশালী বলেছেন। কেননা, এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবুশ শা'ছা বলেন, হাদীসের অর্থ এটাই।

আল্লামা শাওকানী "নায়লুল আওতার" গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'এ হাদীসে এ অর্থই সুনিশ্চিত'।" (মুহা. নাযির হুসাইন দেহলভী, ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ খণ্ড ১, পৃ. ৪৬৫)

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের নামায

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, নভোমণ্ডলের সকল কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা আজ যেভাবে চন্দ্র-সূর্যকে সাময়িকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন তেমনি যখন ইচ্ছা চিরদিনের জন্যও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিতে পারেন এবং যেমনিভাবে এই গ্রহণগ্রস্ত করা বা গ্রহণমুক্ত করার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া কারও হাত নেই তদ্রূপ এই গোটা জগতও একমাত্র তিনিই পরিচালনা করছেন। এজন্য একমাত্র তাঁকেই ডাকতে হবে, তাঁকেই ভয় করতে হবে এবং তাঁরই অনুগত থাকতে হবে।

আল্লাহমুখিতা শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে বিভিন্ন কুসংস্কার ও অলীক ধারণা পরিহার করার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এই চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ কারও জন্ম-মৃত্যু কিংবা কোনো আনন্দ-বেদনাকে উপলক্ষ করে সংঘটিত হয় না, তা সংঘটিত হয় আল্লাহ তাআলার সৃশৃঙ্খল ব্যবস্থার অধীনে।

সৃষ্টি-জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণু যেমন তাঁর আদেশে নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে তেমনি তিনি ইচ্ছা করলে এই নিয়মের মধ্যে পরিবর্তনও ঘটাতে পারেন। যেমন কারও দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেল, কারও গর্ভপাত ঘটল, কেউ কোনো দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হল ইত্যাদি। তদ্রূপ যাকে ইচ্ছা এই পরিবর্তন থেকে মুক্তও রাখতে পারেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সময় করণীয় হচ্ছে, এ সময় আল্লাহ-অভিমুখী হওয়া। দুই রাকাআত নামায পড়া এবং চন্দ্র-সূর্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা।

হযরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلٰكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا، فَصَلُّوا.

(مسلم : النداء لصلاة الكسوف)

'কারও মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগে না; বরং এ দু'টি হচ্ছে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। যখন তোমরা এই অবস্থা দেখবে তখন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং নামায পড়বে।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৯৯)

হযরত কবীসা (রা.) বলেন—

كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ إِذْ ذَاكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ، فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوبَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَهُمَا. (نسائى : صلاة الكسوف)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় চাদর টেনে টেনে দ্রুত বের হলেন এবং দুই রাকাআত দীর্ঘ নামায আদায় করলেন।'

(সুনানে নাসায়ী : ১/১৬৭)

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা.) বলেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا. (نسائى : صلوة الكسوف)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন চন্দ্র বা সূর্যে গ্রহণ লাগে তখন তোমরা কিছুক্ষণ আগের নামাযের মতো (ফজরের নামায) দুই রাকাআত নামায আদায় করবে'।" (সুনানে নাসায়ী : ১/১৬৭)

সালাতুল ইস্তিস্‌কা

'ইস্তিস্‌কা' আরবী শব্দ। এর অর্থ হল আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা।

বৃষ্টি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিয়ামত। যখন লোকেরা গুনাহ করতে থাকে তখন কখনো এর শাস্তি স্বরূপ খরা ও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। ফলে সে অঞ্চলের চাষাবাদ, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ শাস্তি এজন্য আসে, যাতে মানুষ নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়ে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গিকার করে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তাহলে আল্লাহ অবশ্যই রহমতের বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। ইস্তিস্‌কার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতি এখানে উল্লেখ করা হল।

ইস্তিস্‌কার প্রথম পদ্ধতি

জামাতের সঙ্গে দুই রাকাআত নামায আদায় করা। জামাতের মধ্যে সর্বাধিক নেককার মানুষের ইমামতিতে এ নামায আদায় করা হবে। নামায শেষে সকলে মিলে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দুআ করবে এবং অবস্থা পরিবর্তনের আশা প্রকাশ করে পরিহিত চাদরের পার্শ্ব পরিবর্তন করবে। অর্থাৎ চাদরের ডান দিক বাম কাঁধে আর বাম দিক ডান কাঁধে রাখবে। যেন এই আশা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা তার রহমতপূর্ণ মেঘমালাকেও আমাদের অঞ্চল অভিমুখী করে দিবেন।

হযরত আব্বাদ ইবনে তামিম তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন—

قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (مسلم : صلاة الإستسقاء)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ময়দানে আসলেন (এটি মসজিদ থেকে এক হাজার ফুট দূরে অবস্থিত একটি খোলা ময়দান) এবং বৃষ্টির জন্য দুআ করলেন। তিনি কিবলামুখী হলেন, পরিহিত চাদরের পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন এবং দুই রাকাআত নামায আদায় করলেন।' (সহীহ মুসলিম : ১/২৯৩)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

خَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، وَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا، وَدَعَا اللّٰهَ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَائَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ. (ابن ماجه : ما جاء في صلاة الإستسقاء)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিস্‌কার নামাযের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং আযান-ইকামত ছাড়া জামাতের সঙ্গে দুই রাকাআত নামায পড়ালেন। এরপর আমাদেরকে উপদেশ দিলেন। উপদেশের সঙ্গে ছিল দুআ।

'এরপর কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দুআ করলেন। দুআ শেষে পরিহিত চাদরের পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন। চাদরের ডান দিক বাম কাঁধে এবং বাম দিক ডান কাঁধে রাখলেন।' (সুনানে ইবনে মাজা : পৃ. ৯১)

ইস্তিস্‌কার দ্বিতীয় পদ্ধতি

জুমআর খুতবার মাঝেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দুআ করেছেন।

এক হাদীসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। এক বেদুঈন এসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই বৃষ্টির জন্য দুআ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয় এবং অবিরাম এক সপ্তাহ বৃষ্টি হতে থাকে। পরবর্তী জুমআয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর কাছে দুআ চাওয়া হয় বৃষ্টি বন্ধের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেন– ইয়া আল্লাহ! আমাদের চারপার্শ্বে বৃষ্টি দিন, আর আমাদের উপর থেকে বৃষ্টি সরিয়ে দিন। টিলা-পাহাড়, নদী-নালা এবং বৃক্ষের গোড়ায় বৃষ্টি দিন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, জুমআর পর আমরা চলতে থাকি রৌদ্রালোকিত পথে। (সহীহ বুখারী)

সালাতুল হাজাহ

মানুষ তার জীবনযাত্রায় এমন অনেক প্রয়োজন ও সমস্যার মুখোমুখি হয়, যে প্রয়োজনগুলো পূরণ করা কিংবা যে সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি লাভ করা সীমাবদ্ধ শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা সম্ভব নয়। মানুষকে তখন এমন এক স্বত্তার শরণাপন্ন হতে হয় যার কাছে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয় এবং যার শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। বলাবাহুল্য, সেই একমাত্র স্বত্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ ছাড়া আর সবাইকেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যে নিজেই সমস্যাগ্রস্ত সে অন্যকে সমস্যা থেকে মুক্তি দিবে কীভাবে? এজন্যই যে ভ্রান্ত বিশ্বাসী আল্লাহর শরণ নেওয়ার পরিবর্তে মাখলুকের দরবারে মাথা কুটে বেড়ায় সে শুধু নিজের স্বত্তাকেই অপমান করে না, বরবাদ করে তার আখিরাতকেও। আর দুনিয়াতে তার ভাগ্যে ততটুকুই জোটে যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন। তাই মনে রাখতে হবে যে, দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ। কবি বলেন—

وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے

ہزار سجدون سے دیتا ہے آدمی کو نجات

ওই একটি সাজদা, যা তোমার কাছে কষ্টকর মনে হয়েছে, তা-ই মানুষকে মুক্ত করে হাজার 'সাজদা' থেকে।

ঈমানদারগণ একমাত্র আল্লাহকেই তাদের প্রয়োজন পূরণকারী ও সমস্যার সমাধানকারী বলে বিশ্বাস করেন। তারা যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন তখন আল্লাহরই সাহায্য কামনা করেন। এই সাহায্য কামনার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, খুশু খুযুর সঙ্গে দুই রাকাআত নামায আদায় করা এবং আশা ও বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর কাছে দুআ করা। ইনশাআল্লাহ তার আশা আল্লাহ পূরণ করবেন।

হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا، أَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا سَأَلَ، مُعَجِّلًا أَوْ مُؤَخِّرًا. (مسند احمد)

'যে উত্তমরূপে অযু করে, এরপর পূর্ণাঙ্গরূপে দুই রাকাআত নামায পড়ে, আল্লাহ তার প্রার্থিত বিষয় দান করবেন, শীঘ্রই অথবা কিছুকাল পর (যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন)।' (মুসনাদে আহমদ : ৬/৪৪৩)

সালাতুত তাসবীহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা.)কে লক্ষ করে বললেন, 'চাচা! আমি কি আপনাকে একটি উপহার দিব না? আপনাকে এমন দশটি কথা বাতলে দিব না, যা পালন করলে আল্লাহ আপনার ছোট-বড়, নতুন-পুরাতন, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন?

'সেই দশটি কথা এই যে, আপনি চার রাকাআত নামায পড়বেন। প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বেন। প্রথম রাকাআতে কিরাআতের পর পনেরো বার পড়বেন– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ এরপর রুকূতে দশ বার, রুকু থেকে উঠে দশ বার, সাজদায় দশ বার, জলসায় দশ বার, দ্বিতীয় সাজদায় দশ বার এবং দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে দশ বার পড়বেন। এরপর দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দাড়াবেন। প্রতি রাকাআতে (উপরোক্ত তাসবীহ) সর্বমোট পঁচাত্তর বার পড়া হবে। এভাবে চার রাকাআত পূর্ণ করবেন।

'এই চার রাকাআত নামায যদি প্রতিদিন পড়তে পারেন তাহলে খুব ভালো। সম্ভব না হলে প্রতি জুমু'আয় একবার পড়ুন। তা-ও সম্ভব না হলে প্রতি মাসে একবার, তা-ও সম্ভব না হলে বছরে একবার, তাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার হলেও পড়ুন।' (সুনানে আবু দাউদ, সালাতুত তাসবীহ; জুয্‌উল কিরাআ লিল বুখারী)

সালাতুল ইস্তিখারা

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে দুই রাকাআত নফল নামায পড়ে ইস্তিখারার দুআ করবে। ইনশাআল্লাহ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়ে যাবে। এই নামায যেকোনো সময় পড়া যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে এ নামায শিক্ষা দিয়েছেন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে।

কোনো কোনো বুযুর্গের অভিজ্ঞতা এই যে, রাত্রে ঘুমানোর আগে সাত রাত এ আমল করা হলে সে কাজের বিষয়ে হয় স্বপ্নে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিংবা কোনো একদিকে মনের ঝোঁক হয়ে যায়। সে অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হলে ইনশাআল্লাহ তাতে মঙ্গল হবে।

হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনভাবে ইস্তিখারা শেখাতেন যেভাবে শেখাতেন কুরআনের কোনো সূরা। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা করে তখন যেন দুই রাকাআত নামায পড়ে এবং এই দুআ করে—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. أَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، (أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي، وَآجِلِهِ) فَاقْدِرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، (أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. (بخارى : ما جاء في التطوع مثنى ١/١٥٥)

অর্থ : ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণকর বিষয় লাভ করতে চাই। আর সে বিষয়ে সমর্থ হতে চাই আপনার শক্তিতে। আমি প্রত্যাশা করি আপনার মহা অনুগ্রহের কিছু অংশ। কেননা, আপনি শক্তিমান, আমি অক্ষম। আপনি জ্ঞানী, আমি অজ্ঞান। সকল গায়েবের জ্ঞান রয়েছে আপনারই কাছে।

ইয়া আল্লাহ! যদি এ কাজ আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর হয় তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করুন, আর তা সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সহজ করুন। অতঃপর তা আমার জন্য বরকতময় করুন।

আর যদি এ কাজ আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য এবং পরিণামের দিক থেকে ক্ষতিকর হয় তবে তার ও আমার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করুন। আর যাতে রয়েছে কল্যাণ তারই তাওফীক আমাকে দান করুন, অতঃপর আমার হৃদয়ে প্রশান্তি দান করুন।'

দুআতে "هٰذَا الْأَمْرَ" শব্দ বলার সময় সে কাজের কথা উল্লেখ করবে কিংবা মনে মনে তার দিকে ইঙ্গিত করবে।

সালাতুত তাওবা

আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ দুই প্রবণতাই সুপ্ত রেখেছেন। অতঃপর মানুষের জন্য ভালো ও মন্দ দুই পথ চিহ্নিত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ তার কর্মের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে— কে আল্লাহর সন্তুষ্টিকামী, আর কে প্রবৃত্তির অনুসারী।

নবীগণ ছাড়া অন্য সকল মানুষেরই কিছু না কিছু গুনাহ হয়ে যায়। তবে মুমিন এ কারণে হতাশ হয় না; বরং আপন কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এবং গুনাহ্র সিয়াহী থেকে পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করে।

তাওবা অর্থ হল কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং আগামীতে না করার সংকল্প করা।

কুরআন মজীদে এসেছে—

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. (الزمر : ٥٣)

আপনি আমার ওই বান্দাদের বলে দিন, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল গোনাহ্ ক্ষমা করবেন। নিঃসন্দেহে তিনিই হলেন পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (সূরা যুমার : ৫৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى. (طه : ٨٢)

'আমি অতি ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে সৎকর্ম করে এবং সৎপথে অবিচলিত থাকে।' (সূরা তহা : ৮২)

ইসলামে তাওবার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। তাওবার জন্য কোনো মাধ্যম গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। খৃষ্টধর্মে যেমন রয়েছে– পাদ্রীর সম্মুখে পাপ স্বীকার করে ক্ষমাপত্রে দস্তখত করার আগ পর্যন্ত পাপের কালিমা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না– এমন কোনো ধারণা ও নিয়ম ইসলামে নেই।

তাওবার উদ্দেশ্যে যদি দু' রাকাআত নামায পড়া যায় তবে অতি উত্তম।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَءَ هَذِهِ الآيَةَ - وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

(أبو داود : باب الاستغفار)

'যার কোনো গুনাহ্ হয়ে যায়, এরপর সে উত্তমরূপে অযু করে দু' রাকাআত নামায পড়ে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করেন—

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

'আর যারা কোনো মন্দ কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের উপর জুলুম করে বসলে আল্লাহকে স্মরণ করে কৃতপাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে গুনাহসমূহ ক্ষমা করে। আর তারা তাদের কৃতকর্মের উপর জেনে শুনে অবিচল থাকে না।

হাদীসটি সুনানে আবু দাউদে (১ : ২১২) বর্ণিত হয়েছে।'

সালাতুল জানাযা

পৃথিবীতে সকলের আয়ু সুনির্ধারিত। এ নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে সবাইকেই চলে যেতে হবে। তবুও প্রিয়জনের মৃত্যু মানুষকে ভারাক্রান্ত করে এবং তার কল্যাণের জন্য কিছু করার প্রেরণা জাগ্রত করে। এই বেদনার মুহূর্তেও ভুলে গেলে চলবে না যে, শুধু শরীয়তসম্মত পন্থাতেই মৃতের জন্য কল্যাণকর কিছু করা যেতে পারে। এর বাইরে বিভিন্ন বিদআতী কাজকর্ম কিংবা দেশীয় ও সামাজিক রীতি-রেওয়াজের অনুগামী হয়ে শরীয়তের নির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হলে সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হবে এবং ছওয়াবের পরিবর্তে গুনাহর বোঝা বহন করতে হবে।

যখন অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, মৃত্যুর সময় সন্নিকটে তখন পরিবারের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হল, প্রিয়জনের কাছে বসে আস্তে আস্তে কালেমা পড়া, যাতে তারও কালেমা পড়ার কথা স্মরণ হয় এবং স্বেচ্ছায় কালেমা পড়ে। এ কষ্টের সময়ে তাকে কালেমা পড়ার আদেশ করবে না। কেননা, এ সময় একদিকে শয়তান মানুষকে গোমরাহ করার পূর্ণ চেষ্টা করে অন্যদিকে মুমূর্ষু ব্যক্তির শারীরিক কষ্টও হতে থাকে। তাই জ্ঞান-বুদ্ধি সুস্থির না থাকার কারণে কিংবা কষ্টের কারণে এ আদেশ তার মনে বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে। এজন্যই এই নির্দেশনা।

কালেমার তালকীন করার কথা হাদীস শরীফে এসেছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

(مسلم : تلقين الموتى)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে কালেমার তালকীন কর।' (সহীহ মুসলিম : ১/৩০০)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهٖ لَآ إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (أبو داود : باب فى التلقين)

'যার শেষ কথা হবে "لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'
(সুনানে আবু দাউদ : ২/৪৪৪)

মৃত্যুর পরের মাসনূন কাজ

মৃতের চোখ খোলা থাকলে তা বন্ধ করে দিবে। কাপড় দিয়ে চোয়াল বেঁধে দিবে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সোজা করে দিবে। এ সময় যেহেতু ফেরেশতারা উপস্থিত থাকেন এবং দুআকারীদের দুআয় আমীন বলেন তাই মৃতের প্রতি বা অন্য কারো প্রতি বদদুআ করা উচিত নয়। এ সময় বিলাপ করা থেকে ও উচ্চ আওয়াজে ক্রন্দন করা থেকেও বিরত থাকবে। কেননা, এতে মৃতের কষ্ট হয়ে থাকে।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন—

دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ. فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ : لَاتَدْعُوا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلٰى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ : "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ. (مسلم : باب في إغماض الميت)

"আবু সালামার মৃত্যু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং তার চোখ বন্ধ করলেন। এরপর বললেন, 'যখন রূহ কবজ করা হয় তখন দৃষ্টি তার অনুসরণ করে।' একথা শুনে পরিবারের লোকেরা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা এখন শুধু কল্যাণের দুআ করবে। কেননা, ফেরেশতারা তোমাদের কথায় আমীন বলবেন।' এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করলেন–

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

ইয়া আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করুন। হেদায়েতপ্রাপ্তদের মাঝে তার দরজা বুলন্দ করুন। তার পরিবারবর্গকে উত্তম নায়েব দান করুন।

ইয়া রাব্বাল আলামীন! তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন। তার কবরে আলো ও প্রশস্ততা দান করুন। (সহীহ মুসলিম : ১/৩০০-৩০১)

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. (مسلم : الميت يعذب ببكاء أهله)

'বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তির আযাব হয়ে থাকে।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'পরিবারের লোকদের ক্রন্দন-মাতমের কারণে মৃত ব্যক্তির আযাব হয়ে থাকে।' (সহীহ মুসলিম : ১/৩০২)

জানাযার নামায

যত দ্রুত সম্ভব মাইয়্যেতকে গোসল দিয়ে কাফন পরাবে। এরপর জানাযার নামায পড়বে।

জানাযার নামাযে চার তাকবীর হয়। প্রথম তাকবীরের পর হাত বেঁধে ছানা– সুবহানাকাল্লাহুম্মা ... পড়বে। ছানা হিসাবে সূরা ফাতিহাও পড়া যায়। দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ পড়বে। তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়্যেতের জন্য দুআ করবে এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফেরাবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (بخارى : الصفوف على الجنازة)

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদেরকে) নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ দিলেন। এরপর (জানাযার নামাযের জন্য) সামনে অগ্রসর হলেন। সাহাবীরা তাঁর পিছনে কাতার করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) চার তাকবীর দিলেন।' (সহীহ বুখারী : ১/১৭৬)

প্রথম তাকবীরের পর হামদ ছানা

জানাযার নামায মূলত মাইয়্যেতের জন্য দুআ। এজন্য দুআর ভূমিকা স্বরূপ প্রথমে হামদ-ছানা ও দরূদ শরীফ পড়া হয়। প্রথম তাকবীরের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলে হাত বাঁধা হয় এবং ছানা পড়া হয়। এ সময় ছানা হিসেবে

সূরা ফাতিহাও পড়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তা পড়েছেন। মনে রাখতে হবে যে, জানাযায় নামাযে কিরাআত নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে তা বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু দুআ আস্তে করা উত্তম তাই জানাযার নামাযে ছানা ইত্যাদি আস্তে পড়া হয়।

হযরত সায়ীদ ইবনে আবু সায়ীদ মাকবুরী (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন—

إِنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ. أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ، وَحَمِدْتُ اللَّهَ، وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ أَقُولُ : اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ... (موطا مالك : ما يقول المصلى على الجنازة)

'তিনি আবু হুরায়রা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কীভাবে জানাযার নামায পড়ে থাকেন? আবু হুরায়রা বললেন, আমি তোমাকে জানাচ্ছি। আমি মাইয়্যেতের ঘর থেকে মাইয়্যেতের সঙ্গে সঙ্গে আসি। এরপর যখন খাটিয়া রাখা হয় তখন (জানাযার নামাযে) তাকবীর দিয়ে হামদ-ছানা ও দরূদ শরীফ পড়ি এরপর এই দুআ পড়ি–

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ...

(মুয়াত্তা মালিক : ৭৯)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ কিরাআত নির্ধারণ করেননি।' (আল-মুগনী)

দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ

ছানা পড়ার পর দ্বিতীয় তাকবীর দিবে এবং দরূদ শরীফ পড়বে। এই তাকবীর ও পরবর্তী দুই তাকবীরে ইমাম-মুকতাদী কেউই হাত তুলবে না।

তৃতীয় তাকবীরের পর দুআ

হামদ-ছানা ও দরূদের পর তৃতীয় তাকবীর দিবে এবং মাইয়্যেতের জন্য দুআ করবে।

আবু ইবরাহীম আশহালীর পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে এই দুআ পড়তেন—

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا، وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا. أَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ. (مصنف عبد الرزاق : القراءة والدعاء. ترمذى : ما يقول في الصلاة على الميت)

অর্থ : ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃতদের ক্ষমা করুন। উপস্থিত ও অনুপস্থিতদের ক্ষমা করুন। ছোট ও বড়দের ক্ষমা করুন। পুরুষ ও নারীদের ক্ষমা করুন।

ইয়া আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাদেরকে আপনি জীবিত রাখবেন তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন আর যাদেরকে মৃত্যু দিবেন তাদেরকে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দান করুন।

(জামে তিরমিযী : ১/১২১-১২২; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৩/৪৮৬)

মাইয়্যেত নাবালিগ হলে

মাইয়্যেত নাবালিগ হলে এই দুআ করবে যে, আল্লাহ যেন তাকে আমাদের জন্য ছওয়াবের মাধ্যম বানিয়ে দেন। (সহীহ বুখারী)

যেহেতু নাবালিগ শিশুর উপর শরীয়তের কোনো হুকুম বর্তায় না তাই তার জন্য মাগফিরাতের দুআর প্রয়োজন নেই। তার জানাযায় এই দুআ করবে—

أَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا.

মাইয়্যেত নাবালিগ মেয়ে হলে এই দুআ পড়বে—

أَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا، وَذُخْرًا، وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً.

অর্থ : ইয়া আল্লাহ! এই বাচ্চাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী করুন। আর তাকে আমাদের জন্য ছওয়াব ও সম্পদ বানিয়ে দেন। আর তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী করুন এবং তার সুপারিশ কবুল করুন।

চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

"صَلُّوا عَلٰى النَّجَاشِيِّ." سَمَّاهَا صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ. وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَ تَسْلِيمٌ (صحيح البخاري، كتاب الجنائز : سنة الصلاة على الجنائز أورده معلقا)

'নাজাশীর জন্য জানাযা পড়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে সালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ নামাযে রুকু-সাজদা নেই এবং কথা বলারও অনুমতি নেই। এতে রয়েছে তাকবীর ও তাসলীম (সালাম ফেরানো)। (সহীহ বুখারী : ১/১৭৬)

হাত ওঠানো

প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য কোথাও হাত ওঠানোর নিয়ম নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত—

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى التَّكْبِيرَةِ الْأُولٰى، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ، وَكَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا. وَرُوِىَ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ. (مصنف عبد الرزاق : رفع اليدين فى التكبير)

'তিনি প্রথম তাকবীরে হাত ওঠাতেন এরপর আর ওঠাতেন না। আর তিনি চার তাকবীর দিতেন।'

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকেই অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।'

(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস নং ৬৩৬৩)

আল্লামা ওহীদুজ্জামানও এ কথাই বলেন—

وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِى التَّكْبِيرَةِ الْأُولٰى.

'জানাযার নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরে হাত ওঠাবে।'

(নুযুলুল আবরার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৪)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لاَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ أَنْ يَكُوْنُوا مِئَةً فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ. أخرجه الترمذى (١٠٢٩) الجنائز : ما جاء فى الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. وقال : حديث عائشة حديث حسن صحيح. ومسلم بمعناه (٩٤٧) و النسائى فى "المجتبى" (١٩٩١) ولفظه لفظ مسلم.

'যখন কোনো মুসলমানের ইন্তেকাল হয় এবং এক শ জনের কাছাকাছি সংখ্যক মুসলমান তাঁর জানাযার নামায পড়ে ও তাঁর জন্য সুপারিশ করে তো এই সুপারিশ কবুল করা হয়।' (তিরমিযী)

গায়েবানা জানাযার নামায

কোনো মুসলমান যদি এমন কোনো এলাকায় মারা যায় যেখানে তার জানাযা পড়া হয়নি তাহলে তার জন্য জানাযার নামায পড়া মাসনূন। হাবশার সম্রাট নাজাশী যখন মারা গেলেন তখন যেহেতু সেখানে কোনো মুসলমান ছিল না এজন্য স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য গায়েবানা জানাযার নামায পড়েছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (بخارى : الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه)

'যে দিন নাজাশী মারা গেলেন সেদিনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ দিলেন। এরপর বাইরে এসে তাদেরকে কাতারবদ্ধ করলেন এবং চার তাকবীর দিয়ে নামায পড়লেন।'

(সহীহ বুখারী : ১/১৯৭)

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, যার জানাযার নামায পড়া হয়নি তার জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া হবে। আর যার জানাযা পড়া হয়েছে তার জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্য় পাওয়া যায় না তাই এটা পড়া যাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের অনেক নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী দূর-দূরান্তের অঞ্চলে ইন্তেকাল করেছেন, কিন্তু তাদের কারো জন্য গায়েবানা জানাযা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েননি।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর বিশ্লেষণ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—

اَلصَّوَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِنْ مَاتَ بِبَلَدٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فِيْهِ، صُلِّيَ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْغَائِبِ. كَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ، لِاَنَّهُ مَاتَ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ... حَيْثُ مَاتَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْغَائِبِ، لِأَنَّ الْفَرْضَ قَدْ سَقَطَ بِصَلَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْغَائِبِ وَتَرَكَهُ، وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سُنَّةٌ، هٰذَا لَهُ مَوْضِعٌ وَهٰذَا لَهُ مَوْضِعٌ. (زاد المعاد ج ١ ص ٥٠١)

'সঠিক কথা এই যে, কেউ যদি এমন কোনো অঞ্চলে মারা যায় যেখানে তার জানাযার নামায পড়া হয়নি তাহলে তার জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া হবে। নাজাশী যেহেতু কাফেরদের মধ্যে ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তার জানাযার নামায পড়ার মতো কেউ সেখানে ছিল না তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবানা জানাযা আদায় করেছেন।

'পক্ষান্তরে যার জানাযা পড়া হয়েছে তার জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া হবে না। কেননা একবার পড়ার দ্বারাই ফরয আদায় হয়েছে।'

'মনে রাখতে হবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গায়েবানা জানাযা পড়া এবং না-পড়া দু'টো বিষয়ই রয়েছে তবে প্রত্যেকটির ক্ষেত্র ভিন্ন।'

(যাদুল মাআদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পরিষ্কার সুন্নাহ্ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ সাধারণ অবস্থায়ও গায়েবানা জানাযা পড়ে থাকে আর নাজাশীর উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে। অথচ এখানে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়।

১. আগেই বলা হয়েছে যে, নাজাশীর গায়েবানা জানাযা এজন্য পড়া হয়েছিল যে, তার মৃত্যুর পর সেখানে জানাযা পড়ার মতো কেউ ছিল না এবং তার জানাযা পড়া হয়নি। অতএব এই ঘটনা এমন মৃতদের প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা সঠিক নয়, যাদের অবস্থা ভিন্ন।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অবস্থায় যা করেছেন ওই অবস্থায় তা করাই হল সুন্নাহ্। নাজাশীর বিশেষ প্রেক্ষাপট ছাড়া সাধারণ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো গায়েবানা নামায পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই। অতএব সাধারণ অবস্থায় গায়েবানা জানাযা হাদীসসম্মত নয়।

এ সিদ্ধান্ত জেনে রাখা ভালো যে, এ বিষয়ে মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে যে কথা বর্ণনা করা হয় তা একেবারেই সঠিক নয়। ইবনুল কাইয়েম (রহ.)ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (যাদুল মাআদ : ১/৫০০)

পরিশিষ্ট— ১

এ অধ্যায়ের আলোচনাগুলো গ্রন্থকার টীকা আকারে উল্লেখ করেছেন। পাঠকের সুবিধার জন্য তা আলাদা করে এখানে উপস্থাপিত হল।

দুধের শিশুর পেশাব নাপাক হওয়া প্রসঙ্গ

(৯৯ পৃষ্ঠার পর)

শিশুর পেশাব পরিষ্কার করার বিষয়ে হাদীস শরীফে যে শব্দগুলো এসেছে তা নিম্নরূপ :

১. فَصَبَّهُ عَلَيْهِ 'অতঃপর তার উপর পানি ঢাললেন।'

২. فَأَتْبَعَهُ بِالْمَاءِ 'অতঃপর পেশাবের স্থানগুলোতে পানি ঢাললেন।'

৩. "يَنْضَحُ" "يَرُشُّ" এই দুই শব্দের অর্থও পানি দ্বারা ধৌত করা। "পানি ঢাললেন" বলতে হালকাভাবে ধৌত করা বোঝানো হয়েছে। শেষোক্ত শব্দ দু'টিও এই অর্থ প্রকাশ করে। অন্য হাদীস থেকে একটি করে দৃষ্টান্ত পেশ করছি :

১. ধৌত করা অর্থে نَضْحٌ শব্দের ব্যবহার

عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

(مسلم : باب نجاسة الدم وكيفية غسله)

হযরত আসমা (রা.) বলেন, "একজন সাহাবিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, কারো কাপড়ে যদি হায়েযের রক্ত লেগে যায়, তাহলে সে কী করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'স্থানটি ঘষে নিবে এবং পানি ঢেলে ও আঙুলের মাথা দিয়ে ডলে পরিষ্কার করবে। এরপর ধৌত করবে এবং পরিধান করে নামায পড়বে'।" (সহীহ মুসলিম : ১/১৪০)

উপরোক্ত হাদীসে "ثُمَّ تَنْضَحُهُ" শব্দের অর্থ করতে গিয়ে ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, أَيْ تَغْسِلُهُ অর্থাৎ ধৌত করবে। ইবনে হাজার আসকালানী

"نَضْحٌ" অর্থাৎ إِنَّ مَعْنَى النَّضْحِ الْغَسْلُ (রহ.) ও ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বলেছেন, শব্দের অর্থ ধৌত করা।'

২. ধৌত করা অর্থে رَشٌّ শব্দের ব্যবহার

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، وَصَلِّي فِيهِ.

{ترمذی : ما جاء في غسل دم الحيضة من الثوب}

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, "একজন মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে কী করণীয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কাপড়টি ঘষবে এরপর পানি দ্বারা ডলবে ও ধৌত করবে, এরপর তাতে নামায পড়বে'।" (জামে তিরমিযী : ১/৩৫)

মুবারকপুরী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসে قَرْصٌ শব্দের অর্থ হল, আঙুল দ্বারা কাপড় ডলা, যাতে রক্ত নরম হয়ে পরিষ্কার হওয়ার উপযোগী হয়ে যায়। ثُمَّ رُشِّيهِ أَيْ صُبِّي الْمَاءَ عَلَيْهِ অর্থাৎ এরপর পানি প্রবাহিত করে ধৌত করবে।

মোটকথা, স্তন্যপানকারী শিশুর পেশাব ধুয়ে পরিষ্কার করা জরুরি। কেউ কেউ বলে থাকেন, এর উপর শুধু পানির ছিটা দিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট। তাদের এ কথা ভুল। তাছাড়া শুধু পানির ছিটা দেওয়ার দ্বারা পেশাব দূর হয় না। আর নাপাকী যথাস্থানে বহাল রেখে যে কাপড় পবিত্র করা যায় না তা তো বলাই বাহুল্য।

সাধারণ মোজায় মাসেহ : কিছু রেওয়ায়েত ও আলোচনা

(১২২ পৃষ্ঠার পর)

এই গুরুত্বপূর্ণ মাসআলায় কিছু মানুষের বিভ্রান্তি রয়েছে। তাই এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা প্রয়োজন। সাধারণ মোজার উপর মাসহের পক্ষে যে বর্ণনাগুলো দলীল হিসেবে পেশ করা হয় এখানে সেগুলো উল্লেখ করা হল। এরপর এগুলোর বর্ণনাগত মান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১. হযরত মুগীরাহ ইবনে শু'বা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত—

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করলেন এবং 'জাওরাব' ও চপ্পলের উপর মাসেহ করলেন।' (তিরমিযী : ১/২৯)

২. হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত—

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করলেন এবং জাওয়াব ও চপ্পলের উপর মাসেহ করলেন।' (বায়হাকী : ১/২৮৫; ইবনে মাজাহ : ১/৪২)

৩. হযরত বিলাল (রা.) সূত্রে বর্ণিত—

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার মোজা ও জাওরাবের উপর মাসেহ করতেন। (আল মু'জামুল কাবীর; তবারানী : ১/৩৫০; হাদীস নং ১০৬৩)

৪. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন, তবারানী দুই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এক সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

৫. ইবনুল কাইয়েম (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে বিষয়টি প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

৬. হযরত ছাওবান (রা.) বলেন—

بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِيْنِ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ক্ষুদ্র সেনাদলকে অভিযানে পাঠালেন। সে অভিযানে তারা প্রচণ্ড শীতের মুখোমুখি হন। ফিরে আসার পর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রচণ্ড শীতের অভিযোগ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পাগড়ী ও মোযার উপর মাসেহ করার অনুমতি দেন।"

(সুনানে আবু দাউদ : ১/১৯)

পর্যালোচনা

প্রথম দলীলের পর্যালোচনা

মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনায় শুধু চামড়ার মোজায় মাসহের কথা রয়েছে, 'জাওরাবে'র উপর মাসহের কথা নেই। তাই এ হাদীসের যে সূত্রে জাওরাবের উপর মাসহের কথা উল্লেখিত হয়েছে তা হাদীসের ইমামগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) এই বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর বলেন, "রেওয়ায়েতটি 'মুনকার'।" সুফিয়ান ছাওরী, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনুল মাদীনী এবং ইমাম মুসলিম প্রমুখ বিশিষ্ট ইমামগণ এই বর্ণনাকে 'জয়ীফ' বলেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, "এই হাদীসের সকল রাবীর রেওয়ায়েতে চামড়ার মোজায় মাসহের কথা রয়েছে। শুধু আবু কায়েস ও হুযাইলের বর্ণনা অন্য সকলের বর্ণনা থেকে ভিন্নতর এবং আবু কায়েস ও হুযাইলের পর্যায়ের বর্ণনাকারীর বর্ণনার ভিত্তিতে কুরআনের বিধান (অযুতে পা ধোয়া) পরিত্যাগ করা যায় না।"

২. আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, "এ বর্ণনা দুর্বল হওয়ার বিষয়ে হাদীসের ইমামগণ একমত। তাই এ ক্ষেত্রে তিরমিযী (রহ.) এর বক্তব্য– 'হাসান সহীহ' গ্রহণযোগ্য নয়।"

৩. ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (রহ.) বলেন, 'আমার মতে এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।'

৪. ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন, 'কেউ এ হাদীস আবু কায়েসের মতো বর্ণনা করেনি। বিশুদ্ধ বর্ণনায় শুধু চামড়ার মোজায় মাস্‌হের কথা রয়েছে।'

৫. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (রহ.) এ হাদীস বর্ণনা করতেন না। কেননা, হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) থেকে মা'রূফ (প্রকৃত ও নির্ভুল) বর্ণনা হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার মোজায় মাসেহ করেছেন। জাওরাবের (কাপড়ের মোজার) উপর মাসেহ করার কথা সেখানে নেই।'

৬. ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) বলেন, 'এই হাদীস হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) থেকে মদীনা, কুফা ও বসরার রাবীগণ রেওয়ায়েত করেছেন। (তাঁদের রেওয়ায়েতে জাওরাবের উপর মাসহের কথা নেই) শুধু হুযাইলের বর্ণনায় এ অংশটুকু পাওয়া যায়।'

৭. মুবারকপুরী (রহ.) বলেন, "আবু কায়েসের বর্ণনা অন্য সকল বর্ণনাকারী থেকে ভিন্ন। হাদীসের অনেক ইমাম এই বর্ণনাকে 'জয়ীফ' বলেছেন। 'যিয়াদাতুস ছিকাত' বা রাবীর বর্ধিত বর্ণনা শিরোনামে উসূলে হাদীসে যে আলোচনা রয়েছে সে সম্পর্কে এ ইমামগণ সম্যক অবগত ছিলেন (বরং তাদের আলোচনা থেকেই এই ব্যাকরণ সৃষ্টি হয়েছে) এজন্য আমি মনে করি, এই বর্ণনা 'জয়ীফ' হওয়ার সিদ্ধান্ত তিরমিযী (রহ.)-এর 'হাসান সহীহ'-র সিদ্ধান্তের চেয়ে অগ্রগণ্য।" (তুহফাতুল আহওয়াযী : ১/২৭৯)

দ্বিতীয় দলীলের পর্যালোচনা

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি মুহাদ্দিসীনের মতে জয়ীফ। কেননা, এর সনদে 'দুর্বলতা' ও 'বিচ্ছিন্নতা' রয়েছে।

মুবারকপুরী (রহ.) বলেন, 'এর একজন বর্ণনাকারী হল ঈসা ইবনে সিনান। তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। এজন্য তার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়।'

২. ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, 'এই বর্ণনায় দু'টি ত্রুটি রয়েছে : ক. রাবীর দুর্বলতা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন, আবু যুরআ, নাসায়ী প্রমুখ ইমামগণ ঈসা ইবনে সিনানকে "জয়ীফ" বলেছেন। খ. সনদের বিচ্ছিন্নতা। কেননা, আবু মুসা আশআরী থেকে যাহহাক ইবনে আবদুর রহমান হাদীস শুনেছেন– এটা প্রমাণিত নয়।'

৩. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, 'এই বর্ণনার সূত্র অবিচ্ছিন্নও নয়, শক্তিশালীও নয়।'

তৃতীয় দলীলের পর্যালোচনা

হযরত বিলাল (রা.) সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি মুহাদ্দিসীনের মতে জয়ীফ। এই রেওয়ায়েতের সনদে জয়ীফ রাবী রয়েছে এবং অন্যান্য সমস্যা রয়েছে।

১. হাফেয যায়লায়ী (রহ.) বলেছেন, "এই বর্ণনার সনদে ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ নামক রাবী রয়েছে, যিনি 'জয়ীফ'।"

২. হাফেয ইবনে হাজার "তাকরীব" কিতাবে বলেছেন, 'এই রাবী জয়ীফ। বৃদ্ধ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন শীয়া।'

চতুর্থ দলীলের পর্যালোচনা

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন, 'বিলাল (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি তবারানী দুই সনদে বর্ণনা করেছেন, এক সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।'

এখানে উল্লেখ্য যে, একটি সনদের শুধু রাবীগণ নির্ভরযোগ্য হলেই সে হাদীসকে 'সহীহ' বলা যায় না। রাবীদের নির্ভরযোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্রটি থেকেও সনদটি মুক্ত থাকতে হয়। পরিভাষায় ওই ক্রটিগুলোকে 'শুযূয' ও 'ইল্লত' বলে। এই সনদটি এসব ক্রটি থেকে মুক্ত নয়।

মুবারকপুরী (রহ.) বলেন, "যদিও একটি সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য তবে সে সনদের একটি ক্রটি এই যে, সনদে 'আ'মাশ' রয়েছেন। তার সম্পর্কে 'তাদলীসে'র'[১] অভিযোগ রয়েছে এবং তিনি তার পূর্ববর্তী রাবী থেকে শ্রবণের উল্লেখ করেননি।"

পঞ্চম দলীলের পর্যালোচনা

ইবনুল কাইয়েম (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণ দানের প্রয়াস পেয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে মুবারকপুরী (রহ.) বলেন, 'কোনো কোনো সাহাবী থেকে জাওরাবে মাসহের যে বর্ণনা এসেছে তাদের জাওরাব পাতলা ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই; বরং বিভিন্ন দলীল দৃষ্টে বোঝা যায়, সেগুলো এত পুরু ছিল যে, কোনো বাঁধন ছাড়াই পায়ে দেওয়া যেত এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা যেত। এ ধরনের জাওরাব চামড়ার মোজার স্থলাভিষিক্ত। তাই এগুলো চামড়ার মোজায় মাসেহ বিষয়ক হাদীসের আওতাভুক্ত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)ও বলেছেন যে, সাহাবীদের ব্যবহৃত জাওরাব চামড়ার মোজার মতো ছিল বলেই তারা তাতে মাসেহ করেছেন।'

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকেও পাতলা মোজায় মাসহের পক্ষে কোনো সূত্র পাওয়া যায় না।

---

১. তাদলীস– কোনো বর্ণনাকারী প্রকৃতপক্ষে যার কাছ থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন তার নাম উহ্য রেখে যদি পূর্ববর্তী কোনো রাবীর নাম এমনভাবে উল্লেখ করেন যে, সরাসরি তার কাছ থেকে শুনেছেন বলে উল্লেখ না থাকলেও তাদের সম-সাময়িকতার কারণে ধারণা হয়, তিনি তার কাছ থেকেই হাদীসটি শ্রবণ করেছেন, তবে একে তাদলীস (তাদলীসুল ইসনাদ) বলে। রাবীদের মধ্যে কারা কারা তাদলীস করতেন তা মুহাদ্দিসগণ চিহ্নিত করেছেন। এ শ্রেণীর রাবীগণ অন্যান্য বিষয়ে 'ছিকা' বা নির্ভরযোগ্য হলেও মুহাদ্দিসগণ তাদের অস্পষ্ট শব্দের বর্ণনা যেমন, 'অমুক বলেছেন', 'অমুক বর্ণনা করেছেন' ইত্যাদি গ্রহণ করেন না; বরং 'অমুক আমাকে বর্ণনা করেছেন', 'আমি অমুকের কাছ থেকে শুনেছি'– এরূপ স্পষ্ট শব্দযোগে বর্ণনা করলে তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়। – অনুবাদক

ষষ্ঠ দলীলের পর্যালোচনা

হযরত ছাওবান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে تَسَاخِيْنُ শব্দ এসেছে। কেউ কেউ এই শব্দ থেকে প্রমাণ গ্রহণের প্রয়াস পেয়েছেন। এই রেওয়ায়েতটি আলোচ্য বিষয়ে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম কারণ এই যে, হাদীসটির সনদ 'মুনকাতি' অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন। রাশেদ ইবনে সা'দ হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী হাতিম 'মারাসীল' গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, 'রাশেদ ইবনে সা'দ হযরত ছাওবান (রা.) থেকে শুনেছেন তা প্রমাণিত নয়।' (তুহফাতুল আহওয়াজী : ১/৩৩০-৩৪০)

দ্বিতীয় কথা এই যে, অভিধানে تَسَاخِيْنُ শব্দটি তিন অর্থে পাওয়া যায়। এজন্য এর অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে 'কাপড়ের মোজা' করা ঠিক নয়। ইবনুল আছীর 'আননিহায়া'য় লেখেন, 'تَسَاخِيْنُ অর্থ চামড়ার মোজা।' হামযা আসপাহানীর বক্তব্য হল, এটি এক বিশেষ ধরনের টুপি, যা আলিমগণ পরিধান করতেন। অন্যান্য ভাষাবিদগণ বলেছেন, تَسَاخِيْنُ অর্থ যা দ্বারা পা গরম করা হয়, তা চামড়ার মোজা হোক, কাপড়ের মোজা হোক কিংবা অন্য কোনো কিছু হোক। তবে 'বুলূগুল মারাম' কিতাবে রয়েছে যে, এই হাদীস বর্ণনা করার পর রাবী নিজেই বলে দিয়েছেন, এখানে تَسَاخِيْنُ অর্থ চামড়ার মোজা।

জাওয়াব বা কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ বিষয়ক দলীল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শেষে মুবারকপুরী (রহ.) বলেন—

وَالْحَاصِلُ عِنْدِيْ أَنَّهُ لَيْسَ فِيْ بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ صَرِيْحٌ مَرْفُوْعٌ خَالٍ عَنِ الْكَلَامِ.

'সারকথা হল, জাওরাব বা কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ প্রসঙ্গে কোনো সহীহ মারফূ হাদীস আপত্তিমুক্ত সূত্রে পাওয়া যায় না।'

(তুহফাতুল আহওয়াযী : ১/৩৩৩)

অন্য গায়রে মুকাল্লিদ আলিম মাওলানা আবু সা'দ শারফুদ্দীন (রহ.) বলেছেন যে, 'পাতলা মোজার উপর মাসেহ কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত নয়, সহীহ মারফূ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নয়। ইজমা বা কিয়াসে সহীহও এর সমর্থন করে না এবং এর সপক্ষে সাহাবায়ে কেরামের আমলও পাওয়া যায় না। অথচ অযুতে

পা ধোয়া হল কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ। তাই চামড়ার মোজা ছাড়া অন্য কোনো মোজার উপর মাসেহ বৈধ নয়।'

(ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, ফাতাওয়া ছানাইয়্যাহ : ১/৪২৩)

আযানের বাক্যসমূহে নতুন সংযোজন

(১৩৪ পৃষ্ঠার পর)

হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি মহব্বত প্রকাশের জন্য কতক শিয়া আযানে এই বাক্য সংযোজন করেছে–

أَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ الخ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমীরুল মুমিনীন, ইমামুল মুত্তাকীন আলী আল্লাহর দোস্ত।" হাদীস শরীফের কোথাও এই বাক্য পাওয়া যায় না; বরং বিভিন্ন দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আযানে এই কথাগুলো ছিল না; হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতের সময় ছিল না; হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ছিল না; হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের সময়ও ছিল না। হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি অন্তরে যদি সত্যিকারের মহব্বত থাকে তবে তাঁর খিলাফতের পূর্ণ সময় যেভাবে আযান দেওয়া হয়েছে, তা-ই অনুসরণ করা উচিত।

যে আযান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের পুণ্য যুগে ছিল না, নিঃসন্দেহে তা পরবর্তী যুগের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতা থেকে সৃষ্ট।

শীয়া সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গবেষক শায়খ তূসী কিতাবুল ইসতিবসার-এর بَابُ عَدَدِ الْفُصُولِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (আযানের বাক্যসমূহের বিবরণ) এর ২, ৩, ৪ ও ৫নং হাদীসে আযানের বাক্যগুলো উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত বাক্যগুলো সেখানে নেই। (আল-ইসতিবসার : ১/৩০৫)

শিয়াদের 'রঈসুল মুহাদ্দিসীন' খ্যাত আবু জাফর মুহাম্মদ আলী আসসাদূক (মৃত্যু : ৩৮১ হিজরী) مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ গ্রন্থে بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ 'আযান-ইকামত অধ্যায়'-এ ৩৫নং হাদীসে পুরো আযান উল্লেখ করেছেন। সেখানে "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" এর পরে حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ শব্দটি বর্ধিত আছে। বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর তিনি লিখেছেন—

قَالَ مُصَنِّفُ هٰذَا الْكِتَابِ : هٰذَا هُوَ الأَذَانُ الصَّحِيحُ، لا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنقَصُ مِنهُ، وَالمُفَوِّضَةُ - لَعَنَهُمُ اللهُ - قَدْ وَضَعُوا أَخْبَارًا، وَزَادُوا فِي الأَذَانِ "مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ" مَرَّتَيْنِ. وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِمْ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ "أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ" مَرَّتَيْنِ. وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى بَدَلَ ذٰلِكَ "أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا" مَرَّتَيْنِ. وَلَا أَشُكُّ فِي أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ، وَأَنَّهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، وَلٰكِنْ لَيْسَ ذٰلِكَ فِي أَصْلِ الأَذَانِ.

"এ গ্রন্থের গ্রন্থকার লেখেন, এটাই হল বিশুদ্ধ আযান, যেখানে নতুন কোনো সংযোজন-বিয়োজন বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলার অভিশাপ হোক "মুফাওইযা" ফের্কার উপর, তারা কিছু "হাদীস" বানিয়েছে এবং আযানে দুইবার

"مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ"

"মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গ সৃষ্টির সেরা" বাক্যটি বর্ধিত করেছে। কোনো কোনো বর্ণনায় তারা أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ -এর পরে "أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী আল্লাহর বন্ধু) বাক্যটি সংযুক্ত করেছে। আবার কেউ দুইবার "أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ন্যায়ত আলী হলেন আমীরুল মুমিনীন) বাক্যটি বর্ধিত করেছে। বলাবাহুল্য, হযরত আলী (রা.) আল্লাহর ওলী এবং তিনি ছিলেন আমীরুল মুমিনীন, আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার সৃষ্টির সর্বোত্তম মানব। তবে একথাগুলো আযানের অংশ নয়।"

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, স্বয়ং শীয়া গবেষকদের ভাষ্য অনুযায়ী শীয়া সম্প্রদায়ের এই বর্ধিত বাক্যগুলো আযানের অংশ নয়। স্বয়ং শীয়া মুহাদ্দিস এ বাক্যগুলো সংযোজনকারীদের প্রতি লানত করেছেন।

শীয়া সম্প্রদায়ের এই সংযোজনে প্রভাবিত হয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কেউ যদি আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর প্রশংসাসূচক কোনো বাক্য আযানের মধ্যে যোগ করে তবে তা-ও হবে বিদআত এবং নিঃসন্দেহে

প্রত্যাখ্যাত। কেননা, সুন্নত-বিদআতের যে মানদণ্ড ইসলাম নির্ধারণ করেছে তা সব ধরনের সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। এজন্য কোনো সুন্নীও যদি কোনো ইসলামী ইবাদতে কোনো কিছু সংযোজন করে তবে তা বিদআত ও খেলাফে সুন্নত বলেই পরিগণিত হবে।

আযানের শুরুতে দরূদ পাঠ

পাক-ভারত উপমহাদেশের কিছু বিদআতপন্থী আযানের শুরুতে দরূদ শরীফ সংযোজন করেছে। এই সংযোজন কুরআন-সুন্নাহর নীতিমালার আলোকে বিদআত হিসেবে চিহ্নিত। হক্কানী আলিমগণ তা বিদআত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কুরআনের আলোকে পর্যালোচনা

কুরআন মাজীদে এসেছে-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাগণ তাঁর প্রতি দরূদ পড়েন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তার প্রতি দরূদ পড় ও ভালোভাবে সালাম জানাও। (সূরা আহযাব : ৫৬)

এই আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর চেয়ে অধিক এই আয়াতের মর্ম আর কে অনুধাবন করেছে ? তিনি কুরআনের অন্যান্য আয়াতের মতো এই আয়াতও সাহাবীদেরকে শিখিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম সে অনুযায়ী আমল করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কুরআন মজীদের সবচেয়ে বড় আলিম। কেননা, কুরআনের শব্দ ও মর্ম তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। যদি আযানের শুরুতে দরূদ পড়া এই আয়াতের নির্দেশনা হত তাহলে অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের তা শিক্ষা দিতেন এবং সাহাবায়ে কেরামও সে অনুযায়ী আমল করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন শিক্ষা দেননি এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের মধ্যেও এমন কিছু পাওয়া যায় না। অতএব স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, আযানের শুরুতে দরূদ পড়া কুরআনের নির্দেশনা নয়।

এরপরও যদি কেউ আযানের শুরুতে দরূদ সংযোজন করে তবে তা হবে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বেআদবীর সমার্থক। এই সংযোজনের অর্থ দাড়াবে– আল্লাহ তাআলা যে আযান দান করেছেন তাতে ওই জিনিসের কমতি ছিল, আজ তা পূর্ণ করা হল! তদ্রূপ এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানেও বেআদবী করা হবে। যেন একথা বলা হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের মর্ম পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম হননি, কিংবা সক্ষম হয়েছেন কিন্তু উম্মতকে তা অবহিত করেননি (নাউযুবিল্লাহ)। এই সংযোজনের পরোক্ষ অর্থ এটাও দাড়ায় যে, নবী-যুগের আযান (নাউযুবিল্লাহ) অসম্পূর্ণ ছিল! এভাবে এ ধরনের কর্মকাণ্ড সাহাবায়ে কেরাম ও গোটা মুসলিম উম্মাহর সঙ্গেই বেআদবী ও ঔদ্ধত্য প্রকাশের শামিল। যেন তাঁরা কেউ কুরআনের মর্ম অনুধাবনে সক্ষম হননি কিংবা জেনে-বুঝেও এই প্রয়োজনীয় আমলটি পরিত্যাগ করেছেন! (নাউযুবিল্লাহ)

সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা

আযানের পূর্ণ বিবরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফে রয়েছে। সেটাই হল সুন্নাহসম্মত আযান। মুয়াজ্জিনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য, আযানের জওয়াব, আযানের পরের দুআ ইত্যাদি সবকিছুই হাদীস শরীফে এসেছে। যদি আযানের শুরুতে দরূদ শরীফ মাসনূন হত তবে তা হাদীস শরীফে অবশ্যই আসত, কিন্তু হাদীস শরীফের কোথাও এ সংযোজনটি পাওয়া যায় না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত মহব্বতের দাবি হল, তাঁর কাছে যে আযান পছন্দনীয় ছিল তা আমাদের কাছেও পছন্দনীয় হওয়া। আর তাঁর সময়ে যে আযান মক্কা-মদীনায় ধ্বনিত হয়েছে আমাদের ভূখণ্ডেও সেই আযান ধ্বনিত হওয়া।

যাঁরা রাসূলুল্লাহর ইশক ও মহব্বতের শুধু দাবিদার ছিলেন না; বরং তাঁর জন্য জান-মাল কুরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম। আযানে দরূদ শরীফ সংযোজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ ও নৈকট্যের কারণ হলে সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরামই তা সংযোজন করতেন। বিশেষত রাসূলুল্লাহর মুয়াজ্জিন সাহাবী হযরত বিলাল (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.), সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.), হযরত আবু মাহযূরা (রা.) তা অবশ্যই যোগ করতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। অথচ তাঁরা নবী-ইচ্ছা খুব উত্তমরূপে বুঝতেন। তাঁরা তা-ই করেছেন যা সত্যিকারের

ভালোবাসা ও আনুগত্যের পরিচায়ক। তাঁরা জীবনভর সে আযানই দিয়েছেন যা ছিল রাসূলুল্লাহর নির্দেশিত আযান।

মোটকথা, আযানের শুরুতে দরূদ যোগ করাকে কখনো নবী-মহব্বতের পরিচায়ক বলা যায় না।

আযানের মতো (সুনির্ধারিত ও প্রকাশ্য) ইবাদত তো দূরের কথা, সুন্নাহ-প্রেমিক সাহাবায়ে কেরাম সাধারণ দুআ ও যিকিরের মধ্যেও সামান্যতম সংযোজন সহ্য করতেন না, বাহ্যদৃষ্টিতে তা যতই আকর্ষণীয় বোধ হোক না কেন।

হযরত নাফে (রহ.) বলেন—

إِنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَأَنَا أَقُوْلُ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَّمَنَا أَنْ نَقُوْلَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ، عَلٰى كُلِّ حَالٍ. (الترمذى ١٠٣/٣)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর নিকটে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলল, الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, 'হামদ ও সালাম আমিও বলি তবে হাঁচির পরে নয়। কেননা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় আমাদেরকে তা বলতে শেখাননি। তিনি আমাদেরকে হাঁচির পরে শুধু "الْحَمْدُ لِلّٰهِ" বলতেই শিখিয়েছেন।" (তিরমিযী : ৩/১০৪)

চিন্তা করে দেখুন, السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ [আল্লাহর রাসূলের প্রতি শান্তি হোক,] কোনো আপত্তিকর বাক্য নয়। কিন্তু সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হাঁচির পর নির্ধারিত দুআর সঙ্গে এ সংযোজন অপছন্দ করেছেন। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহর নির্দেশিত পথের বাইরে না-যাওয়ার এই শিক্ষা তাঁরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহর নিকট থেকেই গ্রহণ করেছেন। এ থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, আযানের মতো সুনির্ধারিত ইবাদতে নতুন সংযোজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পছন্দনীয় হতে পারে কি না।

উম্মাহর উলামা এবং বেরেলভী আলিমগণের বক্তব্য

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আযানের শুরুতে এই সংযোজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যযুগে ছিল না

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও ছিল না এবং পরবর্তী শত শত বৎসর পর্যন্ত এর কোনো অস্তিত্ব কোথাও ছিল না। হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে এসে কেউ কেউ আযানের মধ্যে নতুন সংযোজন ঘটিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উম্মাহ্‌র আলিমগণ তার দৃঢ় প্রতিবাদ করেছেন এবং এ ধরনের সংযোজন বিদআত হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেছেন।

আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী (রহ.) লেখেন—

وردت أحاديث أخر بنحو تلك الأحاديث السابقة، ولم نر في شيء منها التعرض للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الأذان ولا إلى محمد رسول الله بعده. ولم نر أيضا في كلام ائمتنا تعرضا لذلك أيضا، فحينئذ كل واحد من هذين ليس بسنة في محله المذكور فيه، فمن أتى بواحد منهما في ذلك معتقدا سنيته في ذلك المحل المخصوص نهي عنه ومنع منه، لأنه تشريع بغير دليل، ومن شرع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه.

"এ ধরনের আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনো হাদীসেই আযানের শুরুতে বা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র পরে দরূদ শরীফ পড়ার কথা নেই। আমাদের ইমামগণের আলোচনাতেও তা পাওয়া যায় না। তাই আযানে দরূদ পড়া মাসনূন (সুন্নাহসম্মত) নয়। যদি কেউ সুন্নত মনে করে এখানে দরূদ পড়ে তবে তাকে বাধা দিতে হবে। কেননা, এটা দলীল ছাড়া শরীয়ত-প্রণয়নের শামিল। আর যে বিনা দলীলে শরীয়ত-প্রণয়নে লিপ্ত হয় তাকে কঠোর হস্তে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে।" (আল-ফাতাওয়াল কুবরা আল-ফিকহিয়্যাহ : ১/১৩১)

'মাজালিসুল আবরার' গ্রন্থকার লেখেন—

قد غيرت هذه السنة في هذا الزمان في أكثر البلدان، لأن أهلها يؤذنون بأنواع النغمات والألحان ... ثم إنهم لحرصهم على التغني لم يكتفوا بكلمات الأذان، بل زادوا عليها بعض الكلمات من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة وإن كانت مشروعة بنص الكتاب والسنة، وكانت من أكبر العبادات وأجلها لكن اتخاذها

عَادَةً فِي الأَذَانِ عَلَى الْمِنَارَةِ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا، إِذْ لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَا غَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَضَعَ الْعِبَادَاتِ إِلَّا فِي مَوَاضِعِهَا الَّتِي وَضَعَهَا فِيهَا الشَّرْعُ وَمَضَى عَلَيْهَا السَّلَفُ، أَلَا تَرَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ مَعَ كَوْنِهَا مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ لَا يَجُوزُ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يَقْرَءَهَا فِي الرُّكُوعِ وَلَا فِي السُّجُودِ وَلَا فِي الْقَعْدَةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا لَيْسَ مَحَلًّا.

"আজকাল অনেক জায়গায় সুন্নত মোতাবেক আযান দেওয়া হয় না। কিছু কিছু মুয়াজ্জিন আযানের বাক্যগুলিকে সুর করে করে ও ভুলভ্রান্তি সহকারে উচ্চারণ করে থাকে। এতেও যখন তাদের পূর্ণ তৃপ্তি হল না তখন তারা আযানের নির্ধারিত বাক্যগুলোর সঙ্গে দরূদ শরীফ যোগ করল (সম্ভবত এজন্যেই পাক-ভারত উপমহাদেশে এ সংযোজন লাউড স্পিকারের (মাইকের) প্রচলন হওয়ার পর এসেছে)। যদিও দরূদ শরীফ পড়া কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ আমল, কিন্তু একে আযানের অংশ বানানো জায়েয নয়। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কেউই এমন করেননি। ইসলামী শরীয়ত ইবাদতের যে পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং উম্মাহর মনীষীগণ যা অনুসরণ করে গেছেন, তাতে পরিবর্তন সাধন করার অধিকার কারো নেই।

"দেখুন, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা অনেক বড় ইবাদত, কিন্তু তাই বলে কেউ যদি নামাযে রুকু, সাজদা বা বৈঠকে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে তবে কি তা জায়েয হবে ? হবে না। কেননা, এগুলো কুরআন তিলাওয়াতের স্থান নয়।" (মাজালিসুল আবরার : পৃ. ৩০৭)

মাজালিসুল আবরার-গ্রন্থকার যে নীতি উল্লেখ করেছেন তা অত্যন্ত যৌক্তিক ও শক্তিশালী নীতি, যার সারকথা এই যে, যে ইবাদতের পদ্ধতি শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাতে কারো সংযোজন-বিয়োজনের অধিকার নেই। কেউ যদি জোহরের নামাযের প্রথম বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু'র পর ইচ্ছাকৃতভাবে দরূদ শরীফ পড়ে তবে তার নামায নষ্ট হয়ে যায়। ভুলক্রমে পড়লে সাহু সাজদা ওয়াজিব হয়। কেননা, দরূদ শরীফ প্রথম বৈঠকে পড়ার নিয়ম নেই, দ্বিতীয় বৈঠকে পড়তে হয়। বোঝা গেল, শরীয়তে যেখানে দরূদ শরীফ পড়ার নিয়ম রয়েছে সেখানে দরূদ না পড়া যেমন অপরাধ তেমনি যেখানে দরূদ পড়ার নিয়ম নেই সেখানে তা বাড়ানোও অপরাধ।

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) "ফাতহুল কাদীর" গ্রন্থে এ মাসআলা স্পষ্টভাবে লিখেছেন।

أَوْ تَأْخِيرِ الْقِيَامِ إِلَى الثَّالِثَةِ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّشَهُّدِ وَلَوْ بِحَرْفٍ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"যদি তৃতীয় রাকাআতে দাড়াতে বিলম্ব করে এবং ভুলক্রমে দরূদ শরীফ পড়া আরম্ভ করে তবে সাহু সাজদা ওয়াজিব হবে।" (ফাতহুল কাদীর : ১/৫০২)

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ হুসাইন নুআইমী বলেন, "আযানের বাক্যগুলো সুনির্ধারিত। এতে কোনো ধরনের সংযোজন-বিয়োজন কিংবা এর শুরু বা শেষে বিনা ব্যবধানে দরূদ শরীফ বা কুরআনের আয়াত সংযুক্ত করা বিদআত এবং ইবাদতকে ক্রটিপূর্ণ করার নামান্তর। আযানের শুরুতে দরূদ শরীফ অপরিহার্য করা বা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের পরিচয় সাব্যস্ত করাও বিদআত। আর ইবাদতের সুনির্ধারিত রূপ বিকৃত করার অপচেষ্টা।

(সারসংক্ষেপ, ফাতাওয়া মুফতী মুহাম্মদ হুসাইন নুআইমী, জামেয়া নুআইমিয়া, লাহোর)

"আনওয়ারুস সুফিয়া" গ্রন্থে আছে– "প্রথম যুগে; বরং পাকিস্তান সৃষ্টির আগ পর্যন্ত কোথাও আযানের আগে সুউচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ বা সালাত-সালাম পড়ার রেওয়াজ ছিল না। মূলত ওহাবী-দেওবন্দীদের সঙ্গে জেদাজেদির বশবর্তী হয়ে কিংবা সুর-প্রেমিক মুয়াজ্জিনদের মাধ্যমে এই সংযোজনের সৃষ্টি। এই নিয়ম ইসলামে ছিল না। মূর্খরা এর অনুসরণ করছে আর আলেমরা নিশ্চুপ রয়েছে। জানি না এই নিরবতার কী কারণ।" (সারসংক্ষেপ আনওয়ারে সুফিয়া, তরজুমানে আস্তানা আলীপুর শরীফ, জানুয়ারী, ১৯৭৮ইং)

দারুল উলূম হিযবুল আহনাফ এর ফতোয়া

সুবহে সাদিকের আগে লাউড স্পিকারে (মাইকে) দরূদ শরীফ পড়া জায়েয নয়। (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম হিযবুল আহনাফ, লাহোর, ২২ অক্টোবর, ১৯৭৮ ইং)

মোটকথা, আযানের আগে বা পরে দরূদ শরীফ কিংবা অন্য কিছুর সংযোজন কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া ও আমল ইত্যাদি কোনো কিছু দ্বারাই প্রমাণিত নয়। উপরের উদ্ধৃতিগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, খোদ বেরেলভী আলিমগণও একে বিদআত ও না-জায়েয আখ্যা দিয়েছেন। কত ভালো হত যদি অন্যান্য বেরেলভী আলিমও জেদাজেদি ও সংকীর্ণতা পরিহার করে এই বাস্তবতা মেনে নিতেন।

আযান-ইকামতে আঙুল চুম্বন বিষয়ে কিছু বানানো গল্প

(১৪১ পৃষ্ঠার পর)

আযান-ইকামতে আঙুল চুম্বনের নিয়ম যেহেতু কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই তাই বিদআতপন্থীরা এ প্রসঙ্গে কিছু স্বকল্পিত ঘটনার আশ্রয় নিয়ে থাকে। বর্ণনাগুলো এখানে উল্লেখ করা হল।

একটি বর্ণনা : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। আল্লামা সাখাবী (রহ.) একে "আল-মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে (بَابُ الْمِيْمِ) উল্লেখ করে "لَا يَصِحُّ" অর্থাৎ 'ভিত্তিহীন' বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আল্লামা সাখাবী বলেন–

ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْفِرْدَوسِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ بَكْرٍ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً رَسُوْلُ اللّٰهِ، قَالَ هٰذَا، وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْأَصْبَعَتَيْنِ السَّبَّابَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلٰى عَيْنَيْهِ، فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيْلِي فَقَدْ حلت له شَفَاعَتِيْ. وَلَا يَصِحُّ. ص ٦٠٤ برقم ١٠٢١

"দাইলামী ফিরদাউস গ্রন্থে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যখন মুয়াজ্জিনকে أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً رَسُوْلُ اللّٰهِ বলতে শুনলেন, তখন নিজেও অনুরূপ বললেন এবং তর্জনীর ভেতর পার্শ্বে চুম্বন করে দুই চোখে মুছলেন। তার এ কাজ লক্ষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে আমার বন্ধুর মতো করবে, সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।' এই ঘটনা ভিত্তিহীন।"

এ ধরনের কথা হযরত খিযির (আ.) সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়।

আল্লামা সাখাবী (রহ.) বলেন—

وَكَذَا مَا أورده أَبُو الْعَبَّاسِ أحمد بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الرَّدَّادُ الْيَمَانِيُّ الْمُتَصَوِّفُ فِيْ كِتَابِهِ "مُوْجِبَاتُ الرَّحْمَةِ وَعَزَائِمُ الْمَغْفِرَةِ" بِسَنَدٍ فِيْهِ مَجَاهِيْلُ مَعَ انْقِطَاعِهِ عَنِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. (المقاصد الحسنة - باب الميم)

"তদ্রূপ সেই বর্ণনাও ভিত্তিহীন, যা সুফী আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবু বকর ইয়ামানী "মূজিবাতুর রাহমাহ ওয়া আযাইমুল মাগফিরাহ" পুস্তিকায় উল্লেখ

করেছেন। কেননা, ঘটনাটির সনদে অনেক 'মাজহুল' (অপরিচিত রাবী) রয়েছে আর খিযির (আ.)-এর সঙ্গে মূল বর্ণনাকারীর সাক্ষাতও প্রমাণিত নয়।

(আল মাকাসিদুল হাসানাহ : পৃষ্ঠা ৬০৪, রেওয়ায়েত নং ১০২১)

আরেকটি কথা তাউস (রহ.) থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি শাম্‌ছ ইবনে নাস্‌র থেকে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে আঙটিতে চুমু দিবে সে কখনো অন্ধ হবে না।"

সাখাবী (রহ.) বলেন—

"وَلاَ يَصِحُّ فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ هٰذَا شَيْءٌ"

এ জাতীয় কোনো কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

জনাব আহমদ রেজা খানও স্বীকার করেছেন যে, আঙুলে চুমু খাওয়ার বিষয়টি কোনো সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে সর্বসাকুল্যে কিছু "কিচ্ছা-কাহিনী"র সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলামের রীতি-নীতি এসবের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় নির্ভরযোগ্য ও বাস্তবসম্মত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে।

আহমদ রেজা খান লেখেন, 'আযানে 'ছাহেবে লাওলাক' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক নাম শুনে আঙুলের নখে চুমু খাওয়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণনা করা হয় তা আপত্তিমুক্ত নয়। কেউ যদি বিষয়টিকে প্রমাণিত কিংবা জরুরি মনে করে কিংবা এ কাজ না করাকে আপত্তিকর ও নিন্দা-সমালোচনার বিষয় মনে করে, তবে নিঃসন্দেহে তার ধারণা ভুল। তবে কিছু জয়ীফ ও আপত্তিযুক্ত বর্ণনায় তর্জনীতে চুমু দেওয়ার বিষয়টি রয়েছে।' (আহমদ রেযা খান, মাজমূয়ায়ে রাসাইল : ২/১৫৫)

তার শেষোক্ত বাক্য থেকে এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে যে, বিষয়টি যেহেতু জয়ীফ হাদীসে রয়েছে তাই তা ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কেননা, ফাযাইলের ক্ষেত্রে জয়ীফ বা দুর্বল বর্ণনা মোতাবেকও আমল করা যায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, একদম ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ এই নীতি বলেননি। বরং ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হওয়ার নীতি ওইসব বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলোতে কিছু দুর্বলতা রয়েছে তবে একদম ভিত্তিহীন নয়। অতএব যদি দলীলের বিচারে উপরোক্ত বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্যতার এই পর্যায়ে উন্নীত হত তাহলে উপরোক্ত নীতি এখানে প্রয়োগ করা যেত, কিন্তু যেসব বর্ণনা মনগড়া ও বানানো তা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা যায় না এবং কোনো অবস্থাতেই তার উপর আমল করা যায় না।

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন—

الأَحَادِيثُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي تَقْبِيلِ الأَنَامِلِ وَجَعْلِهَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ سَمَاعِ اسْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ كُلُّهَا مَوْضُوعَاتٌ. (تيسير المقال)

"আযানের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম শোনার সময়ে আঙুলে চুমু খাওয়া এবং তা চোখে বুলানো সংক্রান্ত সকল বর্ণনা মওজু ও প্রক্ষিপ্ত।" (তাইসীরুল মাকাল, রাহে সুন্নত : সারফরাযখান সফদর, পৃ. ২৪৩)

মওজু বর্ণনা ফাযাইলের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লামা সাখাবী (রহ.) হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন—

وَيَجُوزُ وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ مَالَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا، وَقَالَ : أَمَّا الْمَوْضُوعُ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ بِحَالٍ. (القول البديع ص ١٩٥، ١٩٦)

"আমলের ফযীলত সম্পর্কে জয়ীফ হাদীস অনুযায়ী আমল করা যায়। তবে শর্ত হল, হাদীসটি "মওজু" শ্রেণীভুক্ত না হওয়া। কেননা, "মওজু" বর্ণনা কোনো বিষয়েই গ্রহণযোগ্য নয়।" (আল-কাউলুল বাদী)

নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধা প্রসঙ্গ
কিছু রেওয়ায়েত ও পর্যালোচনা

(১৫১ পৃষ্ঠার পর)

নামাযে কোথায় হাত বাঁধবে— এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য কোনো দলীল নেই। দু'দিকেই কিছু কিছু রেওয়ায়েত রয়েছে এবং এ সকল রেওয়ায়েতের সনদ বিশেষজ্ঞ আলিমদের দৃষ্টিতে আপত্তিযুক্ত নয়। তবে নাভির নিচে হাত বাঁধা বিষয়ে যে রেওয়ায়েতগুলো এসেছে তুলনায় সেগুলোই অধিক স্পষ্ট ও শক্তিশালী।

বুকের উপর হাত বাঁধা প্রসঙ্গে যেসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়, এখানে সেগুলো পর্যালোচনাসহ উপস্থাপিত হল–

১. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত–

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

"আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়লাম। তিনি তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখলেন।"

(ইবনে খুযাইমা : ১/২৭২, হাদীস নং ৪৭৯)

২. হযরত হুলব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ.

"আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুকের উপর হাত রাখতে দেখেছি।" (মুসনাদে আহমদ : ৫/২২৬)

৩. তাউস (রহ.) বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. (باب ما جاء فى الاستفتاح)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন। এরপর বুকের উপর হাত বাঁধতেন।"

(মারাসীলে আবু দাউদ, পৃষ্ঠা ৬)

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—

ضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ عِنْدَ النَّحْرِ

"তোমার ডান হাত বাম হাতের উপর বুকের কাছে রাখ।"

(সুনানে কুবরা বায়হাকী ২/৩১)

পর্যালোচনা

প্রথম বর্ণনা : হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি তিনভাবে পাওয়া যায়। যথা:

১. 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা' গ্রন্থে এই হাদীসে عَلَى الصَّدْرِ (বুকের উপর) স্থলে تَحْتَ السُّرَّةِ (নাভির নিচে) এসেছে।

২. ইবনে খুযায়মার বর্ণনায় عَلَى الصَّدْرِ (বুকের উপর) রয়েছে।

তবে এই বর্ণনা সম্পর্কে ইবনুল কাইয়েম (রহ.) 'ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন' গ্রন্থে (খ. ৩, পৃ. ৯) বলেন, শুধু মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল এভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্য কেউ বুকের উপর হাত রাখার কথা বর্ণনা করেননি। মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈলের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) মন্তব্য করেছেন— مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ অর্থাৎ তার বর্ণনাসমূহ মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য। ইমাম আবু যুরআ (রহ.) বলেছেন, "ইনি শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় অনেক ভুল করেছেন।"

তাছাড়া লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) রয়েছেন। তিনি নাভির নিচে হাত বাঁধার মত প্রকাশ করেছেন। যদি বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য হত তাহলে তিনি অবশ্যই এর উপর আমল করতেন এবং বুকের উপর হাত বাঁধতেন।

৩. ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস ইমাম বাযযার (রহ.)ও বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় "عَلَى الصَّدْرِ" (বুকের উপর) স্থলে "عِنْدَ صَدْرِهِ" (বুকের কাছে) রয়েছে।

হাফেয যাহাবী (রহ.) বলেন, "এ বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মদ ইবনে হুজর। "لَهُ مَنَاكِيْرُ" অর্থাৎ তার অনেক 'মুনকার' (অগ্রহণযোগ্য) বর্ণনা রয়েছে।"

দ্বিতীয় বর্ণনা : হযরত হুলব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস শুধু 'ছিমাক ইবনে হারব' রাবীর সূত্রে পাওয়া যায়। অনেক মুহাদ্দিস তাকে 'জয়ীফ' বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন— إِذَا تَفَرَّدَ بِأَصْلٍ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً 'কোনো মৌলিক বিষয় যদি তিনি একা বর্ণনা করেন তবে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না।'

দ্বিতীয়ত ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) এই হাদীসেরও অন্যতম রাবী, অথচ তিনি নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধার মত প্রকাশ করেছেন।

তৃতীয় বর্ণনা : বর্ণনাটি মুরসাল এবং আল্লামা নীমাভী (রহ.) একে জয়ীফ বলেছেন। (মাআরিফুস সুনান : ২/৪৪০)

চতুর্থ বর্ণনা : ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে উক্তি বর্ণিত হয়েছে তার বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে ইমামগণ কঠিন মন্তব্য করেছেন।

১. এই বর্ণনায় একজন রাবী ইয়াহইয়া ইবনে আবু তালিব। তার সম্পর্কে মূসা ইবনে হারূন (রহ.) বলেন— أَشْهَدُ أَنَّهُ يَكْذِبُ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে মিথ্যা বলত।" ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তার বর্ণনাগুলোর উপর রেখা টেনে তা পরিত্যক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (মীযানুল ইতিদাল : ৩/২৬৩)

২. অন্য একজন রাবী হল আমর। তার সম্পর্কে ইবনে আদী (রহ.) বলেন, مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ "তার বর্ণনাগুলো মুনকার– অগ্রহণযোগ্য।"

(আল-জাওহারুন নাকী : ২/৩০)

৩. আরেকজন রাবী হল 'রাওহ্'। তার সম্পর্কে ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন– يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ وَلَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ "সে মনগড়া রেওয়ায়েত বর্ণনা করে। তার কাছ থেকে বর্ণনা করা বৈধ নয়।" আবূ হাতিম রাযী বলেন– لَيْسَ بِالْقَوِيِّ "সে শক্তিশালী নয়।"

উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ্ পাঠ : একটি রেওয়ায়েত ও পর্যালোচনা

(১৫৫ পৃষ্ঠার পর)

কেউ কেউ 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়ার পক্ষে রাবী নুয়াইম মুজমিরের একটি বর্ণনা থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে থাকেন। বর্ণনাটি উল্লেখ করছি :

নুয়াইম বলেন–

صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَرَءَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، ثُمَّ قَرَءَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

"আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়লেন, এরপর সূরা ফাতিহা পড়লেন।"

এই বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা যাইলায়ী (রহ.) বলেন–

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আট শত ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন অনেক সাহাবী। তারা কেউই আবু হুরায়রা (রা.) থেকে উচ্চ স্বরে 'বিসমিল্লাহ' পড়ার কথা বর্ণনা করেননি। কেবল নুয়াইম মুজমির একথা বর্ণনা করেন। অতএব তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। বর্ণনাটিতে তার স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে।

২. ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে জোরে 'বিসমিল্লাহ' পড়ার কথা বর্ণনা করেননি।

৩. নুয়াইম মুজমির এর বর্ণনাটি 'যিয়াদাতুস ছিকাহ' (নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনায় বাড়তি অংশ) বলে আখ্যায়িত করাও সম্ভব নয়। কেননা 'যিয়াদাতুস ছিকাহ' গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হল, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হওয়া এবং যারা এই বাড়তি অংশটুকু বর্ণনা করেননি তাদের চেয়ে স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততায় দুর্বল না হওয়া। এই শর্ত এখানে অনুপস্থিত। তাই নুয়াইম মুজমির এর বাড়তি অংশটুকু সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণের কথা হল, এটি জয়ীফ।

৪. যদি একে 'সহীহ'ও ধরে নেওয়া হয় তবু এর দ্বারা উপরোক্ত বিষয় প্রমাণ হয় না। কেননা, এ বর্ণনায় বিসমিল্লাহ পড়ার কথা থাকলেও উচ্চ স্বরে পড়ার কথা নেই। (নসবুর রায়া : ১/৩৩৬)

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় নামাযে উচ্চ স্বরে কিরাআত পড়েছেন। যদি 'বিসমিল্লাহ'ও উচ্চ স্বরে পড়তেন তবে তার পিছনে নামায আদায়কারী সকলেই তা জানতেন। অথচ হযরত আনাস (রা.) থেকে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের পিছনে নামায পড়েছেন, কিন্তু তাঁদের কাউকে উচ্চ স্বরে 'বিসমিল্লাহ' পড়তে শোনেননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) এক ব্যক্তিকে নামাযে জোরে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনে একে বিদআত বলেও চিহ্নিত করেছেন। আজ পর্যন্ত মসজিদে নববীতে যেভাবে নামায আদায় করা হয় তাতে বিসমিল্লাহ জোরে পড়া হয় না।

সারকথা হল, নুআইম মুজমির রাবীর এই বর্ণনা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। আর এটা ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনাও এ প্রসঙ্গে পাওয়া যায় না। এজন্য আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রহ.) বলেছেন—

فَصَحِيحُ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ غَيْرُ صَرِيحٍ، وَصَرِيحُهَا غَيْرُ صَحِيحٍ.

"এ প্রসঙ্গে যে সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তাতে 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়ার কথা উল্লেখিত হয়নি। আর যেগুলোতে উল্লেখিত হয়েছে তা সহীহ নয়।"

(যাদুল মাআদ : ১/২০৭)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—

وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَهْرِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَرْوِ أَهْلُ السُّنَنِ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُوجَدُ الْجَهْرُ بِهَا فِي أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ،

وَإِنَّمَا كَثُرَ الْكَذِبُ فِي أَحَادِيثِ الْجَهْرِ لِأَنَّ الشِّيعَةَ تَرَى الْجَهْرَ، وَهُمْ مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ، فَوَضَعُوا أَحَادِيثَ لَبَسُوا بِهَا عَلَى النَّاسِ أَمْرَ دِينِهِمْ، وَلِهٰذَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : مِنَ السُّنَّةِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَتَرْكُ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ، كَمَا يَذْكُرُونَ تَقْدِيمَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، لِأَنَّهَا كَانَ عِنْدَهُمْ شِعَارَ الرَّافِضَةِ.

"আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। 'সুনান' বিষয়ক হাদীস-গ্রন্থকারগণও এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি। বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার বিষয়ে মওজু (প্রক্ষিপ্ত) রেওয়ায়েত অবশ্য অনেক পাওয়া যায়। এ বিষয়ে এত বেশি জাল বর্ণনা তৈরি হওয়ার পিছনে কারণ এই যে, শীয়া সম্প্রদায় জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার মত পোষণ করে থাকে। আর শীয়ারা হল সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী। এরা বহু জাল বর্ণনা তৈরি করে মুসলমানদের নিকটে এই দ্বীনী মাসআলা জটিল বানিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। তাদের এই অপতৎপরতার কারণে সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) ও অন্য ইমামগণ নামাযে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়াকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পরিচয় সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলেন, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পরিচয় হল, চামড়ার মোজায় মাসেহ করা, নামাযে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত উমর ফারূক (রা.)কে সকল সাহাবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিশ্বাস করা।' কেননা, এ বিষয়গুলোতে শীয়া ফের্কা বিপরীত মত পোষণ করে থাকে এবং এগুলোকে নিজেদের শি'আর (ধর্মীয় আলামত) হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।" (মুখতাসারু ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : পৃ. ৪৬, ৪৮)

নওয়াব সাহেবের বক্তব্য

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবও 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার কথা লিখেছেন। নামাযের পদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন—

"بعده بسمله گوید آهسته واحتیاط درین ست زیراکه روایت مختلف آمده است در بودن ونبودن بسمله آیتے از فاتحه، وصحیح شده است از آنحضرت صلی الله علیه وسلم افتتاح کردن نماز بالحمد وعدم جهر ببسم الله..."

'নামাযে আউযুবিল্লাহর পর বিসমিল্লাহ আস্তে পড়বে। এটিই সাবধানতার দাবি। কেননা, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ কি না— এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা থাকলেও একথা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আলহামদু' দ্বারাই নামাযের কিরাআত আরম্ভ করতেন, উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন না।" (মিসকুল খিতাম : ১/৩৭৯)

অতএব যারা নামাযের সূচনায় উচ্চ স্বরে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে থাকেন তারা যদি সকল সংকীর্ণতা পরিহার করেন এবং যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সূচনা করতেন সেভাবেই নামাযের সূচনা করেন তবে অবশ্যই এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

মুকতাদীর কিরাআত পাঠ : অন্যান্য মতামত ও পর্যালোচনা

(১৭৩ পৃষ্ঠার পর)

পূর্বের আলোচনা থেকে নামাযে কিরাআত প্রসঙ্গে উম্মাহর মূল ধারার অবস্থান জানা গিয়েছে। এরই সঙ্গে বুদ্ধিমান পাঠক এটাও বুঝতে পেরেছেন যে, এ বিষয়ে আরও কিছু মত রয়েছে। বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য সে মতগুলিও প্রয়োজনীয় পর্যালোচনাসহ স্মরণ রাখা দরকার। এখানে তেমন কিছু মত ও তার পর্যালোচনা উপস্থাপিত হল।

কিরাআত প্রসঙ্গে অন্য কিছু মত

১. একটি মত এই যে, 'সিররী' বা আস্তে কিরাআতের নামাযে মুকতাদী ইমামের সঙ্গে সূরা ফাতিহা পড়বে, 'জাহরী' বা জোরে কিরাআতের নামাযে পড়বে না।

২. কেউ কেউ এই মতও প্রকাশ করেছেন যে, ইমাম সূরা ফাতিহার এক এক আয়াত পড়ার পর এবং সূরার শেষে যে বিরতি দেন, সেই বিরতিতে মুকতাদী সূরা ফাতিহা পড়বে।

৩. কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, মুকতাদীর জন্য সকল নামাযে ফাতিহা পড়া অপরিহার্য।

পর্যালোচনা

প্রথমোক্ত মত যেসব কারণে দুর্বল তা নিম্নরূপ :

১. কুরআন মজীদের নির্দেশ হল, নামাযে যখন কুরআন পঠিত হয় তখন মুকতাদী তা মনোযোগের সঙ্গে শুনবে, আর নিশ্চুপ থাকবে। এ আদেশে উচ্চ

স্বরের কিরাআত ও নিম্ন স্বরের কিরাআতের পার্থক্য করা হয়নি। তাই আমাদেরও এই পার্থক্য করা উচিত নয়।

২. মুসলিম শরীফে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) থেকে এসেছে যে, কোনো নামাযেই ইমামের সঙ্গে কিরাআত পড়া উচিত নয়।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এসেছে যে, চার রাকাআতের কোনো রাকাআতেই মুকতাদী কিরাআত পড়বে না। আমরা জানি যে, জোহর ও আসর নামাযের চার রাকাআতে এবং ইশার নামাযের শেষ দুই রাকাআতে কিরাআত অনুচ্চ স্বরে পড়া হয়। তাহলে এই হাদীসদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জোরে কিরাআতের নামায এবং আস্তে কিরাআতের নামায কোনো নামাযেই মুকতাদী কিরাআত পড়বে না। একথা ঠিক নয় যে, মুকতাদী জোরে কিরাআতের নামাযে কিরাআত পড়বে না, কিন্তু আস্তে কিরাআতের নামাযে পড়বে।

দ্বিতীয় মতের পর্যালোচনা

দলীল-প্রমাণের নিরিখে এই মতটিও দুর্বল। আল্লামা ছানআনী (রহ.) নিজে গায়রে মুকাল্লিদ হওয়া সত্ত্বেও একথা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন। বুলূগুল মারাম এর ভাষ্যগ্রন্থ "সুবুলুস সালাম" কিতাবে বলেন—

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُوْنَ بِوُجُوْبِ قِرَاءَتِهَا خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقِيْلَ فِيْ مَحَلِّ سَكَتَاتِهِ بَيْنَ الْاٰيَاتِ، وَقِيْلَ فِيْ سُكُوْتِهِ بَعْدَ تَمَامِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَلَا دَلِيْلَ عَلٰى هٰذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ. (سبل السلام ج ١ ص ٢٨٧)

'ইমামের সাথে মুকতাদী কিরাআত পড়বে কি না–এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সূরা ফাতিহার প্রতি আয়াতের শেষে ইমাম যে বিরতি দিয়ে থাকেন সে সময় মুকতাদী সূরা ফাতিহা পড়বে। আবার কেউ বলেছেন, ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর যে বিরতি হয় মুক্তাদী তাতে সূরা ফাতিহা পড়বে। এ দুই মতের সপক্ষে শরীয়তের কোনো দলীল নেই।'

(সুবুলুস সালাম)

তৃতীয় মতের পর্যালোচনা

পাক-ভারতের গায়রে মুকাল্লিদগণ বলে থাকেন যে, "উচ্চ স্বরের কিরাআত কিংবা নিম্ন স্বরের কিরাআত উভয় প্রকার কিরাআতের নামাযে ইমামের সঙ্গে

মুকতাদীর কিরাআত পড়া অপরিহার্য।" এই মত শরীয়তের দলীল-প্রমাণের বিচারে নিতান্তই দুর্বল। কেননা, শরীয়তের প্রথম দলীল কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুকতাদীকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে— একথা কুরআনের কোথাও বলা হয়নি; বরং কুরআনে বলা হয়েছে, যখন (নামাযে) কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে হবে এবং চুপ থাকতে হবে।

শরীয়তের দ্বিতীয় দলীল হল হাদীস শরীফ। আর কোনো সহীহ হাদীসে একথা পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের পিছনে মুকতাদীকে প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়ার আদেশ দিয়েছেন। গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ এ বিষয়ে যে দলীলগুলো উপস্থিত করে থাকেন তা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে : হয়তো মারফূ হয় না, অথবা সহীহ হয় না, কিংবা তাতে জামাতে নামাযের কথা উল্লেখ থাকে না।

উল্লেখ্য, জামাতের নামাযে মুকতাদীর ফাতিহা পাঠ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি সহীহ বুখারীর জন্য যে মানদণ্ডের ভিত্তিতে হাদীস চয়ন করেছেন, এ পুস্তিকার জন্য সে মানদণ্ড ব্যবহার করেননি। তাই এ পুস্তিকায় অনেক "জয়ীফ" হাদীস রয়েছে। আবার কিছু হাদীস এমনও রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, জাহরী বা উচ্চ স্বরের কিরাআতের নামাযে মুকতাদী সূরা ফাতিহা পড়বে না। পরিতাপের বিষয় এই যে, গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই "জয়ীফ" বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত করেন। কিন্তু বর্ণনার মান উল্লেখ করেন না। এতে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যেহেতু বর্ণনাটি ইমাম বুখারীর পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত তাই এগুলোও "সহীহ বুখারী"র হাদীসের মতোই সহীহ। আবার এ পুস্তিকারই যে হাদীসগুলোতে জাহরী বা জোরে কিরাআতের নামাযে মুকতাদীর সূরা ফাতিহা না-পড়ার কথা আছে সেগুলোও তারা গোপন রাখেন। এখানে তাদের উদ্ধৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা পর্যালোচনাসহ উল্লেখ করা হল।

১. হযরত উবাদা (রা.)-এর বর্ণনা

হযরত উবাদা (রা.) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত পড়তে কষ্ট হয়েছিল। নামায শেষে তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'সম্ভবত তোমরা ইমামের পিছনে কুরআন পড়ে থাক।' আমরা হাঁ-বাচক উত্তর দিলাম। তিনি তখন বললেন, 'শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। কেননা, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না'।"

আলোচনা

গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের উপস্থাপিত দলীলগুলোর মধ্যে এ দলীলটি সবচেয়ে শক্তিশালী। তাই এ দলীলের অবস্থা থেকে অন্যগুলোর অবস্থাও অনুমান করা যাবে।

এই হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। সে সনদগুলোর মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক-এর সনদ অন্যগুলোর চেয়ে ভালো। কিন্তু এই ভালো সনদটি যেসব কারণে "জয়ীফ" তা এখানে উল্লেখ করা হল।

১. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.)কে অনেক মুহাদ্দিস ছিকাহ-গ্রহণযোগ্য বললেও অন্য অনেকে তার সম্পর্কে অত্যন্ত কঠিন মন্তব্যও করেছেন। দেখুন– মীযানুল ইতিদাল : ৩/৬৯; ৪/৪৭১

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, উপরোক্ত ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের মধ্যে ঘটেনি। ঘটেছে হযরত উবাদা (রা.) ও তাবেয়ীগণের মধ্যে। অর্থাৎ হযরত উবাদা (রা.) ইমাম ছিলেন আর তার মুকতাদী ছিলেন তাবেয়ীগণ। কিন্তু অন্য মারফূ হাদীসে এ ধরনের বিষয়বস্তু থাকায় কিছু শামদেশীয় বর্ণনাকারী ভুলক্রমে একেও মারফূ বানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ হযরত উবাদা (রা.)-এর কথাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এজন্যই ইমাম বুখারী (রহ.) 'সহীহ বুখারী'তে হযরত উবাদা (রা.)-এর হাদীস অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীর বর্ণনায় ইমামত-এর উল্লেখ নেই।

৩. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী (রহ.) 'জামাআতের নামাযে মুকতাদীর ফাতিহা পাঠ' বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে যে পর্যালোচনা রয়েছে তার সারকথা এই যে, হাদীসটির সনদে এবং মতনে 'ইজতিরাব' রয়েছে। সনদে আট ধরনের এবং মতনে তেরো ধরনের। আর 'ইজতিরাবে'র কারণে হাদীস জয়ীফ সাব্যস্ত হয়।

(দ্রষ্টব্য, মাআরিফুস সুনান : ৩/২০২)

৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন—

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ مُعَلَّلٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ بِأُمُوْرٍ كَثِيْرَةٍ. ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الأَئِمَّةِ.

"হাদীসবিশারদ ইমামগণের দৃষ্টিতে এই হাদীস বহু কারণে 'জয়ীফ'। ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ইমাম হাদীসটিকে 'জয়ীফ' বলেছেন।"

(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ২৩/২৮৬)

আল্লামা নীমাভী (রহ.) বলেন—

حَدِيْثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي الْتِبَاسِ الْقِرَاءَةِ قَدْ رُوِيَ بِوُجُوهٍ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.

"হযরত উবাদা (রা.)-এর সূত্রে 'কিরাআত পাঠে অসুবিধা হওয়ার' যে ঘটনা বর্ণনা করা হয় তার সবকটি সূত্রই জয়ীফ।" (আছারুস সুনান : ১/৭৯)

আছারুস সুনান-এর টীকায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

৫. শায়খ আলবানী সাহেবের গবেষণার প্রতি গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ আস্থাশীল। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, এ হাদীসের বিধান মানসূখ অর্থাৎ রহিত হয়েছে। তিনি نَسْخُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ (জাহরী নামাযে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ রহিত হওয়া) শিরোনামে লেখেন—

وَكَانَ قَدْ أَجَازَ لِلْمُؤْتَمِّينَ أَنْ يَقْرَؤُوا بِهَا وَرَاءَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ، ثُمَّ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا فِي الْجَهْرِيَّةِ.. وَجَعَلَ الْإِنْصَاتَ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ مِنْ تَمَامِ الْائْتِمَامِ، فَقَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَءَ فَأَنْصِتُوا.

"ইসলামের প্রথম দিকে জামাতের নামাযে ইমামের সঙ্গে মুকতাদীর সূরা ফাতিহা পড়ার অনুমতি ছিল। (এরপর হযরত উবাদা (রা.)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করে লেখেন) কিন্তু পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহরী বা জোরে কিরাআতের নামাযে মুকতাদীকে কিরাআত পড়তে বারণ করেন।... এবং ইমামের কিরাআত পাঠের সময় নিশ্চুপ থাকা 'ইকতিদা'র পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করে বলেন, 'ইমামকে ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার ইকতিদা করার জন্য। অতএব সে যখন তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে আর সে যখন কুরআন পড়ে তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকবে'।" (সিফাতু সালাতিন নাবী : পৃ. ৯৩)

মোটকথা, এ ধরনের রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের নির্দেশনা পরিত্যাগ করা যায় না।

২. গায়রে মুকাল্লিদদের দ্বিতীয় দলীল

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থ : 'যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না।'

জামাতের নামাযে মুকতাদীর কিরাআত পাঠের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে সাধারণত তারা এই হাদীসই উপস্থিত করে থাকেন। অথচ কোনো বিষয় প্রমাণ করতে হলে সে বিষয়ের সংশ্লিষ্ট আয়াত বা হাদীস পেশ করা উচিত। এখানে যে হাদীস উল্লেখিত হয়েছে তা জামাতের নামায সম্পর্কে এসেছে–তার কোনো দলীল এখানে নেই।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, কোনো বিষয়ের সকল হাদীস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শুধু এক দু'টি হাদীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়; সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে সংশ্লিষ্ট সকল আয়াত ও হাদীস সামনে রাখতে হয়। হাদীসবিশারদ ফকীহগণ তাঁদের গবেষণায় এই নীতিই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু আজকাল কিছু মানুষ গবেষণার নামে যা করে থাকেন তার সারকথা হল, কোনো বিষয়ের দু' চারটি হাদীস অধ্যয়ন করা এবং পূর্বের যুগের কোনো বিচ্ছিন্ন মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করা। এরপর এ ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যে, একমাত্র আমরাই হাদীস মোতাবেক আমল করছি। অতএব আমরাই হলাম প্রকৃত 'আহলে হাদীস'। বিষয়টি দুঃখজনক।

হাদীস শরীফের প্রকৃত অনুরাগী ও অনুসারী তারাই যারা প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী। পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরামের আমল ও কর্ম সম্পর্কেও অবগত। বস্তুত এঁদের পক্ষেই হাদীস শরীফের মর্ম অনুধাবন করা এবং হাদীসের শিক্ষা অনুসরণ করা সম্ভব।

জামাতের নামাযে মুকতাদীর ফাতিহা পাঠ বিষয়ে যদি কেবল উপরের হাদীসটি থাকত তাহলে হয়তো গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণের দাবি একটা সম্ভাবনার পর্যায়ে গ্রহণ করা যেত, কিন্তু এ প্রসঙ্গে আরো যেসব হাদীস রয়েছে তার আলোকে উপরোক্ত হাদীসের মর্ম নির্ধারিত হয়ে যায়। আর তা তাদের দাবিকে সমর্থন করে না।

১. ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, 'এই হাদীস একা নামায আদায়কারী সম্পর্কে এসেছে। কেননা, সাহাবী জাবির (রা.) হাদীসটির এ মর্মই বর্ণনা করেছেন।'

قَالَ أَحْمَدُ : فَهٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" أَنَّ هٰذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهٗ. (ترمذى : ترك القراءة ١/٧١)

২. ইমাম সুফিয়ান (ইবনে ওয়াইনা) (রহ.) বলেন, 'এই হাদীস একা নামায আদায়কারী সম্পর্কে বলা হয়েছে।' ইমাম আবু দাউদ (রহ.) 'সুনান' গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন।

"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا" قَالَ سُفْيَانُ : لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ. (أبو داود : لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب ١/١١٩)

তাহলে উপরোক্ত হাদীসের যে মর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বর্ণনা করেছেন, ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল যে মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী যে মর্ম বয়ান করেছেন তা পরিত্যাগ করার কী কারণ থাকতে পারে ?

দ্বিতীয় কথা এই যে, জামাতের নামাযে কিরাআত পাঠ প্রসঙ্গে আরো যেসব হাদীস রয়েছে তা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্যও যথেষ্ট। এজন্য এ সময় মুকতাদীকে নিশ্চুপ থাকার আদেশ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে উল্লেখিত দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ও নবম দলীলে বিষয়টি স্পষ্টভাবে রয়েছে। অতএব জামাতে নামায আদায়কারী মুকতাদী لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ-এর আওতায় আসে না। এই হাদীসে একা নামায আদায়কারী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে যদি সূরা ফাতিহা না পড়ে তবে তার নামায হবে না।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণ হয় যে, ইমামের কিরাআত মুকতাদীর জন্যও যথেষ্ট হয়। তিনি লেখেন—

وَقَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ إِنْصَاتَ الْمَأْمُومِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْقِرَاءَةِ مَعَهُ وَزِيَادَةً. (فتاوى ابن تيمية ج ٢٣، ص ٢٩٠)

'কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমামের কিরাআতের সময় নিশ্চুপ থাকা ইমামের সঙ্গে কিরাআতে শামিল থাকার সমার্থক। এক্ষেত্রে কিরাআতের পাশাপাশি আরো একটি বিষয় রয়েছে। তা হল, নিশ্চুপ থাকার শরয়ী আদেশ পালনের ছওয়াব।'

(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ২৩/২১০)

কুরআন-সুন্নাহর বিধান মোতাবেক যখন মুকতাদীর নিশ্চুপ থাকা অপরিহার্য তখন এই আদেশ পালন করে সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না এটা কীভাবে সম্ভব ?

তৃতীয় কথা এই যে, সহীহ মুসলিমে এই হাদীসের কোনো কোনো সনদে "فَصَاعِدًا" শব্দ রয়েছে। সে হিসেবে হাদীসের মর্ম হল, যে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা বা কিছু আয়াত পড়ে না তার নামায হয় না। অথচ গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ বলে থাকেন, "মুকতাদী শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে, ফাতিহার পর অন্য কিছু পড়বে না।" হাদীসটি যদি জামাতে নামায আদায়কারী মুকতাদীর সম্পর্কেই হয়ে থাকে তবে পূর্ণ হাদীসের উপরই আমল করা উচিত এবং হাদীস বর্ণনার সময় বিশ্বস্ততার সঙ্গে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করা উচিত।

সর্বশেষ কথা এই যে, কুরআন কারীম, হাদীসে নববী ও সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের আলোকে উপরোক্ত হাদীসের যে মর্ম নির্ধারিত হয় সে হিসেবে শরীয়তের সকল দলীলের মধ্যে অর্থ ও মর্মগত ঐক্য সাধিত হয়। সামগ্রিক মর্ম এই হয় যে, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ হাদীসটি একা নামায আদায়কারী সম্পর্কে বলা হয়েছে আর কিরাআতের সময় নিশ্চুপ থাকার আদেশ জামাতে নামায আদায়কারী মুকতাদীকে করা হয়েছে। অন্যদিকে গায়রে মুকাল্লিদগণ উপরোক্ত হাদীসের যে মর্ম গ্রহণ করেন সে হিসেবে কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য হাদীসের সঙ্গে এ হাদীসের মর্মগত সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় এবং তা দূর করার জন্য বহু হাস্যকর ব্যাখ্যা ও অজুহাতের অবতারণা করতে হয়। (এটা হচ্ছে পূর্বসূরী শরীয়তবিশারদ ও বর্তমান যুগের গায়রে মুকাল্লিদদের চিন্তা-নীতির একটি মৌলিক পার্থক্য।)

এ পর্যন্ত কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের আলোকে গায়রে মুকাল্লিদদের দাবি পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এমন কিছু 'আছারে সাহাবা' অর্থাৎ সাহাবীগণের ফতোয়া সম্পর্কেও আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলোকে তারা তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে কিছু মৌলিক কথা জেনে নেওয়া ভালো।

১. সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে বর্ণিত অধিকাংশ 'আছার' বা ফতোয়া এ সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, জামাতের নামাযে মুকতাদী ফাতিহা পড়বে না। আর কতক বর্ণনায় ফাতিহা পাঠের কথা পাওয়া যায়। সে বর্ণনাগুলোর শাস্ত্রীয় বিচারের আগে সাধারণ বিবেচনাতেও সেসব 'আছার' প্রাধান্য পাওয়ার কথা, যা সংখ্যায় অধিক এবং কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের সমার্থক।

২. শাস্ত্রীয় বিচারে দেখা যায় যে, গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের উপস্থাপিত অধিকাংশ 'আছার' সনদের বিচারে দুর্বল। অর্থাৎ ওই সাহাবীগণ এমন সিদ্ধান্ত

দিয়েছেন তা শক্তিশালী সূত্রে প্রমাণিত নয়। আগামী আলোচনা থেকে বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা যাবে।

১. আবু হুরায়রা (রা.)-এর বক্তব্য

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায অসম্পূর্ণ।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, যখন আমরা ইমামের পিছনে থাকব তখন কী করব ? হযরত আবু হুরায়রা বললেন— اِقْرَءْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ 'মনে মনে পড়বে।'... (এরপর তিনি সূরা ফাতিহার ফযীলত বয়ান করলেন।)

'জুযউল কিরাআত' কিতাবে রয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, 'ইমাম যখন পড়ে তখন তোমরাও পড়বে।'

আলোচনা

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে মতের দলীল শক্তিশালী তা-ই অনুসরণীয়। দলীল-প্রমাণের আলোচনা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসে জামাতের নামাযে মুকতাদীকে কিরাআত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে এবং নিশ্চুপ থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন মজীদের কোনো আয়াত এবং কোনো সহীহ মারফূ হাদীসে জামাতের নামাযে ফাতিহা পাঠের আদেশ দেওয়া হয়নি। জামাতের নামাযে মুকতাদীর ফাতিহা পাঠপ্রসঙ্গে যেসব দলীল পেশ করা হয় তা জয়ীফ বা দুর্বল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—

لٰكِنَّ الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ هُمْ جُمْهُوْرُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَمَعَهُمُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيْحَةُ، وَالَّذِيْنَ أَوْجَبُوْهَا عَلَى الْمَأْمُوْمِ فِيْ حَالِ الْجَهْرِ هٰكَذَا فَحَدِيْثُهُمْ قَدْ ضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. (تنوع العبادات ص ٥٤)

'মুসলিম উম্মাহর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের প্রধান ধারাটিই জামাতের নামাযে কিরাআত পড়তে নিষেধ করেছেন। কুরআন ও সহীহ হাদীসের সিদ্ধান্ত তাদের সঙ্গেই রয়েছে। অন্যদিকে যারা জাহরী নামাযে (জোরে কিরাআতের নামাযে) কিরাআত পাঠের মত প্রকাশ করেন তাদের উপস্থাপিত হাদীস ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং অন্যান্য ইমাম তাকে জয়ীফ বলেছেন।'

(তানাওউউল ইবাদাত পৃষ্ঠা ৫৪)

তাছাড়া এ বিষয়টিও স্বীকৃত যে, সাহাবীর ফতোয়া কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসের সমমর্যাদার নয়। এজন্য যে বিষয় কুরআন ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত তা-ই অগ্রগণ্য ও অনুসরণযোগ্য।

দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ফাতিহা পাঠের কথা বলেছেন, তবে অন্যদিকে বড় বড় সাহাবী থেকে ফাতিহা না-পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) এবং হযরত জাবির (রা.)-এর রেওয়ায়াত ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বশেষ কথা হল, হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস থেকে মুকতাদীর জন্য ফাতিহা পাঠের বিধান প্রমাণ করা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে হাদীসে উল্লেখিত একটি বাক্যের উপর। বাক্যটি হল— اِقْرَءْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ। এর তরজমা করা হয়েছে, 'ইমামের পিছনে অনুচ্চ স্বরে ফাতিহা পড়বে।' কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে, এ অর্থই উপরোক্ত বাক্যের একমাত্র অর্থ নয়। অন্য অর্থের সম্ভাবনাও এখানে রয়েছে। এ ধরনের বাক্য বুখারী-মুসলিমের অন্যান্য হাদীসে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এই হাদীস থেকে দাবি প্রমাণ করার গোটা প্রয়াসই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—

إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طَلَّقَ فِيْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (بخارى : الطلاق فى الاغلاق)

'আমার উম্মতের বৈশিষ্ট্য হল, তাদের মনে যা কিছু কল্পনা আসে আল্লাহ তাতে সাজা দিবেন না যদি না তা কাজে পরিণত করে কিংবা মুখে উচ্চারণ করে।' কাতাদা (রহ.) বলেন, 'কেউ যদি মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে এতে তালাক হয় না।' (সহীহ বুখারী : ২/৭৯৪)

এই হাদীসে 'মনে মনে বলা'কে "حَدِيْثُ النَّفْسِ" বলা হয়েছে।

কাতাদা (রহ.) 'মনে মনে তালাক প্রদান'কে "طَلَّقَ فِيْ نَفْسِهِ" শব্দে উল্লেখ করেছেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রিয়ার সঙ্গে "فِيْ نَفْسِهِ" শব্দটি যুক্ত হলে 'মনে মনে করা' অর্থ হয়ে থাকে। অতএব আলোচ্য হাদীসে "اِقْرَءْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ"

বাক্যে দু অর্থের যেকোনোটির সম্ভাবনা রয়েছে : 'অনুচ্চ স্বরে পাঠ করা' এবং 'মনে মনে পাঠ করা'। অতএব এই হাদীস দ্বারা উপরোক্ত দাবি প্রমাণ করা যায় না।

সহীহ মুসলিমের আরেকটি হাদীস লক্ষ করুন। এখানেও "فِي نَفْسِهِ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِيْ، إِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ. (مسلم : الحث على ذكر الله)

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আমি তার সঙ্গে তেমনই আচরণ করি এবং যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যদি সে আমাকে হৃদয়ে স্মরণ করে আমিও তাকে একান্তে স্মরণ করি। আর যদি সে মজলিসে আমার আলোচনা করে তবে তার চেয়ে উত্তম মজলিসে আমি তার আলোচনা করি'।" (সহীহ মুসলিম : ২/৩৪১)

এই হাদীসেও হৃদয়ে স্মরণ করাকে "ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ" শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর বক্তব্য

মুকতাদীর ফাতিহা পাঠ বিষয়ে নিম্নোক্ত বর্ণনাটিও উপস্থিত করা হয়ে থাকে।

ইয়াহইয়া বাক্কা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)কে জামাতের নামাযে মুকতাদীর ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হল। তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার মতে ফাতিহা পড়ায় কোনো দোষ নেই।' (জুযউল কিরাআহ)

আলোচনা

এই রেওয়ায়েতের সনদে ইয়াহইয়া ইবনে মুসলিম আল-বাক্কা নামক যে রাবী আছেন তাকে ইমাম ইবনে মায়ীন (রহ.) "জয়ীফ" বলেছেন।

(মীযানুল ই'তিদাল : ৪/৪০৯)

২. ইতোপূর্বে অষ্টম ও নবম দলীলের আলোচনায় সহীহ বর্ণনার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) মুকতাদীর ফাতিহা পাঠের

মত পোষণ করতেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর সিদ্ধান্ত ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, ওই মতটিই ইবনে উমর (রা.) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত। অতএব আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর মত হিসেবে এখানে যে কথাটি উল্লেখিত হয়েছে তা তাঁর মত মনে করা ঠিক নয়।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর বক্তব্য

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাইল বলেন, 'আমি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)কে মুকতাদীর ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছি। তিনি হাঁ বাচক উত্তর দিয়েছেন।'

(জুযউল ক্বিরাআহ)

আলোচনা

এই বর্ণনার সনদে ঈসা ইবনে আবু ঈসা নামক একজন রাবী রয়েছেন। ইনি জয়ীফ। ইমাম আহমদ (রহ.) ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) তার সম্পর্কে বলেছেন- "لَيْسَ بِالْقَوِيِّ" 'শক্তিশালী নয়।' ফাললাছ বলেন- "سَيِّءُ الْحِفْظِ" 'তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।' ইবনে হিব্বান বলেন- "يَنْفَرِدُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِيرِ" 'মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, যা অন্যদের বর্ণনায় পাওয়া যায় না।' ইমাম আবু যুরআ বলেন- "يَهِمُ كَثِيرًا" 'বর্ণনায় প্রচুর ভুল করেন।'

(মীযানুল ই'তিদাল : ৩/৩০৮)

হাদীসবিশারদ ইমামগণের মন্তব্য থেকে রাবীর এবং সেই সঙ্গে তার রেওয়ায়েতের মান অনুমান করা যাচ্ছে।

এ পর্যন্ত গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের কিছু প্রসিদ্ধ দলীল সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এখান থেকে অন্যান্য অপ্রসিদ্ধ দলীলগুলোর অবস্থা অনুমান করে নেওয়া কঠিন নয়। এখানে এমন কিছু বর্ণনাও উল্লেখিত হয়েছে, যা ইমাম বুখারী (রহ.) 'জুযউল কিরাআ' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরো স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর 'জুযউল কিরাআ' গ্রন্থ সহীহ বুখারীর মানে উত্তীর্ণ নয়।

উচ্চস্বরে আমীন বলা : কিছু বর্ণনা ও পর্যালোচনা

(১৭৮ পৃষ্ঠার পর)

এখানে কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা হল।

প্রথম বর্ণনা

উম্মুল হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত—

أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَالَ : وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ : آمِينَ، فَسَمِعَتْهُ وَهِيَ فِي صَفِّ النِّسَاءِ.

'তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম وَلَا الضَّالِّينَ বলে آمِينْ বললেন। উম্মুল হুসাইন মহিলাদের কাতারে থেকেও তাঁর আমীন বলা শুনতে পেলেন।'

(আল মু'জামুল কাবীর তবরানী : ২৫/১৫৮)

আলোচনা : এই হাদীসের সনদে একজন রাবী রয়েছে– ইসমাঈল ইবনে মুসলিম মক্কী। আল্লামা হাইছামী (রহ.) "মাজমাউয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃ. ২৬৪) এবং আল্লামা শাওকানী (রহ.) "নায়লুল আওতার" গ্রন্থে তাকে 'জয়ীফ' বলেছেন। আল্লামা মুবারকপুরী (রহ.) বলেন, "ইমাম ইবনুল মুবারক (রহ.) তাকে 'জয়ীফ' বলেছেন এবং ইমাম আহমদ (রহ.) 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন।" (তুহফাতুল আহওয়াজী : ২/৯৮)

দ্বিতীয় বর্ণনা

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত—

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ : آمِينَ. حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ. وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ : فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পড়ার পর আমীন বলতেন। প্রথম কাতারে যারা তাঁর নিকটে দাড়াত তারা তা শুনতে পেত।' ইবনে মাজার বর্ণনায় আরও আছে যে, 'এরপর আমীনের আওয়াজে মসজিদ গমগম করে উঠত।' (ইবনে মাজাহ : পৃষ্ঠা ৬২)

আলোচনা : এই বর্ণনায় একজন রাবী রয়েছেন– বিশর ইবনু রাফি। একে ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আহমদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবনে মায়ীন (রহ.) 'জয়ীফ' বলেছেন। (নাসবুর রায়াহ : ১/৩৭১)

ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন—

أَبُو الْأَسْبَاطِ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ قَدْ أَجْمَعُوا عَلٰى ضَعْفِهِ

"রিজালশাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, বিশর ইবনু রাফি জয়ীফ রাবী।"

এই সনদেই আরেকজন রাবী রয়েছেন– আবু আবদুল্লাহ ইবনু আম্মি আবী হুরায়রা। ইবনুল কাত্তান (রহ.) বলেন—

وَأَبُو عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا لَا يُعْرَفُ لَهٗ حَالٌ، وَلَا رَوٰى عَنْهُ غَيْرُ بِشْرٍ، وَالْحَدِيْثُ لَا يَصِحُّ مِنْ أَجْلِهِ

"আবু আবদুল্লাহ 'মাজহুল' রাবী। বিশর ইবনু রাফি ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ হাদীস সহীহ নয়।"

(নাসবুর রায়া : ১/৩৭১)

তৃতীয় বর্ণনা

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّهٗ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : آمِيْنَ، حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ.

"তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলতে শুনেছেন।"

আলোচনা : এই বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম আবু হাতিম (রহ.) বলেছেন, "هٰذَا عِنْدِيْ خَطَأٌ" 'আমার মতে বর্ণনাটি ভুল। সনদে 'ইবনে আবী লায়লা' নামক রাবী রয়েছে। ভুলটি তারই হয়েছে। তার স্মৃতি দুর্বল ছিল।

(আত-তালখীসুল হাবীর, পৃ. ২৩৮)

চতুর্থ বর্ণনা

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهٗ فَقَالَ آمِيْنَ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করতেন তখন উচ্চস্বরে আমীন বলতেন।' (সুনানে বায়হাকী : ২/ ৫৮)

আলোচনা : এই বর্ণনার মূল রাবী হল ইসহাক ইবনে ইবরাহীম। তার সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য লক্ষ করুন :

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ - قَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَذَّبَهُ مُحَدِّثُ حِمْصَ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ. (ميزان الاعتدال ج ١ ص ١٨١)

ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেছেন, "সে বিশ্বস্ত নয়।" ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেছেন, "হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সে কোনো বস্তুই নয়।" হিমসের মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে আউফ তাকে "মিথ্যাবাদী" বলেছেন। (মীযানুল ইতিদাল)

পঞ্চম দলীল ও আলোচনা

সবশেষে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জানার বিষয় এই যে, এই হাদীসে উচ্চ স্বরে 'আমীন' বলার কথা রয়েছে, কিন্তু তা ছিল শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে। হযরত ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা.)-এর বর্ণনায় শিক্ষা দানের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখিত হওয়ার কারণ হল, তিনি কিছু দিন অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। এজন্য শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ বিষয়টিও শিখিয়েছেন যে, সূরা ফাতিহা সমাপ্ত হওয়ার পর 'আমীন' বলা হয়। এভাবে শিক্ষা দানের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। মোটকথা, হযরত ওয়াইল (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে নামাযের সাধারণ নিয়মরূপে উচ্চ স্বরে 'আমীন' বলা প্রমাণ করা যায় না।

রাফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে কিছু মৌলিক কথা

(১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

'রাফয়ে ইয়াদাইন' বিষয়ে উল্লেখিত দু'টি মতের মধ্যে কোনটি অগ্রগণ্য তা বিবেচনা করার জন্য কিছু বিষয় সামনে থাকা প্রয়োজন।

প্রথম কথা : হাদীস শরীফে এসেছে যে, প্রথম দিকে নামাযে কথাবার্তা বলা বৈধ ছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায়

আগন্তুকের সালামের জবাব দিতেন। পরে এই বিধান বহাল থাকেনি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন—

كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا. (بخارى : ما ينهى عن الكلام)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত থাকলেও আমরা তাঁকে সালাম করতাম এবং তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিতেন। এরপর যখন আমরা নাজাসীর দেশ থেকে ফিরে এলাম তখন তাঁকে নামাযরত অবস্থায় সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি জওয়াব দিলেন না। নামায শেষে বললেন, 'নামাযে রয়েছে বিশেষ মগ্নতা'।" (সহীহ বুখারী : ১/১৬০)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, কোনো বিষয় হাদীসে বিদ্যমান থাকা এক কথা আর তা বিধানরূপে শেষ পর্যন্ত বহাল থাকা ভিন্ন কথা। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি প্রমাণ হয় না। যেমন কেউ যদি নামাযে কথা বলার হাদীসগুলো উল্লেখ করে দাবি করে যে, এখনও নামাযে কথাবার্তা বলা জায়েয এবং নামাযরত অবস্থায় সালামের জওয়াব দেওয়া সুন্নত তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, নামাযে কথা বলার বিষয়টি তো হাদীসে অবশ্যই পাওয়া যায়, তবে তা পরবর্তীতে বিদ্যমান থাকেনি। অতএব একথা বলা ঠিক নয় যে, এখনও নামাযে কথা বলা জায়েয। তদ্রূপ রুকূ ইত্যাদির সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করা হাদীস শরীফে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ এ প্রসঙ্গে যে দাবি করে থাকেন যে, বিষয়টি শেষ পর্যন্ত বহাল ছিল, এর সপক্ষে সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় না।

সুনানে বায়হাকীর রেওয়ায়াতদ্বারা এ দাবি প্রমাণ করা যায় না। কেননা রেওয়ায়াতটি জয়ীফ। এখানে ওই রেওয়ায়াত ও প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক আলোচনা পেশ করছি।

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللّٰهَ (بيهقى)

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ পর্যন্ত রাফয়ে ইয়াদাইনওয়ালা নামায পড়েছেন। (বায়হাকী, যায়লায়ী; নসবুর রায়া, পৃষ্ঠা ৪০৯)

আলোচনা : উল্লেখিত রেওয়ায়াত জয়ীফ হওয়ার কারণ এই যে, এর সনদে একাধিক জয়ীফ রাবী রয়েছে। একজন রাবী হল আবদুর রহমান ইবনে কুরাইশ ইবনে খুযায়মা। তার সম্পর্কে আল্লামা সুলাইমানী (রহ.) হাদীস জাল করার অভিযোগ দায়ের করেছেন। (মীযানুল ইতিদাল)

আরেক রাবী ইসমা ইবনে মুহাম্মাদ। তার সম্পর্কে হাদীস বিশারদদের মন্তব্য লক্ষ করুন–

قَالَ يَحْيَى : كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : حَدَّثَ بِالْبَوَاطِيلِ عَنِ الثِّقَاتِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ : مَتْرُوكٌ. (ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٦٨)

ইমাম ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, 'সে মিথ্যাবাদী, হাদীস তৈরি করত।' আল্লামা উকায়লী (রহ.) বলেন, 'সে নির্ভরযোগ্য রাবীদের বরাতে নানা ভিত্তিহীন কথা বর্ণনা করেছে।' আল্লামা দারাকুতনী (রহ.) বলেন, 'হাদীস বিশারদগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন।' (মীযানুল ইতিদাল)

২. প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলিম মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ নাসায়ী শরীফের টীকায় উল্লেখ করেন—

وَحَدِيثُ الْبَيْهَقِيِّ مَا زَالَتْ الخ ضَعِيفٌ جِدًّا (التعليقات السلفية ص ١٠٤)

'সুনানে বায়হাকীতে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি একেবারেই দুর্বল।'

(আত-তালীকাতুস সালাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১০৪)

মোটকথা, নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইনের নিয়ম শেষ পর্যন্ত বাকি থাকার যে দাবি গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ করে থাকেন তা কোনো স্পষ্ট ও শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। এজন্য তারা সাধারণত সেসব রেওয়ায়াত উপস্থিত করে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকেন যেখানে শুধু রাফয়ে ইয়াদাইনের কথা আছে। অথচ রাফয়ে ইয়াদাইনের উল্লেখ হাদীস শরীফে আছে– এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। যে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে তা এই যে, এই নিয়ম শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল কি না। যারা তা থাকার দাবি করেন তাদের কর্তব্য হল এই দাবির সপক্ষে স্পষ্ট দলীল উপস্থিত করা।

দ্বিতীয় কথা : রাফয়ে ইয়াদাইন বিষয়টি বোঝার জন্য এ বিষয়ক সকল হাদীস সামনে রাখা জরুরী। শুধু রাফয়ে ইয়াদাইনের বিবরণ সম্বলিত হাদীসগুলোর আলোকে বিচার করা হলেও দেখা যায় যে, নামাযে অন্তত ছয়

জায়গায় রাফয়ে ইয়াদাইনের কথা হাদীস শরীফে এসেছে : (১) নামাযের শুরুতে (২) রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ থেকে ওঠার সময় (৩) সাজদায় যাওয়ার সময় ও সাজদা থেকে ওঠার সময় (৪) প্রতি রাকাআতের শুরুতে (৫) প্রত্যেক তাকবীরের সময় (৬) সালাম ফেরানোর সময়। নিম্নোক্ত হাদীসগুলো লক্ষ করুন।

১. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (المحلى ج ٤ ص ٢٩٦)

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ ও সাজদায় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন।' (আল-মুহাল্লা : ৪/২৯৬)

মুহাদ্দিস আহমদ শাকির বলেছেন—

"وَهٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ جِدًّا"

এই হাদীসের সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। (তিরমিযী টীকা ২/৪২)

২. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ. (التلخيص الحبير ج ١ ص ٢١٩)

'তিনি নামাযের প্রত্যেক ওঠা-নামায় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন।'

(আল-তালখীসুল হাবীর : ১/২১৯)

৩. আহমদ শাকির (রহ.) মুসনাদে আহমদ-এর উদ্ধৃতিতে যাকওয়ান (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে—

كُلَّمَا كَبَّرَ وَرَفَعَ وَوَضَعَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (مسند احمد ٤/٣١٧)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক তাকবীর, প্রত্যেক ওঠা-নামা এবং দুই সাজদার মধ্যে রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন।

(মুসনাদে আহমদ ৪/৩১৭; আহমদ শাকির-এর তাহকীককৃত তিরমিযী : ২/৪২)

৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত—

إِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا سَجَدَ، وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ. (... المحلى ج ٤ ص ٢٩٧)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সূচনায়, রুকূতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে উঠে, সাজদায় যাওয়ার সময় এবং প্রতি দু'রাকাতের মাঝে রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন। (মুহাল্লা : ৪/২৯৭)

আলোচনা : গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা হাদীস অনুযায়ী আমল করার জোর দাবি করলেও হাদীসে উল্লেখিত উপরোক্ত ছয় স্থানের মধ্যে তারা রাফয়ে ইয়াদাইন করে থাকেন কেবল আড়াই স্থানে। নামাযের সূচনায়, রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ থেকে ওঠার সময় এবং তৃতীয় রাকাআতের শুরুতে। কিন্তু প্রত্যেক সাজদার সময়, প্রত্যেক তাকবীরের সময়, প্রতি রাকাআতে এবং সালামের সময় তারা রাফয়ে ইয়াদাইন করেন না। প্রশ্ন এই যে, এই পার্থক্য তারা কীসের ভিত্তিতে করেন ?

এ থেকে স্পষ্ট হয়, রাফয়ে ইয়াদাইনের সকল রেওয়ায়েতের উপর গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ নিজেরাও আমল করেন না। তাহলে যারা দলীলের ভিত্তিতে রুকূর সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করেন না তাদের উপর আপত্তি উত্থাপন করার কোনো নৈতিক অধিকার তাদের থাকে কি ? তাদের আপত্তির জবাবে খুব সহজেই বলে দেওয়া যায় যে, উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ যে কারণে রাফয়ে ইয়াদাইন করেন না সেই একই কারণে আমরা রুকূর ক্ষেত্রে রাফয়ে ইয়াদাইন করি না।

তৃতীয় কথা : আরেকটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য, যা এক শ্রেণীর বক্তা ও লেখকের বক্তৃতায় ও লেখায় পাওয়া যায়, এই যে, 'রাফয়ে ইয়াদাইন করার হাদীস বুখারী-মুসলিমে রয়েছে। কিন্তু রাফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস রয়েছে হাদীসের অন্যান্য কিতাবে। বুখারী, মুসলিমে নেই। আর যে হাদীস বুখারী মুসলিমে রয়েছে তা অন্যান্য কিতাবের হাদীসের চেয়ে অগ্রগণ্য।'

পর্যালোচনা : ১. রাফয়ে ইয়াদাইন বিষয়ক সকল হাদীস সামনে রাখলে প্রতীয়মান হয় যে, যেসব রেওয়ায়েতে রাফয়ে ইয়াদাইন করার কথা এসেছে সেগুলো হল ইসলামের প্রথম দিকের বিধান সম্বলিত রেওয়ায়াত। অতএব এগুলো যে কিতাবেই থাক এর দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায় না।

২. রাফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস বুখারী-মুসলিমে নেই– এই দাবি ভুল। কেননা সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতিতে হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে একটি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, যাতে রাফয়ে ইয়াদাইন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৩. উপরোক্ত 'নীতি' অর্থাৎ সহীহ্ বুখারীর হাদীস শুধু এ কারণেই অগ্রগণ্য যে তা সহীহ বুখারীতে রয়েছে, একটি হুজুগে শ্লোগান হতে পারে, ইলমে হাদীসের নীতি হতে পারে না। কেননা, স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)ও এই দাবি করেননি যে, তারা তাদের গ্রন্থে সকল সহীহ হাদীস সংকলিত করতে সক্ষম হয়েছেন; বরং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বাইরেও অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। তাহলে শাস্ত্রীয় বিচারে দুইটি হাদীস 'সহীহ' মানে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও শুধু সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমে সংকলিত হওয়ার কারণে একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেওয়া কীভাবে সঠিক হতে পারে?

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সকল সহীহ হাদীস সংকলিত হয়নি– একথা স্বয়ং ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন—

مَا أَدْخَلْتُ فِيْ كِتَابِ الْجَامِعِ إِلَّامَا صَحَّ، وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ مَخَافَةَ الطُّوْلِ.

"আমি 'আল-জামিউস সহীহ'তে শুধু সহীহ হাদীসই সংকলিত করেছি এবং গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।"

(তাদরিবুর রাবী : ১/৮৩)

ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন—

لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِيْ صَحِيْحٌ وَضَعْتُهُ هٰهُنَا، إِنَّمَا وَضَعْتُ هُنَا مَا أَجْمَعُوْا عَلَيْهِ

"আমার বিচারে যে হাদীসগুলো সহীহ তার সবগুলো আমি এখানে সংকলিত করিনি। কেবল সে হাদীসগুলোই সংকলন করেছি যেগুলো সম্পর্কে তাদের (হাদীস বিশারদগণের) ঐকমত্য রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম : ১/১৭৪)

দ্বিতীয় কথা এই যে, গায়রে মুকাল্লিদগণ 'রাফয়ে ইয়াদাইন' প্রসঙ্গে এসে এই শ্লোগানের আশ্রয় গ্রহণ করতে চান, কিন্তু 'উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ পড়া' প্রসঙ্গে গিয়ে তারাই এই নীতি বিসর্জন দিয়ে দেন। কেননা, বুখারী ও মুসলিমের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীন সূরা ফাতিহার পূর্বে অনুচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন। একটি সহীহ হাদীসেও একথা পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ পড়েছেন। অথচ গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ উচ্চ স্বরেই বিসমিল্লাহ পড়ে থাকেন। তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে, বুখারী-মুসলিমের হাদীসকে অন্য সকল হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার সেই নীতি এখানে কেন অনুসৃত হল না?

চতুর্থ কথা : ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীস সংকলিত করেছেন। এই হাদীসগুলো চয়ন করতে গিয়ে তিনি যে কঠিন মানদণ্ড অনুসরণ করেছেন তা তাঁর অন্যান্য সংকলন যথা 'রিসালা রাফউল ইয়াদাইন', 'রিসালা কিরাআত খালফাল ইমাম' ইত্যাদিতে অনুসরণ করেননি। তাই হাদীস-গ্রন্থাবলির মধ্যে সহীহ বুখারীর যে মর্যাদা তাঁর অন্যান্য কিতাবের সে মর্যাদা নয়। এমনকি এগুলো 'কুতুবে সিত্তার' অন্যান্য কিতাবের সমপর্যায়েরও নয়। তাঁর সে রচনাবলিতে অনেক জয়ীফ হাদীসও রয়েছে। কিন্তু একশ্রেণীর গায়রে মুকাল্লিদ বক্তা ইমাম বুখারীর সেসব রচনা থেকে হাদীস বর্ণনা করে বারবার ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে সাধারণ জনগণকে এই ধারণা দেওয়ার প্রয়াস পেয়ে থাকেন যে, এই বর্ণনাগুলোও সহীহ বুখারীর হাদীসের সমপর্যায়ের। এগুলো যে ইমাম বুখারীর অন্যান্য কিতাব থেকে গৃহীত–এ বিষয়টি তারা সযত্নে গোপন রাখেন। এ বিষয়ে শ্রোতা ও পাঠকবৃন্দের সচেতন থাকা প্রয়োজন।

পঞ্চম কথা : গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ সাধারণ জনগণের সামনে এই ধারণা প্রচার করেন যে, রুকূর সময় 'রাফয়ে ইয়াদাইন' না-করা সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই। কিন্তু দলীল-প্রমাণের আলোচনায় এসে তারাও এই সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, 'রাফয়ে ইয়াদাইন' না-করাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। কিছু দৃষ্টান্ত :

১. প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম সাইয়েদ নাযীর হুসাইন দেহলবী (রহ.) লেখেন, 'হক্কানী আলিমদের কাছে অবিদিত নয় যে, রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে ওঠার সময় 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা মূর্খতা ও হঠকারিতার পরিচায়ক। কেননা, 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করা বা না করা দুই পদ্ধতিই দলীলদ্বারা প্রমাণিত (এরপর এ বিষয়ক দলীলসমূহ উল্লেখ করার পর লেখেন) মোটকথা, 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করা এবং 'রাফয়ে ইয়াদাইন না-করা' দুইটিই রেওয়ায়েতে এসেছে।' (ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ : ১/১৪১, ১৪৩)

২. প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ গবেষক মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ নাসায়ী শরীফের টীকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাফয়ে ইয়াদাইন না করা বিষয়ক হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন—

فَالْوَجْهُ أَنَّ الْحَدِيْثَ ثَابِتٌ لٰكِنْ يَكْفِيْ فِيْ إِضَافَةِ الصَّلَاةِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنُهُ صَلّٰى هٰذِهِ الصَّلَاةَ أَحْيَانًا، وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادِرُ الْاِعْتِيَادَ وَالدَّوَامَ، فَيَجِبُ الْحَمْلُ عَلٰى كَوْنِهَا كَانَتْ أَحْيَانًا تَوْفِيْقًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَدَفْعًا لِلتَّعَارُضِ، وَعَلٰى هٰذَا فَيَجُوْزُ أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ إِمَّا لِكَوْنِ التَّرْكِ سُنَّةً كَالْفِعْلِ، أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ... وَالْإِنْصَافُ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ لَاسَبِيْلَ إِلٰى رَدِّ رِوَايَاتِ الرَّفْعِ بِرِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَفِعْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَدَعْوٰى عَدَمِ ثُبُوْتِ الرَّفْعِ، وَلَا إِلٰى رَدِّ رِوَايَاتِ التَّرْكِ بِالْكُلِّيَّةِ وَدَعْوٰى عَدَمِ ثُبُوْتِهِ. (التعليقات السلفية ص ١٢٣ ص ١٢٦)

"বস্তুত হাদীসটি সহীহ, তবে এই (নিয়মের) নামায 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায' আখ্যা দেওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো এই (নিয়মে) নামায পড়েছেন। অতএব উপরোক্ত হাদীসের সাধারণ অর্থ যদিও এই হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা রাফয়ে ইয়াদাইন ছাড়া নামায পড়তেন, কিন্তু এখানে এ ব্যাখ্যাই করা হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো কখনো এরূপ নামায পড়েছেন, যাতে উভয় নিয়মের হাদীসের মধ্যে অর্থগত সংঘর্ষ না থাকে। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে ওঠার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার কারণ এই হতে পারে যে, রাফয়ে ইয়াদাইন না-করাও একটি সুন্নত পদ্ধতি যেরূপ রাফয়ে ইয়াদাইন করা একটি সুন্নত পদ্ধতি। কিংবা এটা বোঝানোর জন্য যে, নামাযে রাফয়ে না করারও অবকাশ আছে।'... ন্যায়সঙ্গত কথা এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বিবরণ ও আমল দ্বারা 'রাফয়ে ইয়াদাইন' বিষয়ক বর্ণনাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না এবং সেগুলো অগ্রহণযোগ্য হওয়ার দাবি করা যায় না। তদ্রূপ 'রাফয়ে ইয়াদাইন' না-করা বিষয়ক হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যান

করা কিংবা 'রাফয়ে ইয়াদাইন' না-করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়– এই দাবি করাও সম্ভব নয়।" (আত-তালীকাতুস সালাফিয়্যাহ)

৩. মুহাদ্দিস আহমদ শাকির (রহ.) গায়রে মুকাল্লিদদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তবে তিনি রাফয়ে ইয়াদাইন বিষয়ক হাদীসগুলোকে এভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, যখন কিছু হাদীস একটি বিষয় বিদ্যমান থাকা প্রমাণ করে আর অন্য কিছু হাদীস না-থাকা, তখন সেই রেওয়ায়াতগুলোই প্রাধান্য পেয়ে থাকে যা বিষয়টির বিদ্যমানতা প্রমাণ করে। তিনি লেখেন—

وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَى تَرْكَ الرَّفْعِ إِلَّا مَا قُلْنَا "أَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِيْ" (ترمذى محقق ج ٢ ص ٤٢)

অর্থাৎ, যে রেওয়ায়াতগুলোতে রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার কথা আছে সেখানে আপত্তিকর কিছু নেই। এই রেওয়ায়াতগুলো সম্পর্কে আমরা এই ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারি যে, 'বিদ্যমানতা প্রকাশক হাদীস অগ্রগণ্য হয়ে থাকে অবিদ্যমানতা প্রকাশক হাদীসের চেয়ে।'

মোটকথা, এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, গায়রে মুকাল্লিদদের দায়িত্বশীল আলিমগণ এই স্বীকৃতি প্রদান করেছেন যে, 'রাফয়ে ইয়াদাইন' না-করাও একটি সুন্নত পদ্ধতি এবং তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আহমদ শাকির (রহ.)-এর উল্লেখিত নীতি সম্পর্কে এই প্রশ্ন ওঠা খুবই যৌক্তিক যে, সহীহ হাদীসে সাজদার সময় এবং অন্যান্য সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করা এবং না-করা দুই-ই রয়েছে। তো উপরোক্ত নীতি অনুসারে রাফয়ে ইয়াদাইন সম্বলিত হাদীসগুলোর প্রাধান্য হয়ে সে স্থানগুলোতেও রাফয়ে ইয়াদাইন অপরিহার্য হয়ে যায়। অথচ এক্ষেত্রে ওই নীতি কার্যকর হচ্ছে না! যে নীতি সাজদার সময় রাফয়ে ইয়াদাইনের হাদীসকে প্রাধান্য দানে অকার্যকর থাকে তা রুকূর সময় সে বিষয়কে প্রাধান্য দানে কীভাবে কার্যকর হয়ে যায়–এ প্রশ্ন খুবই যৌক্তিক।

ষষ্ঠ কথা : অনেকে সরলমনা জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য বলে থাকেন যে, 'রুকূতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে ওঠার সময় এবং তৃতীয় রাকাআতের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইন করা সম্পর্কে চার শ' হাদীস বর্ণিত হয়েছে।' কখনো বলেন, 'রাফয়ে ইয়াদাইন বিষয়ক রেওয়ায়াত পঞ্চাশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত

হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদীন ও আশারায়ে মুবাশশারাহ অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী থেকেও তা বর্ণিত হয়েছে।'

এই প্রচারণা সম্পর্কে বলব, 'রাফয়ে ইয়াদাইন' সম্পর্কে চার শ' হাদীস বিদ্যমান থাকার যে কথা তারা বলে থাকেন তা ভিত্তিহীন। যারা এ দাবি করে থাকেন তাদের কর্তব্য হল, বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রমাণ করা। বিগত হাজার বছরের সুদীর্ঘ সময়ে যদি কোনো ব্যক্তি সেই চার শ' হাদীস কোথাও সংকলিত করে থাকেন তবে তারা সেই সংকলনটি প্রকাশ করতে পারেন, কিংবা নিজেরাই ওই হাদীসগুলো সংকলন করে জনগণের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। তবে একথা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, এ কাজ তারা কিয়ামত পর্যন্ত করতে সক্ষম হবেন না।

২. পঞ্চাশ সাহাবী থেকে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' বর্ণিত হওয়ার বিষয় রুকূতে যাওয়া, রুকূ থেকে ওঠা ও তৃতীয় রাকাতের সূচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়; এ হাদীসগুলো এসেছে নামাযের শুরুতে যে রাফয়ে ইয়াদাইন হয় অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলা প্রসঙ্গে।

শাওকানী (রহ.) গায়রে মুকাল্লিদ হয়েও একথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন—

وَجَمَعَ الْعِرَاقِيُّ عَدَدَ مَنْ رَوَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ، فَبَلَغُوا خَمْسِيْنَ صَحَابِيًّا، مِنْهُمُ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُوْدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ. (نيل الأوطار ج ٢ ص ١٩١)

'আল্লামা ইরাকী (রহ.) নামাযের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইন বিষয়ক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের সংখ্যা গণনা করেছেন। তাদের সংখ্যা হল পঞ্চাশ। এঁদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীও রয়েছেন।'

(নায়লুল আওতার : ২/১৯১)

একই কথা সানআনী (রহ.)ও 'সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগুল মারাম' গ্রন্থে বলেছেন—

قَالَ الْمُصَنِّفُ : إِنَّهُ رَوَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ خَمْسُوْنَ صَحَابِيًّا مِنْهُمُ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُوْدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَاكِمِ : لَا أَعْلَمُ سُنَّةً اتَّفَقَ عَلَى رِوَايَتِهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُوْدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعَ تَفَرُّقِهِمْ فِي الْبِلَادِ الشَّاسِعَةِ غَيْرَ هٰذِهِ السُّنَّةِ. (سبل السلام ج ١ ص ٢٧٤)

"গ্রন্থকার (হাফেয ইবনে হাজার রহ.) বলেন, 'নামাযের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইনের বিষয়টি পঞ্চাশজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, যাঁদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সেই দশ সাহাবীও রয়েছেন। বায়হাকী (রহ.) হাকেম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নামাযের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইন করা এমন একটি আমল, যা খুলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশশারাহ এবং অন্যান্য সাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন যদিও তারা বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিক্ষিপ্ত ছিলেন'।"

(সুবুলুস সালাম : ১/২৭৪)

তাছাড়া ইতোপূর্বে আল্লামা নীমাভী (রহ.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন করা খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে প্রমাণিত নয়। (আছারুস সুনান : ১/১১১)

মোটকথা, যে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' পঞ্চাশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে নামাযের শুরুতে অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত ওঠানো। এর বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ও আশারায়ে মুবাশশারাও রয়েছেন। প্রশ্ন হল, এই বাস্তবতা গোপন রেখে বিষয়টি এমনভাবে আলোচনা করা, যার দ্বারা শ্রোতা ধারণা লাভ করে যে, পঞ্চাশজন সাহাবী রুকূতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে ওঠার সময় এবং তৃতীয় রাকাআতের সূচনাতে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করার কথা বর্ণনা করেছেন, ইলমী আমানতদারীর পরিচায়ক হবে কি ?

সপ্তম কথা : গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ হযরত ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা.) ও হযরত মালিক ইবনুল হুআইরিছ (রা.)-এর বর্ণনাকে ভিত্তি বানিয়ে বলে থাকেন, এঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছেন তাঁর জীবনের শেষ দিকে অথচ তাঁরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে রুকূর সময় 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করার কথা আছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, উপরোক্ত দুই সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসা পর্যন্ত নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন ছিল।

আলোচনা : উপরোক্ত দু'জন সাহাবীর রেওয়ায়াতকে যদি কেবল এজন্য আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয় যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিকে তাঁর নিকটে এসেছিলেন তবে তো তারা নামাযের যে যে স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন উল্লেখ করেছেন সব স্থানেই রাফয়ে ইয়াদাইন করা উচিত। হযরত ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র এবং হযরত মালিক ইবনুল হুআইরিছ থেকে সাজদায় যাওয়ার সময়, সাজদা থেকে ওঠার সময় এবং প্রত্যেক তাকবীরের সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করার বিবরণ বর্ণিত আছে। নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো দেখুন।

১. মালিক ইবনে হুআইরিছ (রহ.) থেকে বর্ণিত—

رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ. (المحلى ج ٤ ص ٢٩٦)

'তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখেছেন, রুকূতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে, সাজদার যাওয়ার সময় এবং সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে।'

(মুহাল্লা ইবনে হাযম : ৪/২৯৬)

২. ওয়াইল ইবনে হুজর (রহ.) বলেন—

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيْهِ : ثُمَّ سَجَدَ، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ. (المحلى ج ٤ ص ٢٩٦)

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়েছি। রাসূলুল্লাহ সাজদার সময় তাঁর চেহারা মোবারক দুই হাতের মধ্যে রেখেছেন এবং সাজদা থেকে মাথা ওঠানোর পরও রাফয়ে ইয়াদাইন করেছেন।'

(মুহাল্লা ইবনে হাযম : ৪/২৯৬)

৩. মুহাদ্দিস আহমদ শাকির বলেন—

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيْثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : كُلَّمَا كَبَّرَ، وَرَفَعَ، وَوَضَعَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (ترمذى محقق ج ٢ ص ٤٢)

'মুসনাদে আহমদে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরের সময়, প্রত্যেক ওঠা-নামা এবং দুই সাজদার মধ্যেও রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন।'

কিছু রেওয়ায়েত ও পর্যালোচনা

এখানে গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের কিছু দলীল ও সেগুলোর প্রেক্ষাপট উল্লেখ করছি যা সাধারণত সাধারণ মানুষের অগোচরে থেকে যায়।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়াত

গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা রাফয়ে ইয়াদাইন বিষয়ে সাধারণত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর রেওয়ায়াত পেশ করে থাকে।

এই রেওয়ায়াত প্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন তা এই যে, সহীহ সনদে এসেছে, এ রেওয়ায়েতের যিনি রাবী– অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)– তিনি নিজেও নামাযে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করতেন না। বলাবাহুল্য, তিনিই এ রেওয়ায়েতের বিষয়বস্তু ও তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বেশি অবগত ছিলেন। ইবনে উমরের বিশিষ্ট শিষ্য মুজাহিদ বলেন—

مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ.

(مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٢٣٧ ، وهذا سند صحيح. الجوهر النقي ٧٤/٣)

'আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)কে নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখিনি।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২৩৭)

(অন্য দিকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর অন্যান্য শাগরিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) দু' নিয়মেই নামায পড়েছেন। কখনো রাফয়ে ইয়াদাইন করেছেন, কখনো করেননি।)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনা পর্যালোচনার সময় আরো একটি বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। তা এই যে, রাফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে যেসব বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে এটাও পাওয়া যায় যে, তিনি নামাযের শুরুতে, রুকূতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে ওঠার পর, সাজদায় যাওয়ার সময় এবং দুই রাকাতের মাঝে রাফয়ে ইয়াদাইন করেছেন। (অর্থাৎ একসময় তার আমল এরূপ ছিল।)

ইবনে হাযমকৃত 'মুহাল্লা' গ্রন্থে (৩/১০) এসেছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا سَجَدَ، وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ.

(المحلى : ٢٩٧/٤)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নামাযের শুরুতে, রুকূতে যাওয়ার সময়, সামিআল্লাহ বলার সময়, সাজদায় যাওয়ার সময় এবং প্রতি দু' রাকাআতের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন।

অন্যদিকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে উমর (রা.) সাজদার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তদ্রূপ ইতোপূর্বে উল্লেখিত সহীহ

বর্ণনায় মুজাহিদ (রহ.) থেকে জানা গেছে যে, নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রগুলোতেও তিনি রাফয়ে ইয়াদাইন করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সকল রেওয়ায়েত বিবেচনায় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, প্রথম দিকে তার আমল বিভিন্ন রকম থাকলেও সর্বশেষ আমল তা-ই ছিল যা মুজাহিদ (রহ.)-এর বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে। হানাফীগণ এই নিয়মই অনুসরণ করে থাকেন।

গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, কোনো কোনো বর্ণনায় ইবনে উমর (রা.) থেকে সাজদার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করার কথা এসেছে। আপনারা সে সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করেন না কেন ? তারা তখন উত্তর দিয়ে থাকেন, সহীহ বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে উমর পরবর্তীতে সাজদার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন পরিত্যাগ করেছিলেন। এই উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খেদমতে আরয এই যে, সহীহ বর্ণনায় রয়েছে, ইবনে উমর (রা.) নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে রাফয়ে ইয়াদাইন পরিত্যাগ করেছিলেন। এই সহীহ বর্ণনাটি অবলম্বন করাও কি আপনাদের কর্তব্য নয় ?

মোটকথা, রাফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে ইবনে উমর (রা.)-এর সকল বর্ণনা সামনে রাখা না হলে বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় দলীল

গায়রে মুকাল্লিদ ব্যক্তিগণ সাধারণত বলে থাকেন যে, রাফয়ে ইয়াদাইন বহু সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চাশ সাহাবী থেকে রাফয়ে ইয়াদাইন বর্ণিত হওয়ার যে বক্তব্য তারা প্রদান করে থাকেন তার হাকীকত ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

রাফয়ে ইয়াদাইনকারী সাহাবীর সংখ্যা বেশি দেখাবার জন্য তারা যে নিয়ম অনুসরণ করেন তার আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। হযরত আবু হুমাইদ ছায়িদী (রা.) একবার দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে নামায পড়িয়েছেন এবং সে নামাযে তিনি রাফয়ে ইয়াদাইন করেছেন। গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ রাফয়ে ইয়াদাইনকারী সাহাবীদের সংখ্যা গণনা করার সময় সেই দশ সাহাবীকেও অন্যান্য সাহাবীর সঙ্গে গণনা করে থাকেন।

তাদের অনুসৃত নিয়ম অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, প্রায় সকল সাহাবীর আমল এই ছিল যে, তারা নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। কেননা, আমরা ইতোপূর্বে হযরত উমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর আমল উদ্ধৃত করেছি। তাঁরা দু'জনই খলীফাতুল মুসলিমীন ছিলেন এবং নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। অন্য সকল সাহাবী বিভিন্ন সময় তাদের পিছনে নামায পড়েছেন। অতএব তারা

সবাই রাফয়ে ইয়াদাইন-না-করা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপন না করলেও দু'জন খলীফার আমল এবং অন্যদের অনাপত্তি থেকে একথা অত্যন্ত মজবুতভাবে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইন করা উচিত, পরে নয়।

ইমাম তহাবী (রহ.) বলেন—

وَفِعْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰذَا وَتَرْكُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ عَلٰى ذٰلِكَ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ عَلٰى أَنَّ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِيْ لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ. (طحاوى : رفع اليدين)

'হযরত উমর (রা.) রাফয়ে ইয়াদাইন না-করা এবং অন্য সকল সাহাবীর অনাপত্তি একথা প্রমাণ করে যে, এ পদ্ধতিটি সঠিক। এর বিরোধিতা করা কারো জন্যই উচিত নয়।' (তহাবী শরীফ : ১/১৬৪)

তৃতীয় দলীল

কেউ কেউ সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.) থেকে বর্ণিত একটি দুর্বল রেওয়ায়াতকে অবলম্বন করে বলে থাকে, হযরত উমর (রা.) রুকূর সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন। রেওয়ায়াতটি এই–

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ. (البيهقى)

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, 'আমি উমর (রা.)কে দেখেছি, তিনি নামাযের শুরুতে কাঁধ বরাবর হাত ওঠাতেন এবং রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ থেকে ওঠার সময়ও হাত ওঠাতেন।' (নসবুর রায়া ১/৪১৭)

এই বর্ণনা নিতান্তই দুর্বল। কেননা এর সনদে রিশদীন ইবনু সা'দ নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, যার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য হল–

قَالَ أَبُوْ زُرْعَةَ : ضَعِيْفٌ، قَالَ الْجُوْزَجَانِيُّ : عِنْدَهُ مَنَاكِيْرُ كَثِيْرَةٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَتْرُوْكٌ. (الميزان ج ٢ ص ٤٩)

ইমাম আবু যুরআ (রহ.) বলেন, 'রিশদীন ইবনে সা'দ দুর্বল বর্ণনাকারী।' জুযাজানী বলেন, 'তার অনেকগুলো 'মুনকার' বর্ণনা রয়েছে।' ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন, 'মাতরূক' (পরিত্যক্ত) রাবী।' (মীযানুল ইতিদাল)

খুতবার ভাষা : কিছু যুক্তি ও পর্যালোচনা

(২৫২ পৃষ্ঠার পর)

জেনে রাখা ভালো যে, গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ তাদের কর্মরীতির ধর্মীয় ভিত্তি অন্বেষণের জন্য বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে থাকেন। যথা :

১. খুতবার উদ্দেশ্য হল ওয়াজ-নসীহত। কিন্তু শ্রোতারা যদি আরবী ভাষা না বোঝে তাহলে খুতবার এই উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

পর্যালোচনা : (ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, তাদের কিছু অথবা সকল শ্রোতা অনারব ছিলেন। তবু তারা দুই খুতবা আরবী ভাষায় দিয়েছেন। তাহলে যা সে যুগে অনারবী ভাষায় খুতবা দেওয়ার শরীয়তসম্মত প্রয়োজন বিবেচিত হয়নি তা পরবর্তী যুগে কীভাবে প্রয়োজন বিবেচিত হবে ?

(খ) উপরের যুক্তি কুরআনের আলোকেও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, কুরআন গোটা মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (يونس : ٥٧)

'হে লোকসকল! তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশ ও অন্তরের সকল ব্যাধির উপশম। আর হিদায়েত ও রহমত মুমিনদের জন্য।' (সূরা ইউনুস : ৫৭)

তাহলে যখন কুরআন আরবী ভাষায় হওয়া তার উপদেশ ও পথনির্দেশ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না তখন খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া তার উপদেশ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক কেন হবে ?

(গ) স্থানীয় ভাষায় খুতবা দেওয়ার কারণ যদি এ-ই হয় যে, শ্রোতাদেরকে কথাগুলো বোঝাতে হবে আর তা স্থানীয় ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কোনোভাবেই সম্ভব নয় তাহলে দ্বিতীয় খুতবাও তো স্থানীয় ভাষায়ই হওয়া উচিত। অথচ গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা প্রথম খুতবা স্থানীয় ভাষায় দিলেও দ্বিতীয় খুতবা আরবী ভাষায় দিয়ে থাকেন। এখন হয়তো তাদের এই যুক্তিকেই ভুল বলতে হয় কিংবা বলতে হয় যে, তারাও এই যুক্তি মোতাবেক পুরোপুরি আমল করেন না।

২. যদি জুমআর ইমাম আরবী ভাষায় খুতবা দিতে অক্ষম হয় এবং সেখানে আরবী ভাষায় খুতবা দিতে সক্ষম অন্য কেউ না থাকে তাহলে এই অক্ষমতার কারণে স্থানীয় ভাষায় খুতবা দেওয়া যাবে। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্তও তাই।

এখানে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ যখন তাদের এক খুতবা স্থানীয় ভাষায় ও অপর খুতবা আরবী ভাষায় দেওয়ার সপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ ও আছারে সাহাবা থেকে কোনো দলীল উপস্থিত করতে সক্ষম হন না তখন হানাফী মাযহাবের এই সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করতে চান। অথচ এখানেও এমন কিছু নেই, যা তাদের ধারণাকে সমর্থন করে। কেননা, হানাফী মাযহাবের ওই সিদ্ধান্ত অক্ষমতার অবস্থায় প্রযোজ্য, সাধারণ অবস্থায় নয়। এজন্য হানাফী মাযহাবের অনুসারী খতীবগণ দুই খুতবা আরবী ভাষায় দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে গায়রে মুকাল্লিদ লোকেরা আরবী ভাষায় খুতবা প্রদানে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অনারবী ভাষায় খুতবা দিয়ে থাকেন। অতএব হানাফী মাযহাবের উপরোক্ত মাসআলা থেকে গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের ধারণা প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই।

এখানে আরেকটি বিষয়ও রয়েছে। তা এই যে, গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা এক খুতবা স্থানীয় ভাষায়, অপর খুতবা আরবী ভাষায় দিয়ে থাকেন। অথচ অক্ষমতার অবস্থায় হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হল উভয় খুতবা স্থানীয় ভাষায় দিবে।

(খ) হানাফীগণ যেহেতু শরীয়তের সকল বিষয়ে হাদীস ও সুন্নাহর পূর্ণ অনুসারী তাই তারা সুন্নাহ মোতাবেক উভয় খুতবা আরবী ভাষায় দিয়ে থাকেন। জুমআর দিনের জমায়েতের দিকে লক্ষ রেখে স্থানীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় দ্বীনী আলোচনা পেশ করলেও তা খুতবার অংশ গণ্য করেন না। গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ যেহেতু এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন তাই সুন্নাহ অনুসরণের বিবেচনায় হোক বা হানাফী মাযহাব অনুসরণের বিবেচনায়, তাদেরও এ নিয়ম অনুসরণ করা উচিত।

আল্লাহ তাদেরকে সুন্নত খুতবা সুন্নতী ভাষায় দেওয়ার তাওফীক দান করুন।

তারাবী-তাহাজ্জুদ এক নামায নয়

(২৭৫ পৃষ্ঠার পর)

প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভালো যে, গায়রে মুকাল্লিদদের দায়িত্বশীল আলিমগণও মনে করেন, তারাবী ও তাহাজ্জুদ ভিন্ন দুই নামায। এ প্রসঙ্গে মশহুর গায়রে মুকাল্লিদ আলিম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর একটি আলোচনা উল্লেখযোগ্য। আবদুল্লাহ চকরালভী নামক এক হাদীস অস্বীকারকারী যখন তারাবী-তাহাজ্জুদ এক নামায হওয়ার কথা প্রচার করতে আরম্ভ করে তখন তিনি

এর প্রতিবাদ করে যে কথাগুলো লিখেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করছি। তিনি লেখেন, "এই সুস্পষ্ট জবাব পেয়েও ওই মৌলভী সাহেব (চকরালভী) তা মানতে রাজি হননি; বরং জবাবের 'জবাব' তৈরির অনেক চেষ্টা করেছে। তার সকল চেষ্টার সারকথা এই যে, প্রথম রাতের নামায এবং শেষ রাতের নামায বস্তুত একই নামায, দুই নামায নয়। তারাবী, যা প্রথম রাতে পড়া হয়, তার অপর নাম তাহাজ্জুদ। এ কথার জবাবে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এ দাবির সপক্ষে কোনো দলীল নেই, বরং বিপক্ষে দলীল রয়েছে। কেননা, 'তাহাজ্জুদ' শব্দের অর্থই হল ঘুম থেকে জেগে নামায আদায় করা। কামূসে রয়েছে, تَهَجَّدَ - إِسْتَيْقَظَ অর্থ : 'সে ঘুম থেকে জাগ্রত হল।'

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনায় যে কথা রয়েছে, অর্থাৎ—

"مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে ও রমযানের বাইরে এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না।' তা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, প্রথম রাত ও শেষ রাতের নামায একই নামায; বরং এ হাদীস থেকে শুধু এটুকু প্রমাণ হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগারো রাকাআত নামায পড়তেন।

(ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, আহলে হাদীস কা মাযহাব : পৃ. ৯২–৯৩)

২. রমযান মাসে ইশার সঙ্গে তারাবী নামায পড়ার পর তাহাজ্জুদ পড়া যাবে কি না– এ প্রশ্নের উত্তরে ফাতাওয়া ছানাইয়্যায় যা বলা হয়েছে তা হুবহু উদ্ধৃত করছি।

প্রশ্ন : যে রমযান মাসে ইশার সময় তারাবী নামায পড়ল সে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে কি না?

উত্তর : পারবে। কেননা, তাহাজ্জুদের সময়ই হচ্ছে সুবহে সাদিকের আগে। প্রথম রাতে তাহাজ্জুদ হয় না।

প্রশ্ন : রমযান মাসে তারাবী ও তাহাজ্জুদ দুই নামায থাকে, না তারাবী নামাযই তাহাজ্জুদের স্থলবর্তী হয়ে যায়?

উত্তর : যদি তারাবী প্রথম রাতে আদায় করা হয় তবে তা শুধু তারাবী বলে গণ্য হয়। আর শেষ রাতে পড়লে তা তাহাজ্জুদেরও স্থলবর্তী হয়। (ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, ফাতাওয়া ছানাইয়্যাহ : ১/৬৮২, ৬৫৪)

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তর থেকে যে বিষয়গুলো জানা যাচ্ছে তা এই–

১. যে প্রথম রাতে তারাবী পড়ে সে শেষ রাতে তাহাজ্জুদও পড়তে পারে। যেহেতু আজকাল সকল মানুষ প্রথম রাতেই তারাবী পড়ে থাকে তাই তাদের শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া উচিত।

২. তাহাজ্জুদের সময় হল রাতের শেষ ভাগে।

৩. প্রথম রাতের ইবাদতকে তাহাজ্জুদের স্থলবর্তী বলা যায় না।

৪. কেউ যদি কখনো শেষ রাতে তারাবী পড়ে তবে তা তাহাজ্জুদেরও স্থলবর্তী হবে। এ কথার ব্যাখ্যা আরও স্পষ্টভাবে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর কিতাব "আহলে হাদীস কা মাযহাব" পৃ. ৯৩-এ রয়েছে যে, 'তারাবী তাহাজ্জুদের স্থলবর্তী হওয়ার কারণে এই দুটি এক নামায হওয়া প্রমাণিত হয় না। যেমন জুমআর নামায জোহরের স্থলবর্তী হওয়ায় জুমআ-জোহর এক নামায প্রমাণিত হয় না।'

উপরোক্ত আলোচনার পর আশা করি, কোনো ভুল ধারণার অবকাশ থাকবে না এবং রমযান মাসের পূর্ণ খায়ের ও বরকত লাভের বিষয়ে আগ্রহী হওয়া আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের পক্ষেও সহজ হবে।

শেষ কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দয়া ও অনুগ্রহের জযবায় হৃদয় আজ কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তাঁরই তাওফীকে 'নামাযে পয়াম্বর' রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এ পুস্তকের তথ্য-সংগ্রহের কাজ মদীনা মুনাওয়ারায় সম্পন্ন হয়েছিল। গ্রন্থনা ও বিন্যাসের সূচনা বায়তুল্লাহর ছায়ায় মাকামে ইবরাহীমের নিকটে। প্রথম দিকের কিছু অংশ এবং শেষের আলোচনাগুলো মসজিদে নববীতে রিয়াজুল জান্নাহ্তে বসে লেখা হয়েছে। আর আজ বায়তুল্লার শীতল ছায়ায় এর সমাপ্তি হচ্ছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

এ পুস্তকের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলো থেকেই পরিষ্কার হয়েছে যে, এ পুস্তকের সকল আলোচনার মূল সূত্র হল কুরআনুল কারীম, সহীহ হাদীস ও আছারে সাহাবা। এতে যে বিষয়গুলো সামনে আসে তা হল, এই নামায সম্পূর্ণ সুন্নাহ্ সম্মত। আর ফিকহে হানাফীর মূল সূত্র কুরআন, সুন্নাহ ও আছারে সাহাবা। আর অদূরদর্শী কিছু মানুষের বিভ্রান্তি ও একশ্রেণীর আলেমেরও প্রচারণা যে, ফিকহে হানাফী ইমাম আবু হানীফার ব্যক্তিগত মতামতের সংকলন- সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

সবশেষে দুআ এই যে, আল্লাহ তাআলা সকলকে কুরআন-সুন্নাহ্র আনুগত্য করার এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও সালাফে সালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দিন। সঠিক চিন্তাশক্তি দান করুন। আর সালাফের বিরুদ্ধাচরণ, তাঁদের সম্পর্কে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে এবং অহঙ্কার ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সবাইকে রক্ষা করুন।

اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

মুহাম্মদ ইলিয়াস ফয়সল

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে আজ ২৯ জুমাদাল উলা ১৪২৯ হিজরী, বুধবার, বিকাল চারটা দশ মিনিটে 'নামাযে পয়াম্বর'-এর অনুবাদ (নবীজীর নামায) সম্পন্ন হল। পুরো কিতাবের অনুবাদ আরও আগে সমাপ্ত হলেও শেষ কটি পৃষ্ঠা রয়েই গিয়েছিল। বর্ণ বিন্যাস ও সজ্জায়নের শেষ পর্যায়ে এসে আজ এ পৃষ্ঠাগুলোরও অনুবাদ সমাপ্ত হল।

ওয়া লিল্লাহিল হামদু আওয়ালান ওয়া আখিরান।

– অনুবাদক

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পরিশিষ্ট– ২

এ অধ্যায়ে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেবের তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে "মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি", "সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা" এবং "সহীহ হাদীসের আলোকে ঈদের নামায।" –প্রকাশক

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি

ভূমিকা ঃ আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের উদ্দেশ্যে। বিশেষ হেকমতের কারণেই মানুষকে দুটি শ্রেণীভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও মহিলা। তারা মানুষ হিসেবে সমান। তাদের মাঝে মানুষ হিসেবে কোন তারতম্য নেই। তবে শারীরিক গঠন, সক্ষমতা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, নিরাপত্তা এবং সতর ও পর্দা সহ বেশ কিছু বিষয়ে বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যের এ দিকটিকেও বাহ্যিক জীবন যাপনে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি ইবাদতের ক্ষেত্রেও কোন কোন পর্যায়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ওইসব ইবাদতের অন্যতম হল নামায। গ্রহণযোগ্য কোন দলীল ও যুক্তির ওপর ভিত্তি না করেই কোন কোন মহলের পক্ষ থেকে নারী-পুরুষের নামাযের এই পার্থক্য অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলেই এ বিষয়ে দলীল ও যুক্তিভিত্তিক কিছু আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমরা মনে করি, অপরাপর কিছু ইবাদত ও মাসআলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মাঝের সর্বসম্মত ও স্বতঃসিদ্ধ পার্থক্যসমূহের উদাহরণ ও গ্রহণযোগ্য দলীলসমূহের ধারাবাহিক উপস্থাপন, আলোচনার কার্যকারিতা ও সফল বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। তাই আমরা সেভাবেই অগ্রসর হতে চাই। দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার হুকুম এক; কিন্তু এমন অনেক মাসআলা রয়েছে যেখানে মহিলাদের হুকুম পুরুষদের থেকে ভিন্ন। আর সেক্ষেত্রে কারো মাঝেই কোন মতভেদ নেই। যেমন :

১. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উপরই হজ্জ ফরয; কিন্তু মহিলাদের জন্য পথখরচ ছাড়াও হজ্জের সফরে স্বামী বা মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি শর্ত।

২. ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা নিষেধ; অথচ মহিলাদের জন্য ইহরাম অবস্থায়ও মাথা ঢেকে রাখা ফরয।

৩. ইহরাম খোলার সময় পুরুষ মাথা মুণ্ডাবে; কিন্তু মহিলার মাথা মুণ্ডানো নিষেধ।

৪. হজ্জ পালনের সময় পুরুষ উচ্চ আওয়াজে 'তালবিয়া' পাঠ করে; অথচ মহিলার জন্য নিম্ন আওয়াজে পড়া জরুরি।

এই সব মাসআলার মতই একটি হল নামাযের মাসআলা। নামাযের বেশ কিছু আহকামে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন ঃ

১. ইমাম ও খতীব পুরুষই হতে পারে। মহিলা ইমাম ও খতীব হতে পারে না।

২. আযান শুধু পুরুষই দেয়; মহিলাকে মুয়াজ্জিন বানানো জায়েয নয়।

৩. ইকামত শুধু পুরুষই দেয়; মহিলা নয়।

৪. পুরুষের জন্য জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা; অথচ মহিলাকে মসজিদ ও জামাআতের পরিবর্তে ঘরের ভেতরে (قَعْرُ الْبَيْتِ) নামায পড়ার হুকুম করা হয়েছে।

৫. সতরের মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্য রয়েছে; সে কথা বলাই বাহুল্য।

৬. নামাযে সতর্ক করার মত কোন ঘটনা ঘটলে সতর্ক করার জন্য কিংবা অবহিত করার জন্য পুরুষকে তাসবীহ পড়ার হুকুম করা হয়েছে; অথচ মহিলাদের জন্য হুকুম হল 'তাসফীক' করা তথা হাতে শব্দ করে অবহিত করা।

৭. জুমার নামায শুধু পুরুষের উপর ফরয; মহিলার উপর নয়।

উপরোক্ত মাসআলাসমূহে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, অনেকগুলো কাজ সুন্নত বা ফরয হওয়া সত্ত্বেও মহিলাদের সতর ও পর্দার বিধানকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের জন্য স্বতন্ত্র হুকুম দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ নামায আদায়ের পদ্ধতির মধ্যেও মহিলাদের সতর ও পর্দার বিশেষ বিবেচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু জায়গায় শরীয়ত মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র হুকুম নির্ধারণ করেছে।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমরা চার ধরনের দলীলের আলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি পুরুষদের থেকে ভিন্ন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। وَبِاللّٰهِ تَعَالٰى التَّوْفِيْقُ

প্রথমত হাদীস শরীফের আলোকে।

দ্বিতীয়ত আসারে সাহাবা তথা সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও কর্মের আলোকে।

তৃতীয়ত তাবেয়ী ইমামগণের ঐকমত্যের আলোকে।

চতুর্থত চার ইমামের ঐকমত্যের আলোকে।

সবশেষে আমরা একথাও উল্লেখ করব যে, খোদ গায়রে মুকাল্লিদ আলেমরাও– যাদের কথিত অনুসারীরা এ পার্থক্যটিকে আজ মানতে চান না– মহিলাদের নামাযের পার্থক্যের এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এর ভিত্তিতেই তাদের ফতওয়া বিদ্যমান।

হাদীস শরীফের আলোকে

হাদীস ঃ ১

قَالَ الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْمَرَاسِيلِ لَهُ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ "سُنَنِهِ" : أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلاَنَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، فَقَالَ : "إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ". (سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ فَهُوَ عِنْدَهُ صَالِحٌ. وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ. عَضَدَهُ مَا فِي هٰذَا الْبَابِ مِنْ مَوْصُولٍ وَآثَارٍ وَإِجْمَاعٍ وَصَرَّحَ الشَّيْخُ نَاصِرُ الْأَلْبَانِيُّ فِي سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ أَنَّهُ لاَ عِلَّةَ فِيهِ سِوَى الْإِرْسَالِ)

"তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব (রহ.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মত নয়।" (কিতাবুল মারাসিল, ইমাম আবু দাউদ ৫৫, হাদীস ৮০)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আওনুল বারী" (১/৫২০)তে লিখেছেন, 'উল্লিখিত হাদীসটি সকল ইমামের উসূল অনুযায়ী দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্য।'

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী 'সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম' গ্রন্থে (১/৩৫১, ৩৫২) এই হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলার সিজদার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

হাদীস ঃ ২

أَبُو مُطِيعٍ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَلْخِيُّ. عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلٰى فَخِذِهَا الْأُخْرٰى. وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ : يَا مَلاَئِكَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا"

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَنِ الْكُبْرٰى" ٢ : ٢٢٣ فِيْ كِتَابِ الصَّلَاةِ (بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ تَرْكِ التَّجَافِيْ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)" وَأَعَلَّهُ بِأَبِيْ مُطِيْعٍ الْبَلْخِيِّ وَلٰكِنَّ الصَّحِيْحَ فِيْهِ عِنْدَنَا قَوْلُ الْعُقَيْلِيِّ : "كَانَ مُرْجِئًا صَالِحًا فِي الْحَدِيْثِ إِلَّا أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ أَمْسَكُوا عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ" نَقَلَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ "لِسَانِ الْمِيزَانِ" ٣ : ٢٤٨.

قَالَ الرَّاقِمُ : أَمَّا إِرْجَاؤُه فَهُوَ إِرْجَاءُ السُّنَّةِ. كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كِتَابُهُ الَّذِيْ رَوَاهُ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ كِتَابُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ، فَإِذَا ظَهَرَ أَنَّ إِمْسَاكَ مَنْ أَمْسَكَ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ كَانَ لِأَجْلِ الْإِرْجَاءِ الْمَزْعُوْمِ، فَلَا عِبْرَةَ بِهٰذَا الْإِمْسَاكِ. وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْعُقَيْلِيُّ أَنَّهُ كَانَ صَالِحًا فِي الْحَدِيْثِ. فَافْهَمْ.

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন (ডান) উরু অপর উরুর উপর রাখে। আর যখন সিজদা করবে তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে; যা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আল্লাহ তাআলা তাকে দেখে (ফেরেশতাদের সম্বোধন করে) বলেন, ওহে আমার ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" (সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/২২৩, অধ্যায় : সালাত, পরিচ্ছেদ : মহিলার জন্য রুকূ ও সিজদায় এক অঙ্গ অপর অঙ্গ থেকে পৃথক না রাখা মুস্তাহাব। এটি হাসান হাদীস।

হাদীস : ৩

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَمَّتِيْ أُمَّ يَحْيٰى بِنْتَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيْهَا عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَمِّهَا، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ : جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : فَسَاقَ الْحَدِيْثَ. وَفِيْهِ : "يَا وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ! إِذَا

صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا".

(رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ج ٢٢ ص ١٩-٢٠، قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي "مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ" ج ٢ ص ٢٧٢ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي مَنَاقِبِ وَائِلٍ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ حُجْرٍ. عَنْ عَمَّتِهَا أُمِّ يَحْيَى بِنْتِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَلَمْ أَعْرِفْهَا. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ". انْتَهَى.

قَالَ الرَّاقِمُ : وَفِي الْإِسْنَادِ تَعْرِيفُ كَاشِفٍ عَنْ هٰذِهِ الْمَرْأَةِ. وَهِيَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَابِعِيَّةً، وَالْمَسْتُورُ مِنْ هٰذِهِ الطَّبَقَةِ مُحْتَجٌّ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ. لَا سِيَّمَا وَلِحَدِيثِهَا هٰذَا شَوَاهِدُ مِنَ الْأُصُولِ وَالْآثَارِ)

"হযরত ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলাম, তখন তিনি আমাকে (অনেক কথার সাথে একথাও) বললেন, হে ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র! যখন তুমি নামায শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হাত উঠাবে বুক বরাবর।" (আল মুজামুল কাবীর, তাবারানী ২২/২৭২, এই হাদীসটিও হাসান)

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কিছু কিছু হুকুমের মধ্যে মহিলার নামায আদায়ের পদ্ধতি পুরুষের নামায আদায়ের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। বিশেষত ২ নং হাদীসটি দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মহিলার নামায আদায়ের শরীয়ত নির্ধারিত ভিন্ন এই পদ্ধতির মধ্যে ওই দিকটিই বিবেচনায় রাখা হয়েছে যা তার সতর ও পর্দার পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী।

উল্লেখ্য, এই সব হাদীসের সমর্থনে মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতির পার্থক্য ও ভিন্নতাকে নির্দেশ করে এমন আরো কিছু হাদীস রয়েছে। পক্ষান্তরে এগুলোর সাথে বিরোধপূর্ণ একটি হাদীসও কোথাও পাওয়া যাবে না, যাতে বলা হয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নেই; বরং উভয়ের নামাযই এক ও অভিন্ন।

সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে

১. খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রাযি.)-এর বক্তব্য

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ "إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتَلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا" رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "الْمُصَنَّفِ"

وَاللَّفظُ لَه. وابنُ أبِي شيبة فِي المصنفِ أيضاً" وإسنادُه جيِّد، وَالصَّوابُ فِي الحَارِثِ هُوَ التَّوثِيقُ.

"হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যেন খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে।" (আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক ৩/১৩৮, অনুচ্ছেদ : মহিলার তাকবীর, কিয়াম, রুকূ ও সিজদা' আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ২/৩০৮; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/২২২)

২. মহিলাদের জন্য জড়সড় হয়ে নামায পড়ার এ হুকুমটি শুধু সিজদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পুরো নামাযেই এর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা এবং এ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা জরুরি। ইমাম ইবনে আবী শায়বা 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন–

حدثنا أبو عبدِ الرحمنِ المقرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ (أبِي) أيوبَ، عَنْ يزِيدَ بنِ (أبِي) حَبِيبٍ. عَنْ بكيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بنِ الأشجِّ. عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عَنْ صَلاةِ المرأةِ، فقَالَ : "تجتمِعُ وتحتفِزُ". (رواه ابن أبي شيبة، ورجاله ثقات)

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, মহিলা কীভাবে নামায আদায় করবে? তিনি বললেন, খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে।" (আল-মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ১/৩০২)

প্রথম বক্তব্যটি খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রা.)-এর; দ্বিতীয় বক্তব্যটি মুসলিম উম্মাহ্‌র ফকীহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর। এ দু'জন সাহাবী মহিলাদের নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, আমাদের জানা মতে কোনো হাদীস গ্রন্থের কোথাও একজন সাহাবী থেকেও এর বিপরীত কিছু বিদ্যমান নেই।

মোটকথা, খলীফায়ে রাশেদের সুন্নাহ্ ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহ্‌র আলোকেও একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহিলাদের নামায কিছু কিছু বিষয়ে পুরুষের নামায থেকে ভিন্ন। আর এই ভিন্নতার ভিত্তি হল মহিলাদের সতর ও পর্দার অধিক সংরক্ষণের বিবেচনা।

তাবেয়ীগণের বক্তব্যের আলোকে

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে নামায শিক্ষা করেছেন সাহাবায়ে কেরাম; আর তাঁদের নিকট থেকে তাবেয়ীগণ। হাদীসে

রাসূল ও সুন্নতে সাহাবার পর এখন আমরা দেখাতে চাচ্ছি তাবেয়ী ইমামগণ মহিলাদের নামাযের কোন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। পুরুষদের মতই; নাকি কিছু বিষয়ে পুরুষদের থেকে ভিন্ন। এ সম্পর্কে মশহুর তাবেয়ী ইমামগণের ফতোয়া নিম্নে উল্লেখ করা হল, যাঁরা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরবর্তীদের কাছে পৌছে দিয়েছেন।

১. আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.) [মৃত্যু ১১৪ হিজরী] মক্কাবাসীদের ইমাম।

ইমাম ইবনে আবী শায়বা (রহ.) বর্ণনা করেন–

قَالَ هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ لَنَا قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ : حَذْوَ ثَدْيَيْهَا".

"হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হল, নামাযে মহিলা কতটুকু হাত উঠাবে? তিনি বললেন, 'বুক বরাবর'।" (আল-মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ১/২৭০)

ইমাম ইবনে আবী শায়বা (রহ.) আরো বর্ণনা করেন–

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : تُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ كَالرَّجُلِ؟ قَالَ : لَا تَرْفَعُ بِذٰلِكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا، جَمَعَهُمَا إِلَيْهِ جِدًّا، وَقَالَ : إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ وَإِنْ تَرَكَتْ ذٰلِكَ فَلَا حَرَجَ.

"ইবনে জুরাইজ (রহ.) বলেন, আমি আতা ইবনে আবী রাবাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলা তাকবীরের সময় পুরুষের সমান হাত তুলবে? তিনি বললেন, মহিলা পুরুষের মত হাত উঠাবে না। এরপর তিনি (মহিলাদের হাত তোলার ভঙ্গি দেখালেন এবং) তাঁর উভয় হাত (পুরুষ অপেক্ষা) অনেক নিচুতে রেখে শরীরের সাথে খুব মিলিয়ে রাখলেন এবং বললেন, মহিলাদের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন। তবে এমন না করলেও অসুবিধা নেই।" (আল-মুসান্নাফ : ১/২৭০)

২. মুজাহিদ ইবনে জাব্র রহ. (মৃত্যু ১০৪ হিজরী) মক্কাবাসীদের আরেক ইমাম।

ইবনে আবী শায়বা (রহ.) বর্ণনা করেন–

عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ.

"হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবর (রহ.) পুরুষের জন্য মহিলার মত উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সিজদা করাকে অপছন্দ করতেন।" (আল মুসান্নাফ, প্রাগুক্ত; পরিচ্ছেদ মহিলা সিজদায় কীভাবে থাকবে ১/৩০২)

৩. ইবনে শিহাব যুহরী রহ. (মৃত্যু ১২৪ হিজরী) মদীনাবাসীদের ইমাম।

ইমাম ইবনে আবী শায়বা (রহ.) বর্ণনা করেন–

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَرفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا.

"যুহরী (রহ.) বলেন, 'মহিলা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে'।" (আল-মুসান্নাফ ১/২৭০)

৪. হযরত হাসান বসরী রহ. (মৃত্যু ১১০ হিজরী) বসরাবাসীদের ইমাম।

৫. হযরত কাতাদাহ ইবনে দিআমা রহ. (মৃত্যু ১১৮ হিজরী) বসরাবাসীদের ইমাম।

আবদুর রাযযাক ও ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেন–

عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا.

"হযরত হাসান বসরী ও হযরত কাতাদা (রহ.) বলেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা রেখে সিজদা দিবে না; যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে।" (আল-মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক ৩/১৩৭; আল-মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১/৩০৩)

৬. হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. (৯৬ হিজরী) কুফাবাসীদের ইমাম।

ইবনে আবী শায়বা (রহ.) বর্ণনা করেন–

عَنْ إِبْرَاهِيمَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا وَلْتَضَعْ بَطْنَهَا عَلَيْهِمَا.

"ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) বলেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন যেন সে উভয় উরু মিলিয়ে রাখে এবং পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে।" (আল-মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ১/৩০২)

আবদুর রাযযাক (রহ.) বর্ণনা করেন–

عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَهَا وَبَطْنَهَا عَلَى فَخِذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ، وَلَا تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ، لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا.

"হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) আরো বলেন, মহিলাদের আদেশ করা হত তারা যেন সিজদা অবস্থায় হাত ও পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে, পুরুষের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা না রাখে; যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে।" (আল-মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক ৩/১৩৭)

উল্লেখ্য, ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি ভিন্ন এবং সে যুগে ওই পদ্ধতি অনুযায়ীই তাদেরকে নামায শিক্ষা দেওয়া হত। كَانَتْ শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, এই ধারা পূর্ব থেকে চলে এসেছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই এই তালীমের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং স্বভাবত সে অনুযায়ী মহিলা সাহাবীগণ নামায আদায় করতেন।

৭. খালেদ ইবনে লাজলাজ রহ., (মৃত্যু দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে) সিরিয়াবাসীদের ইমাম।

ইবনে আবী শায়বা (রহ.) বর্ণনা করেন-

عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلٰى أَوْرَاكِهِنَّ يُتَّقٰى ذٰلِكَ عَلٰى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهَا الشَّيْءُ

"হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ (রহ.) বলেন, মহিলাদেরকে আদেশ করা হত তারা যেন নামাযে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসে। পুরুষদের মত না বসে। আবরণযোগ্য কোন কিছু প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় মহিলাদেরকে এমনটি করতে হয়।"

(আল-মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ১/৩০৩)

উপরোক্ত বর্ণনায় মহিলাদের বসার পদ্ধতি নির্দেশ করে تَرَبُّعْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আবুল ওয়ালীদ বাজী (রহ.) 'মুয়াত্তা'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আলমুনতাকা"য় লিখেছেন, "تَرَبُّعْ" শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে : এক. চারজানু হয়ে বসা। দুই. উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসা। অর্থাৎ বাম পা ডান উরু ও গোছার নিচে রাখবে। আর ডান পায়ের পাতা বিছানো থাকবে, আর পায়ের পাতার পিঠ কিবলার দিকে থাকবে।"

(আওজাযুল মাসালিক ২/১১৮)

উপরোক্ত বর্ণনায় দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। বিশেষত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস, যা পরবর্তীতে উল্লেখ করব এবং হযরত

ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)-এর পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে একথাই বুঝে আসে। যদি ধরেও নেওয়া হয় এখানে تَرَبُّع এর প্রথম অর্থই (চারজানু হয়ে বসা) উদ্দেশ্য; তাতেও প্রমাণিত হয় যে, পুরুষ ও মহিলার বসার পদ্ধতি এক নয়। কারণ একথা সকলেরই জানা আছে যে, পুরুষের জন্য চারজানু হয়ে বসা সুন্নতের পরিপন্থী ও মাকরূহ।

পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলো ছাড়াও আয়িম্মায়ে তাবেয়ীনের আরো কিছু বর্ণনা রয়েছে যার দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহিলার নামায পুরুষের নামায থেকে ভিন্ন। পক্ষান্তরে কোন একজন তাবেয়ী ইমাম থেকেও এর বিপরীত বক্তব্য প্রমাণিত নেই।

মোটকথা তাবেয়ী-যুগে যারা ইমাম এবং ইসলামী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় তাদের মতামত থেকে প্রমাণিত হল যে, মহিলা ও পুরুষের নামাযের পদ্ধতি অভিন্ন মনে করা ভুল, সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতামতের সাথে এই ধারণার কোন মিল নেই।

চার ইমামের ফিকহের আলোকে

ফিকহে ইসলামী কুরআন-সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যা ও তার প্রায়োগিক পদ্ধতি সংরক্ষণ করে। কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বিধি-বিধান সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করা এবং 'মুজমাল' আহকামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা ফিকহে ইসলামীর মূল দায়িত্ব।

ফিকহে ইসলামীর চারটি সংকলন উম্মতের মাঝে প্রচলিত। অর্থাৎ ফিকহে হানাফী, ফিকহে মালেকী, ফিকহে হাম্বলী ও ফিকহে শাফেয়ী। এই চার ফিকহের ইমামদের মাঝে বিভিন্ন মাসআলায় দলীলভিত্তিক ইখতিলাফও হয়েছে; কিন্তু আলোচিত বিষয়ে তাদের ভাষ্য ও বক্তব্য এক অর্থাৎ মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে ভিন্ন।

ফিকহে হানাফী

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অন্যতম প্রধান শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন–

أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ تَجْمَعَ رِجْلَيْهَا فِيْ جَانِبٍ وَلَا تَنْتَصِبْ اِنْتِصَابَ الرَّجُلِ.

"আমাদের নিকট মহিলাদের নামাযে বসার পছন্দনীয় পদ্ধতি হল উভয় পা একপাশে মিলিয়ে রাখবে, পুরুষের মত এক পা দাঁড় করিয়ে রাখবে না।"

(কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মাদ ১/৬০৯)

মুহাদ্দিস আবুল ওয়াফা আফগানী (রহ.) 'কিতাবুল আসার' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন–

رَوٰى إِمَامُنَا الأَعْظَمُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : كُنَّ يَتَرَبَّعْنَ ثُمَّ أُمِرْنَ أَنْ يَحْتَفِزْنَ .

أَخْرَجَهُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ وَالْأُشْنَانِيُّ وَابْنُ خُسْرُوْ مِنْ طَرِيْقِهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ. رَاجِعْ جَامِعَ الْمَسَانِيْدِ : جـ ١ صـ ٤٠٠) "وَهٰذَا أَقْوَى وَأَحْسَنُ مَا رُوِيَ فِيْ هٰذَا الْبَابِ، وَلِذَا احْتَجَّ بِهِ إِمَامُنَا وَجَعَلَهُ مَذْهَبَهُ وَأَخَذَ بِهِ.

"আমাদের ইমামে আযম আবু হানীফা (রহ.) নাফে (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলারা কীভাবে নামায পড়তেন? তিনি বললেন, আগে তারা চারজানু হয়ে বসতেন, পরে তাদেরকে জড়সড় হয়ে বসতে বলা হয়েছে।' (জামেউল মাসানীদ ১/৪০০)

"উক্ত হাদীসটি এ বিষয়ে সর্বাধিক শক্তিশালী। এ কারণেই আমাদের ইমাম এর দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, এ অনুযায়ী আমল করেছেন এবং এটিকে মাযহাব বানিয়ে নিয়েছেন। (কিতাবুল আসার [টীকা] ১/৬০৭)

২. ইমাম আবুল হাসান কারখী হানাফী (রহ.) (মৃত্যু ৩৪০ হিজরী)ও তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-মুখতাসার'-এ মহিলাদের নামাযের পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবুল হুসাইন আল-কুদুরী আল-হানাফী (রহ.) (মৃত্যু ৪২৮ হিজরী) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১০১–১০২ পাণ্ডুলিপি) আরো বিস্তারিতভাবে দলীলসহ লিখেছেন।

তাঁদের সম্পূর্ণ বক্তব্য আল্লামা আবুল ওয়াফা আফগানী (রহ.) কৃত 'কিতাবুল আসারে'র টীকায় দেখা যেতে পারে। (১/৬০৯)

৩. আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী হানাফী (রহ.) বলেন–

وَهٰذَا كُلُّهُ فِيْ حَقِّ الرِّجَالِ، وَأَمَّا فِيْ حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوْا عَلٰى أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ، لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ ... وَفِي الْمُضْمَرَاتِ نَاقِلًا عَنِ الطَّحَاوِيِّ : اَلْمَرْأَةُ تَضَعُ يَدَيْهَا عَلٰى صَدْرِهَا لِأَنَّ ذٰلِكَ أَسْتَرُ لَهَا .

"মহিলাদের ব্যাপারে সকলে একমত যে, তাদের জন্য সুন্নাহ্ হল বুকের উপর হাত বাঁধা। কারণ এটাই তাদের জন্য যথোপযুক্ত সতর।"

(আস-সিআয়া : ২/১৫৬)

৪. আরো দ্রষ্টব্য ঃ (ক) হিদায়া ১/১০০, ১১০, ১১১ (খ) বাদায়িউস সানায়ে আবু বকর কাসানী ১/৪৬৬ (গ) আল-মাবসূত, সারাখসী ১/২৫ (ঘ) ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৫০৪ (ঙ) ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/৭৩, ৭৫

ফিকহে মালেকী

১. মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবুল আব্বাস আল-কারাফী রহ. (মৃত্যু ৬৮৪ হিজরী) বলেন–

وَأَمَّا مُسَاوَاةُ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ فَفِي النَّوَادِرِ عَنْ مَالِكٍ : تَضَعُ فَخِذَهَا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَنْضَمُّ قَدْرَ طَاقَتِهَا، وَلَا تَفْرِجُ فِي رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ وَلَا جُلُوسٍ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ.

"নামাযে মহিলা পুরুষের মত কিনা এ বিষয়ে ইমাম মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, মহিলা ডান উরু বাম উরুর উপর রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে বসবে। রুকূ, সিজদা ও বৈঠক কোন সময়ই ফাঁক ফাঁক হয়ে বসবে না; পক্ষান্তরে পুরুষের পদ্ধতি ভিন্ন। (আয-যাখীরা, ইমাম কারাফী ২/১৯৩)

ফিকহে শাফেয়ী

১. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন–

وَقَدْ أَدَّبَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ النِّسَاءَ بِالْاِسْتِتَارِ وَأَدَّبَهُنَّ بِذٰلِكَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُحِبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَتُلْصِقَ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا وَتَسْجُدَ كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، وَهٰكَذَا أُحِبُّ لَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالْجُلُوسِ وَجَمِيعِ الصَّلَاةِ أَنْ تَكُونَ فِيهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا.

"আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে পুরোপুরি আবৃত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর রাসূলও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমার নিকট পছন্দনীয় হল, সিজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গকে

মিলিয়ে রাখবে; পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং সিজদা এমনভাবে করবে যাতে সতরের চূড়ান্ত হেফাযত হয়। অনুরূপ রুকূ, বৈঠক ও গোটা নামাযে এমনভাবে থাকবে যাতে সতরের পুরোপুরি হেফাযত হয়।"

(কিতাবুল উম্ম, শাফেয়ী ১/১৩৮)

২. ফিকহে শাফেয়ীর বড় ভাষ্যকার ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু ৪৫৮ হিজরী) রহ. বলেন :

وَجِمَاعُ مَا يُفَارِقُ الْمَرْأَةُ فِيهِ الرَّجُلَ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ رَاجِعٌ إِلَى السَّتْرِ، وَهُوَ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِكُلِّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا، وَالْأَبْوَابُ الَّتِي تَلِي هٰذِهِ تَكْشِفُ عَنْ مَعْنَاهُ وَتَفْصِيلِهِ، وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ.

"নামাযের বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার নামাযের (পদ্ধতিগত) ভিন্নতার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল সতর। অর্থাৎ মহিলার জন্য (শরীয়তের) হুকুম হল ওই পদ্ধতি অবলম্বন করা যা তাকে সর্বাধিক পর্দা দান করে। সামনের অধ্যায়গুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।'

(সুনানে কুবরা, ইমাম বায়হাকী ২/২২২)

ফিকহে হাম্বলী

১. ইমাম ইবনে কুদামা মাকদিসী আলহাম্বলী রহ. (মৃত্যু ৬২০ হিজরী) বলেন–

فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَذَكَرَ الْقَاضِي فِيهَا رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، إِحْدَاهُمَا تَرْفَعُ، لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَحَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَتَا تَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَلِأَنَّ مَنْ شُرِعَ فِي حَقِّهِ التَّكْبِيرُ شُرِعَ فِي حَقِّهِ الرَّفْعُ كَالرَّجُلِ، فَعَلَى هٰذَا تَرْفَعُ قَلِيلًا. قَالَ أَحْمَدُ : رَفْعٌ دُونَ الرَّفْعِ.

وَالثَّانِيَةُ : لَا يُشْرَعُ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى التَّجَافِي، وَلَا شُرِعَ ذٰلِكَ لَهَا، بَلْ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَسَائِرِ صَلَاتِهَا.

"তাকবীরের সময় মহিলারা হাত উঠাবে কি উঠাবে না এ বিষয়ে কাজী (আবু ইয়াজ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে দুটি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথম মত অনুযায়ী হাত তুলবে। কেননা, খাল্লাল হযরত উম্মে দারদা এবং হযরত

হাফসা বিনতে সীরীন থেকে সনদসহ বর্ণনা করেন যে, তারা হাত উঠাতেন। ইমাম তাউসের বক্তব্যও তা-ই। উপরন্তু যার ব্যাপারে তাকবীর বলার নির্দেশ রয়েছে তার ব্যাপারে হাত উঠানোরও নির্দেশ রয়েছে। যেমন পুরুষ করে থাকে এ হিসাবে মহিলা হাত উঠাবে, তবে সামান্য। আহমাদ (রহ.) বলেন, তুলনামূলক কম উঠাবে।

দ্বিতীয় মত এই যে, মহিলাদের জন্য হাত উঠানোরই হুকুম নেই। কেননা, হাত ওঠালে কোন অঙ্গকে ফাঁক করতেই হয় অথচ মহিলাদের জন্য এর বিধান দেওয়া হয়নি। বরং তাদের জন্য নিয়ম হল রুকু সিজদাসহ পুরো নামাযে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখবে।" (আল মুগনী, ইবনে কুদামা ২/১৩৯)

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, হাম্বলী মাযহাবে মহিলাদের হাত উঠানো নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে; কিন্তু এ বিষয়ে কোন ইখতিলাফ নেই যে, রুকু-সিজদা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জড়সড় হয়ে থাকতে হবে। আর হাত উঠানোর মত যে বর্ণনায় এসেছে তাতেও সামান্য উঠাতে বলা হয়েছে। যার নিহিতার্থ হল সতর রক্ষার্থে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

২. ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) তাঁর অপর গ্রন্থ 'আলমুকনি'তে পুরুষের নামাযের পদ্ধতি উল্লেখ করার পর বলেন–

وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِيْ ذٰلِكَ، إِلاَّ أَنَّهَا تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ. وَكَذَا فِيْ بَقِيَّةِ الصَّلاَةِ بِلاَ نِزَاعٍ، وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً أَوْ تَسْدُلُ رِجْلَيْهَا فَتَجْعَلُهَا فِيْ جَانِبِ يَمِيْنِهَا.

"এসব ক্ষেত্রে মহিলার হুকুম পুরুষের মতই। তবে মহিলা রুকু ও সিজদায় নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। অনুরূপ নামাযের অন্যান্য রুকনেরও এই হুকুম। এতে কারো দ্বিমত নেই; মহিলা চারজানু হয়ে বসবে কিংবা উভয় পা এক সাথে করে ডান পাশ দিয়ে বের করে দিবে।" (আল মুকনি ২/৯০, আল ইনসাফসহ)

উপরোক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করে আল্লামা মারদাভী (রহ.) বলেন, "ইমাম আহমাদ (রহ.) থেকে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, মহিলাদের জন্য উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে বসাই উত্তম।" (আল ইনসাফ ফী মারিফাতির-রাজিহি মিনাল খিলাফ, আল্লামা মারদাভী রহ. [মৃত্যু ৮৮৫] ২/৯০)

এ পর্যন্ত হাদীস, আছারে সাহাবা, আছারে তাবেয়ীন ও চার ইমামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত পেশ করা হয়েছে। এবার আমরা দেখব, আমাদের যে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা মহিলাদের নামাযের ভিন্ন পদ্ধতির বিষয়টিকে উপেক্ষা করেন

এবং পুরুষ ও মহিলার নামাযের অভিন্ন পদ্ধতির পক্ষে কথা বলেন, তাদের আলেমগণ এ বিষয়ে কী ফতওয়া দিয়েছেন।

গায়রে মুকাল্লিদ আলেমগণের ফতওয়া

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ হাদীস শরীফ, সুন্নতে খলীফায়ে রাশেদ, সুন্নতে সাহাবা, ইজমায়ে তাবেয়ীন ও চার ফিকহের ঐকমত্য তথা যুগ-যুগ ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসা মুসলিম উম্মাহ্র সর্বসম্মত ও দলীলভিত্তিক আমলের আলোকে এই নিবন্ধে যা কিছু পেশ করা হয়েছে নেতৃস্থানীয় গায়রে মুকাল্লিদ আলিমগণও তা স্বীকার করেন এবং তাঁরা সেই আলোকে ফতওয়াও প্রদান করেছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ দাউদ গযনবী (রহ.)-এর পিতা আল্লামা আবদুল জাব্বার গযনবী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করা হল, মহিলাদের নামাযে জড়সড় হয়ে থাকা কি উচিত? জবাবে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে লেখেন : "এর উপরই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চার মাযহাব ও অন্যান্যদের মাঝে আমল চলে আসছে।"

এরপর তিনি চার মাযহাবের কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করার পর লেখেন, "মোটকথা, মহিলাদের জড়সড় হয়ে নামায পড়ার বিষয়টি হাদীস ও চার মাযহাবের ইমামগণ ও অন্যান্যের সর্বসম্মত আমলের আলোকে প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী হাদীসের কিতাবসমূহ ও উম্মতের সর্বসম্মত আমল সম্পর্কে বেখবর ও অজ্ঞ।" (ফাতাওয়া গযনবিয়্যা ২৭ ও ২৮; ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস ৩/১৪৮ ও ১৪৯; মাজমুআয়ে রাসায়েল, মাওলানা আমীন সফদর উকারবী ১/৩১০-৩১১)

মাওলানা আলী মুহাম্মাদ সাঈদ 'ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস' গ্রন্থে এই পার্থক্যের কথা স্বীকার করেছেন। (মাজমুআয়ে রাসায়েল ১/৩০৫)

মাওলানা আবদুল হক হাশেমী মুহাজির মক্কী তো এই পার্থক্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তিকাই রচনা করেছেন। পুস্তিকাটির নাম

"نَصْبُ الْعَمُوْدِ فِيْ تَحْقِيْقِ مَسْأَلَةِ تَجَافِي الْمَرْأَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالْقُعُوْدِ"

ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে নবাব সিদ্দীক হাসান খান কৃত (মৃত্যু ১৩০৭) 'আউনুল বারী'র উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে; যিনি তৎকালীন আহলে হাদীসদের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তদ্রূপ মুহাদ্দিস আমীর ইয়ামানীর 'সুবুলুস সালামে'র উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে; গায়রে মুকাল্লিদ ও সালাফী ভাইদের দেখা যায়, তারা তাকে নিজেদের লোক মনে করেন এবং এই কিতাবকে নিজেদেরই কিতাব মনে করে থাকেন।

আলবানী সাহেবের অসার বক্তব্য

আশ্চর্য কথা হল, উপরোক্ত দলীলসমূহ এবং নববী যুগ থেকে পর্যায়ক্রমে চলে আসা উম্মাহ্র সর্বসম্মত আমলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আলবানী সাহেব তাঁর 'সিফাতুস সালাতে' ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতি এক।"

কিন্তু এই দাবির স্বপক্ষে তিনি না কোন আয়াত পেশ করেছেন, না কোন হাদীস। আর না কোন সাহাবী বা তাবেয়ীর ফতওয়া। তার দলীল হল পুরুষ মহিলার নামাযের পদ্ধতিগত পার্থক্যের ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই। অথচ এটিও একটি দাবি এবং তা প্রমাণ করার জন্য অপরিহার্য ছিল উপরোক্ত দলীলগুলো বিশ্লেষণ করা। কিন্তু তিনি তা না করে কেবল পার্থক্য সম্বলিত একটি হাদীসকে (যা বক্ষমান নিবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে) শুধু এ কথা বলে যয়ীফ আখ্যা দিলেন যে, হাদীসটি 'মুরসাল'। অতএব তা যয়ীফ! এ ছাড়া অন্য কোন আলোচনাই তিনি দলীল সম্পর্কে করেননি!

এখানে একটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে হাদীসশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। শুধু এতটুকু বলব যে, মুরসাল হাদীস কেবল মুরসাল হওয়ার কারণেই অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না। কেননা অধিকাংশ ইমামের মতে, বিশেষত স্বর্ণযুগের ইমামগণের মতে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে মুরসাল হাদীসও সহীহ হাদীসের মতই গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত যে ইমামগণের নিকট 'মুরসাল'কে 'সহীহ' বলার ব্যাপারে দ্বিধা রয়েছে তারাও মূলত কিছু শর্তের সাথে মুরসাল হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

বর্তমান নিবন্ধে যে মুরসাল হাদীস সম্পর্কে আলোচনা চলছে তাতে প্রয়োজনীয় শর্ত বিদ্যমান রয়েছে; যার কারণে গায়রে মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান 'আউনুল বারী' (১/৫২০ দারুর রাশীদ, হালাব, সিরিয়া)তে লিখেছেন, 'এই মুরসাল হাদীসটি সকল ইমামের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী দলীল হওয়ার যোগ্য।' তাঁর পূর্ণ বক্তব্য নিম্নরূপ :

"فَمَنْ يَرَى الْمُرْسَلَ حُجَّةً - وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ فِيْ طَائِفَةٍ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمَشْهُوْرِ عَنْهُ - فَحُجَّتُهُمْ الْمُرْسَلُ الْمَذْكُوْرُ، وَمَنْ لَا يَرَى الْمُرْسَلَ حُجَّةً كَالشَّافِعِيِّ وَجُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ فَبِاعْتِضَادِ كُلٍّ مِنَ الْمَوْصُوْلِ وَالْمُرْسَلِ بِالْآخَرِ، وَحُصُوْلِ الْقُوَّةِ مِنَ الصُّوْرَةِ الْمَجْمُوْعَةِ، قَالَ فِيْ

فَتْحِ الْبَارِيْ : وَهٰذَا مِثَالٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّ الْمُرْسَلَ يَعْتَضِدُ بِمُرْسَلٍ آخَرَ أَوْ مُسْنَدٍ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : اَلْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ يَرْتَقِيْ عَنِ الضَّعِيْفِ إِلَى الْحَسَنِ، وَيَصِيْرُ مَقْبُوْلاً مَعْمُوْلاً بِهِ، قَالَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ : وَلاَ يَقْتَضِيْ ذٰلِكَ الاِحْتِجَاجَ بِالضَّعِيْفِ، فَإِنَّ الاِحْتِجَاجَ هُوَ بِالْهَيْئَةِ الْمَجْمُوْعَةِ كَالْمُرْسَلِ حَيْثُ اعْتَضَدَ بِمُرْسَلٍ آخَرَ، وَلَوْ ضَعِيْفًا، كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُوْرُ، كَذَا فِيْ عَوْنِ الْبَارِيْ ١٥٩/٢ مَعَ النَّيْلِ، اَيْضًا ج ١ ص٥٢٠ طبع دار الرشيد، حلب، سوريا

পুরুষ ও মহিলার অভিন্ন নামায-পদ্ধতি বিষয়ক রায়ের সমর্থন পেশ করতে গিয়ে দ্বিতীয় যেই কাজটি আলবানী সাহেব করেছেন তা হল, ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)-এর নামে একটি কথা চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি নাকি বলেছেন–

تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلاَةِ كَمَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ

"মহিলা পুরুষের মতই নামায আদায় করবে"

উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা' এর। অথচ উপরোক্ত গ্রন্থে কোথাও এই কথাটি নেই। আল্লাহ তাআলা ভাল জানেন, এই ভুল উদ্ধৃতি তিনি কীভাবে লিখে দিলেন?! অথচ ইতিপূর্বে একাধিক সহীহ সনদে উদ্ধৃতিসহ ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)-এর বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন হুকুমের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার নামাযের পার্থক্যের কথা উল্লেখ রয়েছে।

তৃতীয় কাজটি এই করেছেন যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রিজাল বিষয়ক গ্রন্থ 'তারীখে সগীর' থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি পেশ করেছেন–

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّهَا كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ جِلْسَةَ الرَّجُلِ.

"উম্মে দারদা থেকে বর্ণিত, 'তিনি নামাযে পুরুষের ন্যায় বসতেন'।"

অথচ আলবানী সাহেব লক্ষ করেননি, এই রেওয়ায়াত দ্বারাই নামাযে পুরুষ ও মহিলার বসার পদ্ধতি ভিন্ন হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা উভয়ের বসার পদ্ধতি এক হলে (جِلْسَةُ الرَّجُلِ) 'পুরুষের মত বসা' কথাটির কোন অর্থ থাকে না। তাই এই বর্ণনা থেকেও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, সেই যামানায় পুরুষ ও মহিলার

বসার পদ্ধতি এক ছিল না। তথাপি উম্মে দারদা পুরুষদের মত বসতেন; একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা হওয়ায় তা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

উম্মে দারদা ছিলেন তাবেয়ী; ৮০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। যদি নামাযের পদ্ধতি প্রমাণের ক্ষেত্রে তাবেয়ীদের আমল দলীল হয়ে থাকে এবং বাস্তবও তাই, তাহলে তো আমরা ইতিপূর্বে একাধিক বিখ্যাত তাবেয়ী ইমামের উদ্ধৃতিতে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং তাতে এ কথা প্রমাণ হয়েছে যে, আয়িম্মায়ে তাবেয়ীনের তালীম ও শিক্ষা অনুযায়ী রুকূ, সিজদা ও বৈঠকসহ একাধিক আমলের মধ্যে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন ছিল। অতএব এ ক্ষেত্রে শুধু একজন তাবেয়ী মহিলার ব্যক্তিগত আমলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারটি যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষ করে যখন এই বর্ণনাতেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিষয়ে তিনি অন্য সাহাবী ও তাবেয়ী মহিলাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

هٰذَا وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : জনাব মুফতী সাহেব! আমাদের এখানে এক মাওলানা সাহেব– সম্ভবত তিনি গায়রে মুকাল্লিদ বা সালাফী হবেন– বলেন যে, হাদীস শরীফে নামাযের মধ্যে কুকুরের মতো সিজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে, অর্থাৎ ভূমিতে হাত বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব হানাফী মাযহাব মোতাবেক মহিলারা যেভাবে ভূমিতে হাত বিছিয়ে সিজদা করে সেটা ভুল পদ্ধতি।

আমার প্রশ্ন হল, উল্লেখিত হাদীসটি সহীহ কি না? হাদীসটির মূল আরবী পাঠ কী এবং কুকুরের মতো সিজদা করার অর্থ কী? মাওলানা সাহেব যে অর্থ বলেছেন তা সহীহ কি না? আর হানাফী মাযহাবে মহিলাদের সিজদা আদায় করার জন্য যে পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে তার দলীল কী?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত হাদীসটি সহীহ, তবে হাদীসটির যে অর্থ ওই আলেম করেছেন তা সঠিক নয়। আর হানাফী মাযহাবে মহিলাদের সিজদা করার যে পদ্ধতি রয়েছে তা চার মাযহাবেই স্বীকৃত। এই মাসআলায় স্বীকৃত ও অনুসৃত মাযহাবগুলোর মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। এই পদ্ধতিটি হাদীস শরীফ, সাহাবা-তাবেয়ীনের ফতওয়া এবং আইম্মায়ে ফিকহের ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এই স্বীকৃত পদ্ধতিকে ভুল আখ্যা দেওয়া এবং মহিলাদেরকে পুরুষের মতো সিজদা করতে বলা সম্পূর্ণ ভুল এবং সুন্নাহ্ পরিপন্থী।

এখন প্রশ্নোক্ত হাদীসটি সম্পর্কে শুনুন। হাদীসটি মুসনাদে আহমদে দুই জায়গায় এসেছে। এক. খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১১। সেখানে হাদীসটি এভাবে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرِ الدِّيْكِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ.

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (নামাযের মধ্যে) মোরগের মতো ঠোকর দিতে, (অর্থাৎ কওমা, রুকু, সিজদা ও জালসা ইত্যাদি ধীর-স্থিরভাবে আদায় না করে তাড়াহুড়া করা থেকে) কুকুরের মতো বসতে এবং শিয়ালের মতো এদিকে সেদিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন।

দুই. খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ২৬৫। সেখানে كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ এর স্থলে كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ শব্দ এসেছে অর্থাৎ বানরের মতো বসতে নিষেধ করেছেন।

কুকুর এবং বানর কীভাবে বসে তা তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারাও জানা যায়। এছাড়া আরবী অভিধান, হাদীসের শব্দ-কোষ, হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ এবং ফিকহের বড় বড় কিতাবেও এর ব্যাখ্যা রয়েছে। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, হাদীসে যে إِقْعَاء নিষেধ করা হয়েছে এবং যেটাকে إِقْعَاءُ الْكَلْبِ বলা হয়েছে সেটা হল, উভয় হাটু খাড়া করে নিতম্বের উপর বসা এবং দুই হাত দুই পাশে যমিনের উপরে রাখা।

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান খানও 'লুগাতুল হাদীস' গ্রন্থে (খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৩) এই ব্যাখ্যাই করেছেন। তদ্রূপ আল্লামা শাওকানী 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৪–২৯৫) এবং নাসীরুদ্দীন আলবানীও 'সিফাতুস সালাত' পৃষ্ঠা ১৫৭-এ এই ব্যাখ্যাই লিখেছেন।

এখন চিন্তা করে দেখুন, এই হাদীসে মহিলাদের সিজদার পদ্ধতির কথা কোথায়! এতে তো বসার নিষিদ্ধ পদ্ধতির কথা এসেছে। এই হাদীসে না আছে পুরুষের সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কিত কোনো কথা, না মহিলাদের সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা।

অবশ্য পুরুষদের সিজদা দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলের শিক্ষা হল, পুরুষরা সিজদার সময় পেটকে উরু থেকে পৃথক রাখবে এবং উভয় হাত পাঁজর থেকে আলাদা রাখবে। উভয় হাতের কব্জি যমিনের উপর রাখবে কিন্তু বাহু যমিন থেকে উঁচু করে রাখবে। এ বিষয়ের একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

তোমরা সিজদা আদায়ের ক্ষেত্রে (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর) সামঞ্জস্য বজায় রাখ। কেউ যেন কুকুরের মতো হাতকে বিছিয়ে না দেয়।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৮২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৯৩)

কিন্তু এসব বিধান শুধু পুরুষের জন্য। আর এই বিষয়ের হাদীসগুলো পুরুষদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। এখানে و এবং كم এ দুটি শব্দ পুংলিঙ্গ বাচক। আর সহীহ মুসলিমের হাদীসে তো স্পষ্টভাবে পুরুষের কথা উল্লেখিত হয়েছে–

وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে (নামাযে) হিংস্র জানোয়ারের ন্যায় দুই বাহুকে বিছিয়ে দিতে নিষেধ করতেন।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৯৮)

এই আলোচনা থেকে জানা গেল পুরুষের জন্য সিজদার সময় দুই হাত বিছিয়ে দেওয়া নিষেধ। পক্ষান্তরে মহিলাদের হুকুম ভিন্ন। তা এসেছে নিম্নোক্ত হাদীসগুলোতে।

মহিলাদের সিজদার পদ্ধতি

উম্মতের স্বীকৃত ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, মহিলাদের সিজদার পদ্ধতি পুরুষের পদ্ধতির বিপরীত। মহিলারা সতরের প্রতি অধিক যত্নবান হয়ে সিজদা করবে। শরীরের এক অংশ অন্য অংশের সাথে যতদূর সম্ভব মিলিয়ে রাখবে এবং শরীর যমিনের সাথে মিশিয়ে রাখবে যাতে সতরের দিকটা বেশি থেকে বেশি প্রাধান্য পায়। হাদীস শরীফে এসেছে–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِيْ ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ (سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاؤُد فَهُوَ عِنْدَهُ صَالِحٌ وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ عَضَدَهُ مَا فِيْ هٰذَا الْبَابِ مِنْ مَوْصُوْلٍ وَآثَارٍ وَإِجْمَاعٍ، وَصَرَّحَ الشَّيْخُ نَاصِرُ الْأَلْبَانِيُّ فِيْ سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ أَنَّهُ لَا عِلَّةَ فِيْهِ سِوَى الْإِرْسَالِ)

অর্থ : একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত দুইজন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এক্ষেত্রে পুরুষের মতো নয়। (সুনানে আবু দাউদ, মারাসিল অংশ ৮০)

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আওনুল বারী (১/৫২০)তে লিখেছেন, উল্লেখিত হাদীসটি সকল ইমামের উসূল অনুযায়ী দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

তাদের বরণীয় ব্যক্তি মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম গ্রন্থে (১/৩৫১–৩৫২) এই হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করে পুরুষ ও মহিলার সিজদার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং স্পষ্ট

বলেছেন, وَهٰذَا فِىْ حَقِّ الرَّجُلِ لَا الْمَرْأَةِ বাহু যমিন থেকে উঠিয়ে রাখার বিধান পুরুষের জন্য, মহিলার জন্য নয়।

দুই. হযরত আলী (রা.) বলেন,

إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتَلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا.

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِى الْمُصَنَّفِ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ أَبِى شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَالصَّوَابُ فِى الْحَارِثِ هُوَ التَّوْثِيقُ.

অর্থ : মহিলারা যখন সিজদা করবে তখন যেন খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে। (আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক ৩/১৩৮; আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৪; সুনানে কুবরা; বায়হাকী ২/২২২)

তিন. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, মহিলারা কিভাবে নামায আদায় করবে? তিনি বললেন–

تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে। (আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৫, হাদীস ২৭৯৪)

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) বলেন–

كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَيْهَا وَبَطْنَهَا عَلٰى فَخِذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ وَلَاتَتَجَافٰى كَمَا يَتَجَافٰى الرَّجُلُ لِكَىْ لَا تَرْفَعَ عَجِيْزَتَهَا (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ)

মহিলাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হত সিজদা অবস্থায় হাত ও পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখতে। পুরুষের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা না রাখতে, যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে। (আল মুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক ৩/১৩)

উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, মহিলাদেরকে পৃথক ও ভিন্ন পদ্ধতিতে নামায শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন সাধারণ ও ব্যাপক ছিল।

كَانَتْ শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, এই তালীম পূর্ব থেকে চলে এসেছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের যুগেই এই তালীমের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং সে অনুযায়ী মহিলা সাহাবীগণ নামায আদায় করতেন।

সারকথা হল, রুকূ সিজদা জলসাসহ আরো কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের বিধান ভিন্ন হওয়া একটি স্বীকৃত বিষয়। বর্তমান যামানায় এসে কিছু গায়রে মুকাল্লিদ এবং কতিপয় সালাফী ছাড়া ইতিপূর্বে কেউ এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেনি। অথচ তাদেরই বড় আলেমদের তাহকীক এবং ফতওয়া এই যে, উল্লেখিত মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে মহিলাদের হুকুম ভিন্ন।

এ বিষয়ে আলকাউসারের জুন '০৫ সংখ্যায় একটি দলীলনির্ভর বিস্তারিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অতিরিক্ত জানার জন্য প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে। তাতে গায়রে মুকাল্লিদ ও সালাফীদের বরণীয় ব্যক্তিদের প্রমাণসিদ্ধ বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবীর রাকাআত সংখ্যা

তারাবীর গুরুত্ব ও ফযীলত

হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে পছন্দনীয় পন্থা হল ফরয ইবাদত ও ফরয দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। এরপরে সুন্নাত ও নফলের স্থান। কিন্তু সুন্নত ও নফল দ্বারাও যে পর্যায়ের নৈকট্য লাভের কথা হাদীস শরীফে এসেছে তা-ও অন্তরকে জাগ্রত করার জন্য এবং মানবাত্মাকে ব্যাকুল করার জন্য যথেষ্ট। যার সারাংশ হল, ইখলাসের সাথে সুন্নত ও নফলসমূহের প্রতি মনোযোগী হলে এর মাধ্যমে বান্দার রুচি ও স্বভাব দুরস্ত হয়ে যায়। ফলে সর্বদা আল্লাহর তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনই তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়, তার প্রতিটি কাজকর্ম আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টির অনুগামী হয় এবং আল্লাহ তাকে এতটাই মহব্বত করতে থাকেন যে, তার ব্যাপারে ঘোষণা করে দেওয়া হয়–

مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

"কেউ যদি আমার কোন বন্ধুর সাথে দুশমনি করে তো আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি।" (সহীহ বুখারী ১১/৩৪০–৩৪১ [ফাতহুল বারী] আলামুল হাদীস, খাত্তাবী ১/৭০১–৭০৩; মাজমূউল ফাতাওয়া ১৮/১২৯–১৩১)

আর বাস্তব কথা হল, স্বভাব-রুচি দুরস্ত হওয়া এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ হওয়ার চেয়ে বান্দার জন্য বড় কামিয়াবি আর কিছুই হতে পারে না। কেননা এই জিনিস দুনিয়া-আখেরাতের সকল কল্যাণের চাবিকাঠি।

রমযানুল মুবারক খায়ের ও বরকতের বসন্তকাল; বরং এর বাস্তব অবস্থা শব্দ ও বাক্যের গাঁথুনিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। রমযানের দিনে আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে নির্দেশ জারি করে রোযা ফরয করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে রাতের 'কিয়াম' যাকে কিয়ামে রমযান বা তারাবীহ বলে, সুন্নত বানিয়েছেন। বিভিন্ন হেকমতের কারণে তারাবীর নামাযকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাই রাখা হয়েছে, ফরয করা হয়নি; কিন্তু সন্দেহ নেই যে, রমযানের খায়ের ও বরকত পূর্ণরূপে হাসিল করতে হলে অবশ্যই তারাবীর বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। এজন্য মুমিন বান্দা রমযান ও কুরআনের হক আদায়

করার জন্য, রোযার উদ্দেশ্য-তাকওয়া হাসিলে সাহায্য পাওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত ও মাগফিরাতে সিক্ত হওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার মহব্বতের হক আদায় করার জন্য, সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য তারাবীর পাগল হয়ে থাকে। বিনয় ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রাতসমূহে (নামাযে) দাঁড়ানো ও সিজদা অবস্থায় কাটাতে থাকে এবং আল্লাহর সাথে দীর্ঘ আলাপচারিতার মাধ্যমে মহব্বতের পিপাসা নিবারণ করে হৃদয়ের তৃপ্তি আহরণ করে।

তারাবীর এই বৈশিষ্ট্য থেকেও এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় যে, সুন্নত ও নফলের সাধারণ নিয়মের বাইরে এতে ফরয নামাযের মত জামাআত বিধিবদ্ধ হয়েছে। তবে স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআতের ব্যবস্থা এজন্যই করেননি যেন তা উম্মতের উপর ফরয হয়ে না যায়। এ থেকে বোঝা যায়, তারাবীর গুরুত্ব সাধারণ নফল নামায থেকে অনেক বেশি। মোটকথা, অনেক দলীলের ভিত্তিতে ফকীহগণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তারাবীর নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আজকাল কতিপয় মানুষ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করছে যে, তারাবীহ অন্যসব নফলের মতই। এটা না পড়লেও কোন গুনাহ নেই। এ ধরনের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। রমযানের রাতগুলোকে মহাসুযোগ মনে করে গুরুত্বের সাথে তারাবীর নামাযে যত্নবান থাকুন এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদ নামাযেও (যা সারা বছরের নামায) যত্নবান হওয়ার চেষ্টা করুন।

তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা

এই ভূখণ্ডে ইংরেজদের অশুভ অনুপ্রবেশের আগে এ বিষয়ে কোন কিছু বলার বা লিখার প্রয়োজন হত না। কেননা গোটা ইসলামী দুনিয়ায়, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত, সাহাবা-তাবেয়ীনের স্বর্ণযুগ থেকে চলে আসা নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মসজিদে বিশ রাকাআত তারাবীহ ও বিতরের নামায পড়া হত।

কোন কোন মসজিদে কোন সময় বিশ রাকাআতের অধিকও পড়া হত; কিন্তু বিশ রাকাআতের কম তারাবীর নামায কোন মসজিদে হত এর কোন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না।

ইংরেজদের অশুভ অনুপ্রবেশের পর থেকেই কিছু কিছু 'আত্মার রোগী' বা স্বল্পজ্ঞানী ও স্বল্প বুঝের ব্যক্তি সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে তাদের খুঁটি মজবুত করার কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে সর্বশীর্ষে ছিলেন আমাদের ওই সব বন্ধু যাদের মিশনের মৌলিক দুটি বিষয় এই ছিল :

১. ইসলামের স্বর্ণযুগ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনের যুগ থেকে যে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা ও ইজমায়ে উম্মত বিদ্যমান রয়েছে তার বিপরীতে অতীতের কিছু পরিত্যক্ত 'শায', 'মুনকার' (ভ্রান্ত ও বিচ্যুত) মত পুনরায় ওস্‌কে দিয়ে কিংবা প্রয়োজনে এ ধরনের ভ্রান্ত মতের সৃষ্টি করে সাধারণ মুসলমানকে পেরেশান করা এবং তাদের একতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিকে চুরমার করা। আর সেসব মতগুলোকে 'হাদীস-অনুসরণ' নামে চালিয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শায ও মুনকার রেওয়ায়াত খুঁজে খুঁজে বের করে সেসবকে বিশুদ্ধ ও বাস্তব ক্ষেত্রে অনুসৃত সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা এবং কিছু সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে সেসবের পক্ষে প্রমাণ যোগানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা।

২. এমন কিছু শাখাগত মাসায়েলকে বিবাদ-বিসংবাদ এবং ফাসেক ও কাফের আখ্যা দেওয়ার উপায় বানানো যেগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই একাধিক মত বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক মত হাদীস ও সুন্নতে নববী দ্বারা সমর্থিত। আমাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে এসব মাসআলায় মতভেদ ছিল; কিন্তু এটা তাদের একতাকে বিনষ্ট করেনি। একে অপরকে ফাসেক ও গোমরাহ আখ্যা দেওয়া তো দূরের কথা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতিতেও কোন ফাটল ধরেনি। কেননা তাঁরা বুঝতেন, শরীয়তসম্মত ও দলীলভিত্তিক ইখতেলাফ যেখানে হয় সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্তের উপর স্থির থাকাটাই শরীয়তে কাম্য। শাখাগত বিভিন্ন মাসায়েলের ব্যাপারে সালাফের (পূর্বসূরীদের) এই সম্মিলিত কর্ম-পদ্ধতিকে পরিহার করে মসজিদগুলোকে বিবাদ-বিসংবাদের আখড়ায় পরিণত করা সে সব বন্ধুদের মিশনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল।

আমাদের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ তারাবীর মাসআলা তাদের মিশনের প্রথম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তারাবীর বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন কর্ম-ধারার বিপরীতে ইংরেজ শাসিত ভারত উপমহাদেশে যে আওয়াজ উঠেছিল তা এক লা-মাযহাবী আলেমের পক্ষ থেকেই উঠেছিল, যে ইংরেজদের নিকট থেকে নিজ সম্প্রদায়ের নাম 'আহলে হাদীস' মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার খাস রহমত, ওই ঘরানারই একজন আলেম মাওলানা গোলাম রাসূল ১২৯০ হিজরীতেই এই মতবাদকে খণ্ডন করে একটি পুস্তিকা রচনা করেন, যাতে ২০ রাকাআত তারাবীর সপক্ষে অন্যান্য দলীলের পাশাপাশি উম্মতের এই সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন কর্মধারাও উল্লেখ করা হয়েছে। 'রেসালায়ে তারাবীহ' নামে প্রকাশিত পুস্তিকাটির কপি আমাদের কাছেও রয়েছে।

আরব জাহানে কবে থেকে এই বিদআতের সূচনা তা সুনির্দিষ্টভাবে আমার জানা না থাকলেও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেসব অঞ্চলে এর সূচনা ভারতবর্ষের পরে হয়। আমার জানা মতে সর্বপ্রথম যিনি এই বিদআতকে দলীল দ্বারা প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তিনি শায়খ নসীব রেফায়ী। তখন আলেমগণ তার মতামত ও আলোচনাকে খণ্ডন করেছেন। তবে শায়খ আলবানী মরহুমের সেটা সহ্য হয়নি। তিনি রেফায়ী সাহেবের সমর্থনে ১৩৭৭ হিজরীতে 'তাসদীদুল ইসাবাহ' নামে একটি বই লিখে দিলেন। বইটি তার ভ্রান্তি-বিচ্যুতি এবং মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম উম্মাহর ইমামগণের প্রতি বিদ্রোহ-বিদ্বেষের একটি খোলা দলীল এবং ইলমে উসূলে হাদীস ও জারহ-তাদীল বিষয়ে তার অপরিপক্কতার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ছাড়া ইলমে উসূলে ফিকহ বিষয়েও তার দৈন্য এই বইটিতে প্রকাশিত হয়েছে। যা সত্যিই মর্মান্তিক। এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের লা-মাযহাবী বন্ধুরা তারাবী বিষয়ে শায়খ আলবানীর বইটিকেই শিরোধার্য করে রেখেছেন।

এখানে যে বাস্তবতার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল, শায়খ নাসীব রেফায়ীর খণ্ডনে লিখিত اَلْإِصَابَةُ فِي الْإِنْتِصَارِ لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَالصَّحَابَةِ নামক কিতাবটির ৬১ নং পৃষ্ঠায় পরিষ্কার লেখা হয়েছে– وَلَمْ يَشِذَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَنْعِهَا غَيْرُ هٰذِهِ الشِّرْذِمَةِ الَّتِىْ ظَهَرَتْ فِيْ زَمَانِنَا كَالشَّيْخِ نَاصِرٍ وَإِخْوَانِهِ অর্থাৎ "শায়খ নাসির (আলবানী) ও তাঁর সমমনাদের ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী ছাড়া, যারা আমাদের এই যুগে আত্মপ্রকাশ করেছে, আর কেউই একে অস্বীকার করে ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে নিপতিত হয়নি।"

আপনি আশ্চর্য হবেন যে, এর জবাবে শায়খ আলবানীর পক্ষে কোন সাহাবী, কোন তাবেয়ী, কোন ফকীহ ইমাম বা কোন মুহাদ্দিস ইমামের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, যিনি বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তদ্রূপ কোন মসজিদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি যে, অমুক ঐতিহাসিক মসজিদে তারাবীর নামায বিশ রাকাআত নয়, আট রাকাআত হত! তবে ইলমের আমানতদারী ক্ষুণ্ন করে তিনি ইমাম মালেক (রহ.) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি বিশ রাকাআত তারাবীর নামায পড়তে নিষেধ করতেন! 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন' অথচ ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাবের মৌলিকগ্রন্থ 'আলমুদাওয়ানা' যা ইমাম মালেক (রহ.)-এর ছাত্রদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়েছে তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তারাবীর নামায বিতরের তিন রাকাআতসহ সর্বমোট ৩৯ রাকাআত এবং তৎকালীন মদীনার

আমীর তারাবীর রাকাআত সংখ্যা কমাতে চাইলে মালেক (রহ.) তাকে নিষেধ করেন। (আল মুদাওওনাতুল কুবরা ১/১৯৩)

আরো মালেকী মাযহাবের কিতাব আল-ইসতিযকার ৫/১৫৭; বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/২৪৬; আল মুনতাকা ১/২০৮-২১০

অথচ শায়খ আলবানী মরহুম, ইমাম মালেক (রহ.) সম্পর্কে বলে দিলেন যে, তিনি বিশ রাকাআত তারাবী থেকে নিষেধ করতেন। দলীল কী?! দলীল হল জুরী নামক জনৈক শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ইমাম মালেক (রহ.) সম্পর্কে এই কথা বলেছেন। অথচ শায়খ আলবানী খুব ভালভাবেই জানেন যে, জুরী নামক এই ব্যক্তি আসলে কে তার কোন ঠিকানাই পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু পরিষ্কার যে এই ব্যক্তি ইমাম মালেক (রহ.)-এর অনেক পরের লোক। অথচ ইমাম মালেক (রহ.) পর্যন্ত না কোন সনদের উল্লেখ আছে, না মধ্যবর্তী কোন ব্যক্তির উদ্ধৃতি!

প্রশ্ন এই যে, মালেকী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য হাদীস-ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ, ফিকহ ও ফাতাওয়ার মৌলিক কিতাবসমূহ এড়িয়ে গিয়ে; বরং এসব গ্রন্থে যে পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে তার বিপরীতে এক অজ্ঞাত মাজহুল লোকের বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম মালেক (রহ.)কে নিজের অনুসরণীয় ব্যক্তি সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা উপরন্তু (নাউযুবিল্লাহ) বিশ রাকাআত তারাবীর উপর আপত্তি করার এই বিদআতের ব্যাপারে, এটা কোন ধরনের দিয়ানাতদারী আর কী ধরনের আমানতদারী! অথচ ইমাম মালেক (রহ.)-এর যুগ কেন তাঁর পরে শত শত বছর পর্যন্ত এই বিদআতের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

মোটকথা এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত শুধু আট রাকাআত তারাবীর কোথাও কোন অস্তিত্ব ছিল না। সাহাবা-যুগ, তাবেয়ী-যুগ, তাবে-তাবেয়ী-যুগ এবং এরপরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস বা ফিকহের কোন ইমামকে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, যিনি বলেছেন, তারাবীর নামায শুধু আট রাকাআতই যথেষ্ট, বিশ রাকাআত পড়ার কোন প্রয়োজন নেই, অথবা নাউযুবিল্লাহ, আট রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়া বিদআত, যা বর্তমানের কিছু সালাফী ও অধিকাংশ লা-মাযহাবীর বক্তব্য।

বর্তমান শতাব্দীতে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.) 'রাকাআতে তারাবীহ'-তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা নামে একটি গবেষণাধর্মী কিতাব লিখেছেন যা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৭ হিজরীতে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, তারাবীর নামায আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ রাখা এবং বিশ রাকাআতের উপর আপত্তি করার এই মতবাদ পেছনের শতাব্দীগুলোতে ছিল না। এটা লা-মাযহাবীদের আবিষ্কার। সাহাবা-যুগ থেকে নিয়ে লা-মাযহাবীদের এই ইজমা বিরোধী মতের উদ্ভাবনের

আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে বারো শ' বছরের আমলে মুতাওয়ারাস-উম্মাহর সম্মিলিত অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এক এক শতাব্দী করে তিনি তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় অর্ধ-শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে আজ পর্যন্ত কোন লা-মাযহাবীর পক্ষে এটি খণ্ডন করা সম্ভব হয়নি। বস্তুত তা সম্ভবও নয়।

তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হওয়ার দলীল

ভূমিকা : (১) শরীয়তের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় দলীল হল কুরআন কারীম। এরপর সুন্নাহর স্থান। কিন্তু সুন্নাহ সম্পর্কে কতিপয় মানুষের এই ধারণা আছে যে, যেসব হাদীস সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বা কাজ হিসাবে সহীহ বর্ণনা-পরম্পরায় এসেছে শুধু তাই সুন্নাহ। এই ধারণা ঠিক নয়। সুন্নাহ হল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশাবলীর নাম। এটা আমাদের কাছে সাধারণত মৌখিক বর্ণনা-ধারার মাধ্যমেই পৌছে থাকে এবং সাধারণ পরিভাষায় এইসব মৌখিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত রেওয়ায়াতকেই 'হাদীস' বলা হয়। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ কোন শিক্ষা বা নির্দেশনা আমাদের কাছে মৌখিক বর্ণনার স্থলে কর্মের ধারাবাহিকতায় পৌছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম নবীজী থেকে কর্মের মাধ্যমে তা গ্রহণ করেছেন, তাদের নিকট থেকে তাবেয়ীগণ এবং তাদের নিকট থেকে তাবে-তাবেয়ীগণ গ্রহণ করেছেন। এভাবে প্রত্যেক উত্তরসূরী তার পূর্বসূরী থেকে কর্মের মধ্য দিয়ে নবীজীর সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেন। নবী-শিক্ষার এই প্রকারটিকে পরিভাষায় 'আমলে মুতাওয়ারাস' বা 'সুন্নতে মুতাওয়ারাসা' বলে।

নবী-শিক্ষা ও নবী-নির্দেশনার অনেক বিষয় এই পথেই পরবর্তীদের নিকটে পৌছেছে। এগুলো যদি মৌখিক বর্ণনাসমূহের মধ্যেও তালাশ করা হয় তাহলে অনেক সময় এমন হয় যে, হয়ত এ বিষয়ে কোন মৌখিক বর্ণনা পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও তা হয় সনদের দিক থেকে যয়ীফ। এখানেই স্বল্প-জ্ঞান কিংবা স্বল্প-বুঝের লোকেরা বিভ্রান্ত হয়। তারা যখন বিশুদ্ধ মৌখিক বর্ণনাসূত্রে বিষয়টি খুঁজে পায় না তো নবীজীর এই শিক্ষাটিকেই অস্বীকার করে বসে। অথচ মৌখিক সাধারণ বর্ণনা-ধারার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী তাওয়ারুস তথা ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মধারার মাধ্যমে বিষয়টি সংরক্ষিত।

২. তদ্রূপ নবী-শিক্ষার একটি অংশ হল যা আমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত আছে। বিষয়টি একটু খোলাসা করে বলি। সাহাবায়ে কেরামের অনেক নির্দেশনা এমন আছে যার ভিত্তি শরীয়তসম্মত কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর। এগুলো শরীয়তের দলীল

হিসেবে স্বীকৃত। আবার তাদের কিছু নির্দেশনা ও কিছু ফাতাওয়া এমন আছে যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা বা কাজ থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্যকে শিখানোর সময় উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। কেননা প্রেক্ষাপট থেকে এ কথা স্পষ্ট ছিল যে, তাঁরা নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনার ভিত্তিতেই এ বিষয়টি শিক্ষা দিচ্ছেন। এজন্য ইমামগণের সর্বসম্মত নীতি হল, সাহাবায়ে কেরামের যে ফাতাওয়া বা নির্দেশনার ব্যাপারে এটা সুনিশ্চিত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা-নির্দেশনা থেকেই তা গৃহীত, এতে সাহাবীর ইজতিহাদ বা কিয়াসের কোন প্রভাব নেই তা মারফূ হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত। কোন মাসআলায় এর মাধ্যমে প্রমাণ দেওয়া মারফূ হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়ার শামিল। পরিভাষায় একে 'মারফূ হুকমী' বলা হয়। নিঃসন্দেহে এর ভিত্তি কোন মারফূ হাকীকী বা স্পষ্ট মারফূর উপর। তবে অপরিহার্য নয় যে, হাদীসের কিতাবে সেই স্পষ্ট মারফূ হাদীসটি সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকবে। যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অভাব রয়েছে তারা এখানেও পদস্খলনের শিকার হয় এবং নবীজীর এই শিক্ষাটিকেই অস্বীকার করে বসে আর বলতে থাকে যে, এর কোন ভিত্তি পাওয়া গেল না, অথচ মারফূ হুকমীর সূত্রে প্রমাণিত হওয়াও দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

৩. সহীহ হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সুন্নাহ্‌র পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্‌কে অনুসরণ করার এবং তাকে মজবুতভাবে অবলম্বন করার আদেশ করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ....، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"মনে রেখো! আমার পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে তারা বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাহ্‌ ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাহ্‌কে আকড়ে রাখবে। একে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে প্রাণপণ করে কামড়ে রাখবে... এবং তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ে) নবআবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রতিটি নবআবিষ্কৃত বিষয় বিদআত। আর প্রতিটি বিদআত হল গোমরাহী।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৭; জামে তিরমিযী ৫/৪৩; হাদীস ২৬৭৬; মুসনাদে আহমদ ৪/১২৬, হাদীস ১৬৬৯২; সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস ৪২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫)

জামে তিরমিযীর ২২২৬ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে খেলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বছর হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং নবীজীই করে গেছেন। সে হিসেবে নবী-পরিভাষায় খুলাফায়ে রাশেদীন চারজন– ১. আবু বকর (রা.), ২. উমর (রা.), ৩. উসমান (রা.), ৪. আলী (রা.)। আলী (রাযি.)-এর শাহাদাত ৪০ হিজরীর রমযানে হয়েছে।

যেহেতু খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা জেনেছিলেন যে, তাঁদের জারিকৃত সুন্নতসমূহ নবী-শিক্ষার ভিত্তিতেই হবে, তাঁদের সুন্নাহ্ নবীর সুন্নাহ্রও অনুগামী এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মোতাবেক তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ব্যাপক ঘোষণা দিয়ে যান যে, তোমরা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্কে মজবুতভাবে আকড়ে রাখবে। সুতরাং যখন কোন বিষয়ে প্রমাণ হবে যে, এটি চার খলীফার কোন একজনের সুন্নাহ্ তখন তার অনুসরণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত নির্দেশই যথেষ্ট। এরপর আর এই চিন্তার প্রয়োজন থাকে না যে, তাঁদের এই সুন্নাহ্র ভিত্তি কী এবং তাঁরা এটা সুন্নত কোন নবী-শিক্ষা থেকে গ্রহণ করেছেন। এখানেও স্বল্প-জ্ঞান ও স্বল্প-বুঝের লোকদের অভ্যাস হল, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্র ভিত্তি হাদীসের কিতাবসমূহে খুঁজতে থাকেন। এরপর সহীহ সনদে নবীজীর স্পষ্ট কোন বাণী এ বিষয়ে না পেলে তাকে অস্বীকার করে বসে, এমনকি একে বিদআত আখ্যা দিয়ে দেয়। অথচ নিন্দিত ইখতিলাফ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ হল, আমার সুন্নাহ্ ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্কে মজবুতভাবে অবলম্বন কর। এর পর বলেছেন, 'বিদআত থেকে বেঁচে থাক। কেননা প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।' একটু চিন্তা করুন, যদি খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্ বিদআতই হত তাহলে নবীজীর এই ইরশাদের কোন অর্থ থাকে কি?

৪. 'সুন্নাহ'র পরে শরীয়তের তৃতীয় বুনিয়াদী দলীল হল ইজমা। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বউন্নত হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাজির-আনসার এবং অন্যান্য সাহাবীর ইজমা। এই ইজমা যদি ব্যাপকভাবে এবং অবিচ্ছিন্ন ও সম্মিলিতরূপে আমাদের পর্যন্ত পৌছে তবে তা শরীয়তের অনেক বড় অকাট্য দলীল। এটা থাকা অবস্থায় অন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। তদ্রূপ ইজমাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করার জন্য এই অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন নেই যে তা কীসের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়েছে। কেননা শরীয়ত নিজেই ইজমাকে দলীল সাব্যস্ত করেছে এবং যাঁদের মাধ্যমে ইজমা সম্পন্ন হয় তাঁদের ব্যাপারে আশ্বস্ত করে দিয়েছে যে, এঁরা কখনো গোমরাহীর

ব্যাপারে একমত হতে পারে না। কুরআন কারীমে তো সুস্পষ্টভাবে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের অনুসরণের আদেশ করা হয়েছে এবং সাবীলুল মুমিনীন (মুমিনদের অনুসৃত পথ) থেকে বিমুখ হওয়াকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ বলে ঘোষণা করেছে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মত, পথ ও রুচির সাথে যারা একাত্মতা পোষণ করে না তাদের অভ্যাস হল কোন মাসআলাতে শুধু উম্মতের ফকীহবৃন্দের নয়, এমনকি সাহাবায়ে কেরামের বিশেষত মুহাজির ও আনসারদের ঐকমত্য বিদ্যমান থাকলেও তারা ভিন্ন দলীল তালাশ করতে থাকে। অথচ শরীয়ত এই ইজমাকে দলীল সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু ওই সব বন্ধুরা শরীয়তের এই দলীলের সমর্থনে সহীহ্ সনদে বর্ণিত স্পষ্ট হাদীস না পেলে এই মাসআলাটিকেই অস্বীকার করে দেয়। কেউ তো আরো এক ধাপ বেড়ে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে শরীয়তের দলীল ইজমাকেই অস্বীকার করে বসে।

মনে রাখবেন, এ সব কিছুই হল মূর্খতা এবং তা শরীয়তের প্রতি অনাস্থা প্রকাশের সমার্থক। যদিও তা অসচেতনভাবেই হোক না কেন। কেননা, এর অর্থ হচ্ছে শরীয়ত যে বিষয়টিকে দলীল সাব্যস্ত করেছে তারা তাকে মেনে নিতে পারছেন না।

তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা বিষয়ক মাসআলাটি উপরোক্ত সকল দলীল দ্বারাই প্রমাণিত। অর্থাৎ 'খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্', 'মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ইজমা', 'মারফূ হুকমী', 'সুন্নতে মুতাওয়ারাসা' এবং 'ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা'। প্রত্যেকটি দলীলই প্রমাণ করে যে, তারাবীর নামায আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ মনে করা এবং বিশ রাকাআত মাসনুন হওয়াকে অস্বীকার করা একটি মারাত্মক ভুল। উপরন্তু এ বিষয়ে একটি স্পষ্ট মারফূ হাদীসও রয়েছে, যা উপরোক্ত দলীলসমূহের ভিত্তিতে প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বেশি আলোচনা করা তো সম্ভব নয়, তারাবীহ্ সংক্রান্ত স্বতন্ত্র কোন কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। এখানে সংক্ষেপে উপরোক্ত দলীলসমূহের প্রতি অনেকটা ইঙ্গিত করেই চলে যাব।

প্রথম দলীল : খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত

সহীহ্ বুখারী (হাদীস ২০১০, কিতাবু সালাতিত তারাবীহ্) এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো তারাবীর নামায জামাআতে পড়িয়েছেন। আবার কখনো কয়েক রাকাআত জামাআতের সাথে পড়ে হুজরায় চলে গেছেন এবং একাকী নামাযে রত থেকেছেন। (মুসলিম, হাদীস ১১০৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত জামাআত পড়াননি; বরং অধিকাংশ সময় একাকীই পড়তেন। তিনি নিজে কেন জামাআতের নিয়ম জারি করেননি তা উম্মতকে বলে গেছেন যে, (যেহেতু উম্মতের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির সময়টি ওহী অবতীর্ণ হওয়া এবং শরীয়তের বিধানসমূহ বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় ছিল, তাই) জামাআতের সাথে নিয়মিত নামায পড়লে এ নামাযটিও উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং তাঁর পরে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফতকালে ও উমর (রা.)-এর খেলাফতের শুরুতে এই অবস্থাই ছিল। অর্থাৎ এক ইমামের পেছনে ফরয নামাযের মত তারাবীর নামায জামাআতের সাথে আদায় করার ইহতেমাম ছিল না।

রমযানের কোন এক রাতে উমর (রা.) মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যান এবং দেখতে পান যে, মসজিদের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট জামাআত হচ্ছে। তিনি চিন্তা করলেন সকল নামাযীকে এক ইমামের পেছনে একত্র করে দেওয়া উচিত। তখন তিনি এই আদেশ জারি করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা.)কে ইমাম বানিয়ে দেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১০)

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী) মুয়াত্তা মালেকের অতুলনীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত-তামহীদ' এ বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) নতুন কিছু করেননি। তিনি তাই করেছেন যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন; কিন্তু শুধু এই আশংকায় যে, নিয়মিত জামাআতের কারণে তারাবীর নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে জামাআতের ব্যবস্থা করেননি। উমর (রা.) এই বিষয়টি জানতেন। তিনি দেখলেন, নবীজীর ইন্তেকালের পর এখন আর এই ভয় নেই। (কেননা ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং শরীয়ত নির্ধারণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়ে গেছে।) তখন তিনি নবী-পছন্দের অনুসরণ করে ১৪ হিজরীতে জামাআতের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তাআলা যেন এই মর্যাদা তাঁর জন্যই নির্ধারিত রেখেছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মনে এই চিন্তা আসেনি। যদিও সামগ্রিকভাবে তিনিই উত্তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন।" (আত-তামহীদ ৮/১০৮-১০৯)

এতদিন পর্যন্ত তারাবীহ একটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের আমল ছিল। জামাআত হলেও প্রত্যেকে পুরো তারাবীহ জামাআতেই পড়বেন এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাই তারাবীর রাকাআত-সংখ্যার ব্যাপারে বিশেষ আলোচনার পরিবেশই সেটা ছিল না। কিন্তু যখন মসজিদে নববীতে গুরুত্বের সাথে পুরো তারাবীহ একই ইমামের পেছনে পড়া হতে থাকে এবং তা হতে পারে শত শত মানুষের উপস্থিতিতে তখন তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা আর কোন গোপন বিষয়

থাকেনি। এখন সবাই প্রকাশ্যেই দেখতে পাচ্ছিলেন, তারাবীর নামায কত রাকাআত এবং সাহাবায়ে কেরাম এতদিন পর্যন্ত কত রাকাআত পড়তেন। দেখার বিষয় হল, সে সময় মসজিদে নববীতে তারাবীর নামায কত রাকাআত পড়া হত।

সহীহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের পাতা উল্টাতে থাকুন, সহীহ এবং মুতাওয়াতির– অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত– বিপুল সংখ্যক রেওয়ায়েত আপনি পেয়ে যাবেন, যেখানে দেখা যাবে, আশারায়ে মুবাশশারা– জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী– (আবু বকর সিদ্দীক রা. ছাড়া। কেননা তিনি তখন জীবিত ছিলেন না) মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণ এবং অন্যান্য সাহাবীর জীবদ্দশায় তারাবীর নামায বিশ রাকাআত পড়া হত এবং সবশেষে পড়া হত তিন রাকাআত বিতর। কয়েকটি রেওয়ায়াত দেখুন।

খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ফারূক (রা.)-এর যুগ

১. ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা (রহ.)-এর বিবরণ

ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা (রহ.) বলেন, হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) বলেছেন–

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً. قَالَ : وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ بِالْمِئِينَ، وَكَانُوا يَتَوَكَّؤُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

“তাঁরা (সাহাবা ও তাবেয়ীন) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগে রমযান মাসে বিশ রাকাআত পড়তেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তাঁরা নামাযে শতাধিক আয়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন এবং উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে তাঁদের (কেউ কেউ) লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।”

(আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬)

২. সাহাবী সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.)-এর অন্য আরেকটি বিবরণ হল–

كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ.

“আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগে বিশ রাকাআত এবং বিতর পড়তাম।” (আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭–২৬৮; মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, বায়হাকী ২/৩০৫)

সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.)-এর হাদীসটির সনদ সহীহ। অনেক হাদীসের ইমাম ও ফিকহের ইমাম এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন

হাফেযুল হাদীস তা সুস্পষ্টভাবে সহীহ বলেছেন। যেমন ইমাম নববী, তকীউদ্দীন সুবকী, ওলিউদ্দীন ইরাকী, বদরুদ্দীন আইনী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখ। দেখুন- আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব ৩/৫২৭; নাসবুর রায়াহ ২/১৫৪; উমদাতুল কারী শারহু সহীহিল বুখারী ৭/১৭৮; ইরশাদুস সারী শারহু সহীহিল বুখারী ৪/৫৭৮; আল-মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ-আলহাভী ২/৭৪ ইত্যাদি

সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.)-এর উপরোক্ত হাদীসটিকে আরবের গায়রে মুকাল্লিদ আলেম শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী মরহুম এবং হিন্দুস্তানের গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরীর আগে কোন হাদীসের ইমাম, ফিকহের ইমাম বা কোন একজন মুহাদ্দিস মুহাক্কিক আলিম আমাদের জানা মতে যয়ীফ বলেননি। পূর্ববর্তীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে এই দুই ব্যক্তি কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই এই (মুতাওয়াতিরে মা'নাবী) হাদীসটিকে যয়ীফ বলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ আলবানী মরহুম যে সব স্থানে অসাধুতার পরিচয় দিয়েছেন কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন তার মধ্যে বেশ কিছু বিষয় চিহ্নিত করেছেন সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সাবেক গবেষক মুহাদ্দিস ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ আনসারী তার 'তাসহীহু সালাতিত তারাবীহ ইশ্‌রীনা রাকাআতান ওয়ার্‌রাদ্দু আলাল আলবানী ফী তাযয়ীফিহী' কিতাবে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে। আর মাওলানা মুবারকপুরী যা কিছু করেছেন তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন মুহাদ্দিসুল হিন্দ হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.) তাঁর 'রাকাআতে তারাবীহ' কিতাবে। শ্রদ্ধেয় আলিমগণ এই দুটি কিতাব অধ্যয়ন করতে পারেন। আল্লাহ যদি তাওফীক দেন তাহলে ইচ্ছা আছে বাঙালী পাঠকদের হাতে এই কিতাব দুটির বাংলা অনুবাদ আমরা তুলে দিব।

৩. তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে রূমান (রহ.)-এর বিবরণ

كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগে মানুষ (সাহাবা ও তাবেয়ীন) রমযান মাসে ২৩ রাকাআত পড়তেন।' (মুয়াত্তা মালেক ৪০; আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬)

৪. তাবেয়ী আবদুল আযীয ইবনে রুফাই (রহ.)-এর বিবরণ

كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

"উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রমযান মাসে মদীনায় লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/২৮৫)

৫. তাবেয়ী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (রহ.)-এর বিবরণ

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

"উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়েন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/২৮৫)

এ ধরনের আরো অনেক রেওয়ায়াত আছে, যেগুলোর মূল বক্তব্য মুতাওয়াতির। ফলে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না। এরপরও আমাদের কিছু গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুর অভিযোগ হল, এই বর্ণনাগুলো 'মুরসাল' আর 'মুরসাল' হল যয়ীফ, কাজেই...!

অথচ এটা প্রমাণিত যে, তাবেয়ী ইমামগণের 'মুরসাল' বর্ণনা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। দলীলের আলোকে পূর্বসূরী ইমামগণ এ বিষয়ে একমত ছিলেন। এরপর যদি একই বিষয়ে একাধিক 'মুরসাল' রেওয়ায়াত থাকে কিংবা 'মুরসাল' বর্ণনার সমর্থনে উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন সম্মিলিত কর্মধারা বিদ্যমান থাকে তাহলে তার প্রামাণিকতার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। যারা 'মুরসাল'কে যয়ীফ বলেছেন তারাও এক্ষেত্রে 'মুরসাল'কে সহীহ বা দলীলযোগ্য মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে। কিন্তু আমি এখানে শুধু শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর বক্তব্যটিই উদ্ধৃতি করছি, যাকে আমাদের এই বন্ধুরাও অনুসরণীয় এবং 'আপন মানুষ' মনে করেন। তিনি বলেন–

الْمُرْسَلُ الَّذِي لَهُ مَا يُوَافِقُهُ أَوِ الَّذِي عَمِلَ بِهِ السَّلَفُ حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.

"যে 'মুরসালে'র অনুকূলে অন্য কোন কিছু পাওয়া যায় কিংবা পূর্বসূরীগণ যার অনুসরণ করেছেন তা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।" (ইকামাতুদ দলীল আলা বুতলানিত তাহলীল, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৪/১৭৯)

আরো দেখুন : মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/২৭১; মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়া ৪/১১৭

মোটকথা, উপরোক্ত পাঁচটি রেওয়ায়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য সহীহ রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এবং সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগ থেকে চলে আসা সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন কর্মের ভিত্তিতে আলেমগণের সর্ববাদীসম্মত বক্তব্য এই যে, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত তারাবীহ হত।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এ প্রসঙ্গেই বলেছেন–

إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

"এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রমযানের তারাবীতে মুসল্লীদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়তেন এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তেন।" (মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/১১২-১১৩)

বিশ রাকাআত তারাবী সম্পর্কে তিনি আরো বলেন–

ثَبَتَ مِنْ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্ এবং মুসলিম জাতির সম্মিলিত কর্ম দ্বারা এটি প্রমাণিত।" (মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/১১৩)

খলীফায়ে রাশেদ উসমান যিন-নূরাইন (রা.)-এর যুগ

হিজরী ১৪ সাল থেকে ফারূকে আযম (রা.)-এর শাহাদত পর্যন্ত মোট ১০ বছর হযরত উসমান যিননূরাইন (রা.)-এর উপস্থিতিতেই বিশ রাকাআত তারাবীহ হয়েছে। তিনি এর উপর কোন আপত্তি করেননি।

এছাড়া আস্-সুনানুল কুবরা, বায়হাকীর উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত প্রথম হাদীসটিতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত আছে যে, উসমান (রা.)-এর যুগে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়া হত।

উপরন্তু তিনি যদি নতুন কোন ফরমান জারি করতেন তাহলে অবশ্যই ইতিহাসের পাতায় তা সংরক্ষিত থাকত।

খলীফায়ে রাশেদ আলী ইবনে আবি তালেব (রা.)-এর যুগ

৬. বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আবু আবদুর রহমান আসসুলামী (রহ.)-এর বিবরণ

عَنْ عَلِيٍّ : دَعَا الْقُرَّاءَ فِيْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً، وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ.

"আলী (রা.) রমযানে কারীগণকে ডাকলেন এবং তাঁদের একজনকে আদেশ করলেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়েন এবং আলী (রা.) তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়তেন।" (আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬-৪৯৭)

৭. তাবেয়ী আবুল হাসান (রহ.)-এর বিবরণ

إِنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

"আলী (রা.) এক ব্যক্তিকে আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়েন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/২৮৫)

উপরোক্ত রেওয়ায়াত দুটির সনদ গ্রহণযোগ্য। পারিভাষিক শব্দে প্রথমটির সনদ حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ এবং দ্বিতীয়টির সনদ–

حَسَنٌ لِذَاتِهٖ عَلٰى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَسْتُوْرَ مِنْ طَبَقَةِ التَّابِعِيْنَ حُجَّةٌ

দেখুন আল-জাওহারুন নাকী, ইবনুত তুরকুমানী ২/৪৯৫–৪৯৭; রাকাআতে তারাবীহ, মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী ৭৭–৯০

মনে রাখবেন, ৬ নম্বরে উল্লিখিত রেওয়ায়াতটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ গ্রন্থে (২/২২৪) এবং ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) 'আল-মুন্তাকা গ্রন্থে (৫৪২) দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, আলী (রা.) তারাবীর জামাআত, রাকাআত-সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর নীতির উপরই ছিলেন।

হযরত আলী (রা.) যে বিশ রাকাআত তারাবীহ শিক্ষা দিয়েছেন তা এ থেকেও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের আমলও এরূপ ছিল। যেমন, শুতাইর ইবনে শাকাল, আবদুর রহমান ইবনে আবী বাক্‌রা, সায়ীদ ইবনে আবিল হাসান, সুয়াইদ ইবনে গাফালা এবং আলী ইবনে রাবীআহ। এঁরা সবাই স্ব স্ব স্থানে অনেক বড় ইমাম ছিলেন এবং এঁরা সবাই তাবেয়ীনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের সবার ব্যাপারেই হাদীসের কিতাবসমূহে বিশ রাকাআত পড়ার অনেক রেওয়ায়াত সহীহ সনদে বিদ্যমান আছে।

দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/২৮৫; আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬; কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ ইবনে নাস্‌র আল-মারওয়াযী ২০০–২০২

এ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তার সারকথা হল, বিশ রাকাআত তারাবীহ খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.)-এর যুগে তাদের আদেশক্রমে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়া হত। হযরত উসমান (রা.) ও উমর ফারূক (রা.)-এর যুগে এবং নিজ খেলাফতকালে এমনটিই করেছেন। এটাই সুনির্ধারিত। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বিশ রাকাআতের বিরুদ্ধে একটি অক্ষরও কোথাও নেই।

কোন একটি বিষয় খুলাফায়ে রাশেদীনের কোন একজনের সুন্নাহ্ হিসেবে প্রমাণিত হলে তা মুসলিম উম্মাহর জন্য অবশ্য অনুসরণীয় হয়। এখন যদি কোন বিষয় তিনজন খলীফা থেকে প্রমাণিত হয় তাহলে সে বিষয়ে উম্মাহর করণীয় কী হবে তা সহজেই বোধগম্য! এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই অসিয়তটি পুনরায় স্মরণ করুন, "তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তোমরা আমার পরে আমার সুন্নাহ্ এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্কে আকড়ে রেখো। একে অবলম্বন করো এবং মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে রেখো। তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ে) সব ধরনের নবআবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, সকল নতুন জিনিস বিদআত। আর সকল বিদআত গোমরাহী।"

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীল : মুহাজির-আনসার এবং অন্য সকল সাহাবীর ইজমা

কুরআন কারীম সাহাবায়ে কেরামকে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করেছে। বিশেষ করে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের অনুসরণের আদেশ দিয়েছে। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) 'ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন' গ্রন্থে কুরআন কারীমের আয়াত ও হাদীস শরীফের আলোকে এ বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি দেখার মত ও পড়ার মত। (ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন ৪/৯৪–১১৯; শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফাত আওর সিরাতে মুসতাকীম, মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী ৩২৬–৩৫১)

যাহোক কোন বিষয়ে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তারাবীহ বিশ রাকাআত মাসনূন হওয়ার ব্যাপারে শুধু মুহাজির ও আনসার নয়, সকল সাহাবীর ঐকমত্য রয়েছে।

মসজিদে নববীতে ১৪ হিজরী থেকেই হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর ইমামতিতে প্রকাশ্যে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়া হত। সেই সময়ের মুসল্লী ও মুক্তাদী কারা ছিলেন? বলাবাহুল্য, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণই সেই মুবারক জামাআতের মুসল্লী ও মুক্তাদী ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম– যাদের নিকট থেকে অন্যান্য সাহাবী দ্বীন শিখতেন, যাঁরা কুরআনের শিক্ষা, হাদীস বর্ণনা ও ফিকহ-ফতওয়ার স্তম্ভ ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই তখন মদীনায় ছিলেন। দু একজন যাঁরা মদীনার বাইরে ছিলেন তাঁরাও মক্কা-মদীনার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং খলীফায়ে রাশেদের কর্ম ও সিদ্ধান্ত

সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতেন; তাঁদের একজনও কি বিশ রাকাআত তারাবীর বিষয়ে আপত্তি করেছেন? আপত্তি তো দূরের কথা, তাঁদের কর্মও তো অভিন্ন ছিল। খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবদ্দশায়ও এবং তাঁদের ইন্তেকালের পরেও। বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আতা ইবনে আবী রাবাহ মক্কী (রহ.) (২৭-১১৪ হিজরী) বলেন–

أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ.

"আমি লোকদেরকে (সাহাবা ও প্রথম সারির তাবেয়ীনকে) দেখেছি, তাঁরা বিতরসহ তেইশ রাকাআত পড়তেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/২৮৫)

আতা ইবনে রাবাহ (রহ.) তো নিজেই বলেছেন, আমি দুই শতজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি। (তাহযীবুল কামাল ১৩/৪৯)

অন্যান্য তাবেয়ী থেকেও এরূপ বিবরণ আছে। এই বাস্তবতাকেই ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) 'আল-ইস্‌তিযকার' কিতাবে নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন–

وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

"এটিই উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত এবং এতে সাহাবীগণের কোন ভিন্নমত নেই।" (আল-ইস্‌তিয্‌কার ৫/১৫৭)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ভাষায়–

إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَرَأَى كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ. لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ.

"এটা প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রমযানের তারাবীতে লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়তেন এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। তাই বহু আলেমের সিদ্ধান্ত, এটিই সুন্নত। কেননা, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই বিশ রাকাআত পড়িয়েছেন এবং কেউ তাতে আপত্তি করেননি।" (মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ২৩/১১২-১১৩)

ইমাম আবু বকর কাসানী (রহ.) তারাবীর নামায বিশ রাকাআত না তার চেয়ে বেশি– যেমনটি 'হাররা'-এর হৃদয়বিদারক ঘটনার আগ থেকে মদীনাবাসীর আমল ছিল– এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন–

وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَصَلّٰى بِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ. فَيَكُونُ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ.

"অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের বক্তব্যই সঠিক। কেননা হযরত উমর (রা.) রমযান মাসে সাহাবায়ে কেরামকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর ইমামতিতে একত্র করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা.) তাদেরকে নিয়ে প্রতি রাতে বিশ রাকাআতই পড়তেন। কোনো সাহাবী এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেননি। সুতরাং এটা তাদের ইজমাকে প্রমাণ করে।" (বাদায়েউস সানায়ে ১/৬৪৪)

ইমাম ইবনে কুদামা মাকদেসী (রহ.) বলেন–

مَا فَعَلَهُ عُمَرُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي عَصْرِهِ أَوْلٰى بِالْاِتِّبَاعِ.

"উমর (রা.) যা করেছেন এবং তাঁর খেলাফতকালে অন্যান্য সাহাবীগণ যে ব্যাপারে একমত হয়েছে, তা-ই অনুসরণের অধিক উপযুক্ত।"

(আল-মুগনী ২/৬০৪)

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যযুগে তারাবীর ব্যাপারে 'সাবীলুল মুমিনীন'– মুমিনদের পথ এই ছিল যে, তাঁরা বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়তেন এবং কেউ তাতে আপত্তি করতেন না। কেউ এটাকে নাজায়েযও বলতেন না কিংবা বিদআত বা হাদীস ও সুন্নাহর খেলাফও আখ্যা দিতেন না। এজন্য যারা বিশ রাকাআত তারাবীর উপর আপত্তি করে এবং তাকে সুন্নাহ বা হাদীসের খেলাফ বলে তারা 'সাবীলুল মুমিনীন' থেকে বিচ্যুতি হওয়াই পসন্দ করছেন।

কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত তাদের স্মরণ রাখা উচিত–

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সকল মুমিনের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" (সূরা নিসা : ১১৫)

চতুর্থ দলীল : মারফূ হুক্‌মী

মারফূ হুক্‌মী হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই হাদীস বা শিক্ষা যা বর্ণনার সাধারণ রীতি অনুসারে 'মওকূফ' হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নবীজীর হাদীস। উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহের সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী মারফূ হুক্‌মী মারফূ হাদীসের (নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনার)ই একটি প্রকার।

আমরা ইতিপূর্বে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ঐকমত্য এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা উল্লেখ করেছি। এ সবগুলো স্বতন্ত্র দলীল; কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে এগুলো পরোক্ষভাবে মারফূ হাদীস (তথা নবীজীর শিক্ষা।) কেননা নামাযের রাকাআত-সংখ্যা কী হবে তা শুধু কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। এজন্য শরীয়ত প্রতি নামাযের রাকাআত-সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছে। একথা ঠিক যে, নফল নামাযের রাকাআত-সংখ্যা নির্ধারিত নয়। হাদীস শরীফের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ দুই রাকাআত করে যত রাকাআত ইচ্ছা পড়তে পারে; কিন্তু তারাবীর নামায যেহেতু সুন্নতে মুয়াক্কাদা, তাই এর ব্যাপারে নফল নামাযের নিয়ম প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরও যদি সাধারণ নফল নামাযের নীতি এই সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাযের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় তাহলে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায় যে, যার যত রাকাআত ইচ্ছা সে তত রাকাআত পড়বে।

তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হবে তা তো এই নীতির আলোকে বলা যায় না। সুনির্দিষ্টভাবে কোনো একটি সংখ্যা নির্ধারিত হতে হলে তা শরীয়তের পক্ষ থেকেই হতে হবে। শুধু কিয়াস বা যুক্তির মাধ্যমে এটি সম্ভব নয়। সুতরাং বলতেই হবে সাহাবায়ে কেরাম তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা নবীজী থেকেই গ্রহণ করেছেন। উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহের নীতি হল কোন একজন সাহাবীর এমন কোন শিক্ষা বা নির্দেশনা যা কিয়াস বা ইজতিহাদের ভিত্তিতে হতে পারে না– যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দিতে পারেন না– তাই তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই গৃহীত বলে গণ্য করা হয় এবং তা মারফূ হুক্‌মী সাব্যস্ত হয়।

আমাদের আলোচ্য মাসআলাটি তো এক দুজন সাহাবীর নয়, সকল সাহাবীর সম্মিলিত কর্ম ও সিদ্ধান্তের ব্যাপার এবং তাদের মধ্যে বিশেষভাবে আশারায়ে মুবাশশারা ও মুহাজির-আনসারী সাহাবীগণের শিক্ষা ও নির্দেশনার ব্যাপার। তো এ ধরনের বিষয়ে যা ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় সাহাবায়ে কেরামের এই শিক্ষা মারফূ হুক্‌মী ছাড়া আর কী হতে পারে!

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এই বাস্তবতা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁর শাগরিদ 'কাযিল কুযাত' ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন। ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আল-ইখতিয়ার লি-তালীলিল মুখতার' এর বরাতে পূর্ণ কথাটি উল্লেখ করছি–

رَوٰى أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنِ التَّرَاوِيحِ وَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقَالَ : اَلتَّرَاوِيحُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَمْ يَتَخَرَّصْهُ عُمَرُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مُبْتَدِعًا وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ إِلَّا عَنْ أَصْلٍ لَدَيْهِ وَعَهْدٍ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ سَنَّ عُمَرُ هٰذَا وَجَمَعَ النَّاسَ عَلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَلَّاهَا جَمَاعَةً وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ، مِنْهُمْ عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَالْعَبَّاسُ، وَابْنُهُ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَمُعَاذٌ، وَأُبَيٌّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وَمَا رَدَّ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، بَلْ سَاعَدُوهُ وَوَافَقُوهُ وَأَمَرُوا بِذٰلِكَ.

"আসাদ ইবনে আমর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবু হানীফা (রহ.)কে তারাবীহ এবং এ ব্যাপারে উমর (রা.)-এর কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি এর উত্তরে বলেছেন, তারাবীহ সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং উমর (রা.) তা নিজের পক্ষ থেকে অনুমান করে নির্ধারণ করেননি। তিনি এ ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কারও করেননি। তিনি দলীলের ভিত্তিতে এবং নবীজী থেকে প্রাপ্ত কোন নির্দেশনার ভিত্তিতেই এই আদেশ দান করেছেন। তাছাড়া যখন উমর (রা.) এই নিয়ম চালু করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর ইমামতিতে সকল মানুষকে একত্র করে দেন। যদ্দরুণ সবাই এই নামাযটি জামাআতের সাথে আদায় করতে থাকেন তখন সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। যাদের মধ্যে উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, আব্বাস, ইবনে আব্বাস, তালহা, যুবায়ের, মুআজ ও উবাই (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ বড় বড় মুহাজির ও আনসারী সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের কেউই এ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং সবাই তাঁকে সমর্থন করেছেন এবং তাঁর সাথে একমত হয়েছেন এবং অন্যদেরকে এই আদেশই করেছেন।" (আল-ইখতিয়ার লি-তালীলিল মুখতার, ইমাম আবুল ফযল মাজদুদ্দীন আল মাওসিলী ১/৭০)

পঞ্চম দলীল : সুন্নতে মুতাওয়ারাসা

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য যা একটি বাস্তব সত্য এবং যে কোনো বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী এবং শরীয়তের সত্যিকারের আলিমই এর সঙ্গে একাত্ম হবেন। এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, বিশ রাকাআতের বিষয়টি নবী-শিক্ষার উপরই ভিত্তিশীল; যে শিক্ষার উপর সাহাবা যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মধারা জারি হয়েছে। নবী-শিক্ষার এই প্রকারটিকে 'সুন্নতে মুতাওয়ারাসা' (ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মের মাধ্যমে অনুসৃত সুন্নাহ্) বলা হয়; যার প্রামাণ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা শুধু মৌখিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই নীতিটির ব্যাপারে আরো জানার জন্য শ্রদ্ধেয় আলেমগণ নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতে পারেন–

(١) اَلْجَامِعُ لِإِبْنِ أَبِيْ زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ ص ١١٧ (٢) تَرْتِيْبُ الْمَدَارِكِ، قَاضِيْ عِيَاض ١ : ٦٦ (٣) اَلْكِفَايَةُ فِيْ عِلْمِ الرِّوَايَةِ، خَطِيْبُ بَغْدَادِيْ ص ٣٢-٣٣، ٤٧٢ (٤) أَثَرُ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ فِيْ اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ شيخ محمد عَوَّامَة ص ٨٢-٩٥

আর এই সুন্নতে মুতাওয়ারাসা হল তারাবীর রাকাআত বিষয়ক মাসআলাটির মূল বুনিয়াদ। আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকেও তা প্রমাণিত হয়েছে। আরো স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি লক্ষ্য করুন।

তাবেয়ী আবুল আলিয়া হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন–

إِنَّ عُمَرَ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَصُوْمُوْنَ النَّهَارَ وَلَا يُحْسِنُوْنَ أَنْ يَقْرَؤُوْا، فَلَوْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ، وَلٰكِنَّهُ حَسَنٌ، فَصَلّٰى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

"হযরত উমর (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.)কে রমযান মাসে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার আদেশ করতে গিয়ে বলেন, লোকেরা দিনে রোযা রাখে কিন্তু রাতের বেলা উত্তমরূপে কুরআন পড়তে পারে না। আপনি যদি রাতে তাদের সামনে কুরআন পড়তেন। হযরত উবাই (রা.) উত্তরে বললেন, আমীরুল

মুমিনীন! এ বিষয়টি তো আগে ছিল না। উত্তরে তিনি বললেন, তা আমি জানি; কিন্তু এটা ভাল। এরপর হযরত উবাই তাদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত নামায পড়েন।" (আল-আহাদীসুল মুখতারাহ, ইমাম জিয়াউদ্দীন মাকদেসী ১/৩৮৪; তাসদীদুল ইসাবা ৮০; মুসনাদে আহমাদ ইবনে মানী-কানযুল উম্মাল ৮/৪০৮, হাদীস ২৩৪৭১)

মুসনাদে আহমদ ইবনে মানী-এর সনদ এই মুহূর্তে আমাদের সামনে নেই; কিন্তু আল-আহাদীসুল মুখতারাহ'– যা সহীহ হাদীসের একটি উত্তম সংকলন– এর সনদ খোদ শায়খ আলবানী মরহুম তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং একে যয়ীফ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হল সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের এবং সেই সনদে বর্ণিত হাদীসটির বক্তব্য অন্যান্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সহীহ।

এই হাদীসে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কয়েকটি ছোট ছোট জামাআতকে একত্র করে এক ইমামের পেছনে একটি বড় জামাআত বানিয়ে দেওয়া একটি ব্যবস্থাপনাগত বিষয়। শরীয়তের পক্ষ থেকে তা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল নেই; বরং তা শরীয়তের রুচির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। তথাপি উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এ ব্যাপারে নিজের সংশয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন–

هٰذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ

'এভাবে এক জামাআতে তারাবীহ পড়ার ব্যবস্থা তো আগে ছিল না।'

হযরত উমর (রা.) তাঁকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলে তিনি সম্মত হন। কিন্তু তারাবীর রাকাআত-সংখ্যার ব্যাপারে তাকে কিছু বলতে হয়নি। তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়িয়েছেন। এটা কীভাবে সম্ভব হল? যদি বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে তাঁর কাছে নবী-আদর্শ বিদ্যমান না থাকত তাহলে তো তিনি আরো শক্তভাবে বলতেন–

إِنَّ هٰذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ

'এই বিষয়টি তো আগে ছিল না।'

তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা তো কোন ব্যবস্থাপনাগত বিষয় নয়, শরীয়তের বিষয় এবং শরীয়তের একটি বিধান। যদি প্রথম থেকে অন্য কোন রীতি থাকত, যেমন ধরুন প্রথমে আট রাকাআত ছিল, এখন নতুন করে বিশ রাকাআত শুরু হচ্ছে তাহলে যিনি একটি ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে বলেন, এ বিষয়টি আগে ছিল না, তার অবস্থান শরীয়তের বিধান-বিষয়ক ব্যাপারে কী হবে? কিন্তু না উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এ বিষয়ে কোন আপত্তি করেছেন, না আশারায়ে মুবাশশারার কেউ, না কোন মুহাজির বা আনসারী সাহাবী আর না অন্য কোন সাহাবী। যদি তাদের

নিকটে বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে কোন নবী-শিক্ষা না থাকত বরং এর বিপরীতে আট রাকাআতের শিক্ষাই থাকত তাহলে তাঁরা সবাই কীভাবে নিশ্চুপ থাকেন? কীভাবে নিজেরা বিশ রাকাআত পড়তে থাকেন? আর কীভাবেই বা মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত হওয়ার উপর সম্মত থাকেন?

একেতো এ বিষয়টি কিয়াস বা ইজতিহাদের ভিত্তিতে সমাধা করার মত নয়; তাছাড়া কোন বিশুদ্ধ বর্ণনায় নেই যে, হযরত উমর (রা.) তারাবীর রাকাআত সংখ্যার ব্যাপারে মুহাজির বা আনসারীদের সাথে কোন পরামর্শ করেছেন; অথচ শরীয়ত এবং ব্যবস্থাপনা উভয় ধরনের বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করাই তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল। তো কোন ধরনের পরামর্শ ছাড়া কীভাবে সবাই বিশ রাকাআতের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলেন? কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের এই ঐকমত্যের পেছনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিষয়ক শিক্ষা ও নির্দেশনাই কার্যকর ছিল। যদি তারাবীর বিষয়ে তাদের কাছে নবী-শিক্ষা এটাই হত যে, তারাবীহ কেবল আট রাকাআতই হতে হবে, তাহলে না হযরত উবাই বিশ রাকাআত পড়াতেন, না মুহাজির-আনসার ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকতেন।

দ্বীনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সংবেদনশীলতা সম্পর্কে যাদের সামান্য ধারণা আছে তারা এ বিষয়টি খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। এই অবনতির যুগেও কোন বিদআতের সূচনা ঘটলে উলামায়ে কেরাম তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেন; তো একটু চিন্তা করুন, সেই পুণ্যযুগের ব্যাপারে আপনার ধারণা কী হওয়া উচিত?

সেই আদর্শ-সমাজের ব্যাপারে এই কল্পনাও কি করা সম্ভব যে, সেখানে নবী-শিক্ষা ও নির্দেশনার পরিপন্থী একটি নতুন মতের উদ্ভব ঘটবে আর তাঁরা তাকে শরীয়ত হিসেবে গ্রহণ করে নিবেন? নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

সারকথা হল, বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে মুহাজির ও আনসারের ঐকমত্য, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের মূলে রয়েছে তারাবীহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ফরমান বা আমল– যা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্নভাবে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। একেই সুন্নতে মুতাওয়ারাসা বলে– যা হাদীস ও সুন্নাহর একটি উন্নত প্রকার এবং যার অনুসরণ করার আদেশ মুমিনদেরকে করা হয়েছে।

ষষ্ঠ দলীল : মারফূ হাদীস

এখন প্রশ্ন হল সেই নববী ফরমান বা নববী আমলের বিবরণ কোথায়? এর উত্তর আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, যে নববী-শিক্ষা সাহাবা যুগ থেকে ব্যাপক

ও অবিচ্ছিন্ন কর্ম-ধারার মাধ্যমে, মারফূ হুক্‌মীর মাধ্যমে, ইজমায়ে সাহাবার বা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের ভিত্তিরূপে পরবর্তী লোকদের কাছে পৌঁছেছে, তার ব্যাপারে মৌখিক বিবরণ-ভিত্তিক বর্ণনাধারার আর প্রয়োজন থাকে না। এসব ক্ষেত্রে কখনো মৌখিক বিবরণ সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকে, আবার কখনো যয়ীফ সনদে থাকে। কখনো একেবারেই থাকে না। (ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী ৬/১২৪)

কিন্তু যেহেতু মৌখিক বর্ণনা ধারার চেয়ে উপরোক্ত পন্থাগুলো প্রামাণ্যতার ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী, তাই উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয়কে শুধু এ কারণে যে, মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত নয়, অস্বীকার করার কোন সুযোগ শরীয়তে নেই। সাধারণ বিচার-বুদ্ধির আলোকেও এ বিষয়টি হাস্যকর যে, একদিকে দু'একজন বর্ণনাকারী থেকে প্রাপ্ত বিবরণকে শুধু মৌখিক বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে, গ্রহণ করা হবে, অপর দিকে নবীজীর যে শিক্ষা সুন্নতে মুতাওয়ারাসা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে তা অস্বীকার করা হবে। অথচ দ্বিতীয় বিষয়টি হাদীসে মুতাওয়াতিরের (বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারীর বিবরণের) মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত। তথাপি বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে উপরোক্ত শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল ও কর্মের একটি মৌখিক বিবরণও হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শায়বা রহ. (১৫৯–২৩৫ হিজরী) তাঁর মূল্যবান হাদীস গ্রন্থ আল-মুসান্নাফ-এ বলেন–

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ.

"আমাকে ইয়াযীদ ইবনে হারুন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে ইবরাহীম ইবনে উসমান বলেছেন, তিনি হাকাম থেকে, তিনি মিকসাম থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকাআত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন।" (আল-মুসান্নাফ ২/২৮৮)

এই হাদীসটি অন্যান্য প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থেও রয়েছে। যেমন আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদি আব্‌দ ইবনে হুমাইদ ২১৮, হাদীস ৬৫৩; আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬; আল-মুজামুল কাবীর, তবারানী

১১/৩১১, হাদীস ১২১০২; আল-মুজামুল আওসাত, তবারানী ১/৪৪৪, হাদীস ৮০২; আত-তামহীদ, ইবনে আবদুল বার ৮/১১৫; আল-ইসতিযকার ৫/১৫৬

এই হাদীসটির ব্যাপারে গায়রে মুকাল্লিদদের দাবি হল, এটি মওযূ। কিন্তু যখন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল যে, কোন হাদীসের ইমাম কিংবা অন্তত কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতিতে এর মওযূ হওয়া প্রমাণ করুন, শুধু মৌখিক দাবিতে কাজ হবে না, তখন তারা এর কোন উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম হননি।

এটা ঠিক যে, একদল মুহাদ্দিস এর সনদকে যয়ীফ বলেছেন। কেননা এর সনদে ইবরাহীম ইবনে উসমান নামক একজন রাবী রয়েছে যিনি যয়ীফ। (মনে রাখতে হবে যে, অগ্রগণ্য মতানুসারে ইবরাহীম ইবনে উসমানকে চরম যয়ীফ বা মাতরূক-পরিত্যাজ্য বলা ঠিক নয়। দেখুন আল-কামিল, ইবনে আদী ১/৩৮৯-৩৯২; তাহযীবুত তাহযীব ১/১৪৪; ইলাউস সুনান ৭/৮২-৮৪; রাকাআতে তারাবী, মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী ৬৩-৬৯; রিসালায়ে তারাবীহ, মাওলানা গোলাম রাসূল (আহলে হাদীস আলেম) ২৪-২৫

মওযূ ও যয়ীফের মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য। মওযূ তো হাদীসই নয়, মিথ্যুকরা একে হাদীস নামে চালিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে মাত্র। আর যয়ীফ অর্থ হল বিবরণটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। বলাবাহুল্য, সনদের কিছুটা দুর্বলতার কারণে বিবরণটিকে ভিত্তিহীন বলে দেওয়া যায় না। উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হল, যয়ীফ দুই প্রকার– এক. যে 'যয়ীফ' সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াতটির বক্তব্যও শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। অর্থাৎ এই বক্তব্যের অনুকূলে শরয়ী কোন দলীলের সমর্থন তো নেই-ই বরং তার বিপরীতে দলীল বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের যয়ীফ কোন অবস্থাতেই আমলযোগ্য নয়। দুই. যে রেওয়ায়াতটি 'যয়ীফ' সনদে বর্ণিত; কিন্তু তার বক্তব্যের সমর্থনে শরীয়তের অন্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের সিদ্ধান্ত হল এ ধরনের রেওয়ায়াতকে 'যয়ীফ' বলা হলে তা হবে শুধু 'সনদ' এর বিবেচনা এবং নিছক নিয়মের বক্তব্য। অন্যথায় বক্তব্য ও মর্মের বিচারে এটি সহীহ।

বিশ রাকাআত তারাবীর বিষয়ে সবশেষে উল্লেখিত রেওয়ায়াতটি এ ধরনের। অর্থাৎ শুধু সনদের বিবেচনায় দুর্বল; কিন্তু এর বক্তব্যের সমর্থনে ইতিপূর্বে উল্লেখিত পাঁচ ধরনের দলীলের শক্তিশালী সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এ ধরনের যয়ীফকে اَلضَّعِيْفُ الْمُتَلَقّٰى بِالْقَبُوْلِ বলে অর্থাৎ 'এমন হাদীস যার সনদ যয়ীফ, কিন্তু এর বক্তব্য অনুযায়ী সাহাবা যুগ থেকে গোটা উম্মতের আমল ছিল।' এই যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে উসূলে হাদীসের সিদ্ধান্ত

হল, তা সহীহ এবং দু এক সূত্রে বর্ণিত সাধারণ সহীহ হাদীসের তুলনায় এর স্থান ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।

উসূলে হাদীসের এই নীতির ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রের অনেক ইমামের এবং উসূলে হাদীসের কিতাবসমূহের অসংখ্য উদ্ধৃতি আমাদের কাছে রয়েছে। এখানে শুধু দুটি উদ্ধৃতি পেশ করেছি।

১. ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী (রহ.) উসূলে হাদীসের প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ "আননুকাত" এ লেখেন–

إِنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِذَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ عُمِلَ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، حَتَّى يَنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْمُتَوَاتِرِ.

'যয়ীফ হাদীস যখন ব্যাপকভাবে উম্মাহর (মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের) কাছে সমাদৃত হয় তখন সে হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে। এটাই বিশুদ্ধ কথা। এমনকি তখন তা হাদীসে মুতাওয়াতির (বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত) হাদীসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।" (আননুকাত আলা-মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ ১/৩৯০)

২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) "আননুকাত আলা-কিতাবি ইবনিস সালাহ" ১/৪৯৪ এ লেখেন–

وَمِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ الْقَبُولِ أَنْ يَتَّفِقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَدْلُولِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ حَتَّى يَجِبَ الْعَمَلُ بِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الأُصُولِ.

'হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি নিদর্শন এই যে, ইমামগণ সে হাদীসের বক্তব্যের উপর আমল করতে একমত হওয়া। এ ক্ষেত্রে হাদীসটি গ্রহণ করা হবে এবং এর উপর আমল অপরিহার্য হবে। উসূলের অনেক ইমাম এই মূলনীতি উল্লেখ করেছেন।'

এই সর্বস্বীকৃত নীতির আলোকে উপরোক্ত হাদীসটির সনদ এবং মতন (বক্তব্য অর্থাৎ তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হওয়া) বিষয়ে চিন্তা করুন। সনদ যয়ীফ হলেও মতন অর্থাৎ বক্তব্য সাহাবা যুগ এবং পরবর্তী সকল যুগের সম্মিলিত কর্মের মাধ্যমে সংরক্ষিত। এজন্য উপরোক্ত নীতির আলোকে সনদের দুর্বলতা এখানে কোন প্রভাব ফেলবে না; হাদীসের বক্তব্য অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীসের মতই অবশ্য পালনীয় হবে।

এজন্য অনেক আলেম বিশ রাকাআত তারাবীর আলোচনায় এই হাদীসটিও উল্লেখ করেন। যেহেতু এই হাদীস দ্বারা তাঁদের প্রমাণ গ্রহণ উসূলে হাদীস এবং উসূলে ফিকহের একটি সর্বস্বীকৃত নীতির উপরই ভিত্তিশীল তাই এ ব্যাপারে গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের আশ্চর্য হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এই হাদীসের ব্যাপারে আরো আলোচনা ইলাউস সুনান ৭/৮২-৮৪; মুহাদ্দিসে কাবীর হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.)-এর কিতাব 'রাকাআতে তারাবীহ ৬৩-৬৯ এবং মাওলানা আমীন সফদর (রহ.)-এর কিতাব 'তাহকীকে মাসআলায়ে তারাবীহ' ১/২০৫-২১৩ (মাজমূআয়ে রাসায়েল) ইত্যাদিতে দেখা যেতে পারে।

গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা যদি হাদীসের ইমামগণের অনুসরণে এই হাদীসকে 'যয়ীফ' বলে থাকেন তাহলে তাঁদেরই নীতি অনুসারে একে অবশ্য-আমলযোগ্য বলেও স্বীকার করে নিবেন- এই আশা করা অযৌক্তিক হবে কি?

যাহোক, উপরোক্ত পাঁচ ধরনের অকাট্য দলীল এবং আলোচ্য মারফূ হাদীসটির ভিত্তিতে- যা উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশ্যই আমলযোগ্য- তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা বিশ। অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরামের মত হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের ফতওয়া তা-ই। মালেকী মাযহাবে যদিও এই বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য আছে তবে তা রাকাআত-সংখ্যা বিশ থেকে কম হওয়ার বিষয়ে নয়। তাদের নিকট বিতরসহ তারাবীর সর্বমোট রাকাআত সংখ্যা ৩৯। (আল-মুদাওওনাতুল কুবরা ১/১৯৩)

তবে মালেকী মাযহাবের কোন কোন মুহাদ্দিস যেমন ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) প্রমুখ তারাবীর নামায ৩৬ রাকাআতের স্থলে ২০ রাকাআত পড়াকেই উত্তম ও অগ্রগণ্য মনে করেন।

গায়রে মুকাল্লিদদের দলীল সম্পর্কে কিছু কথা

এ পর্যন্ত উল্লিখিত সকল দলীলের বিরোধিতা করে এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর অনুসৃত পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা এই নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছেন (অর্থাৎ শুধু আট রাকাআত পড়া এবং বিশ রাকাআতকে বিদআত বা নাজায়েয আখ্যা দেওয়া।) তাদের কর্তব্য ছিল এই গর্হিত কর্মের কারণে অনুতপ্ত হওয়া, অথচ তারা গোটা মুসলিম উম্মাহকেই হাদীস ও সুন্নাহ বিরোধী আখ্যায়িত করতে আরম্ভ করেছেন আর নিজেদেরকে হাদীস অনুসারী বলে দাবি করতে শুরু করেছেন! কিন্তু তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, তারাবীর নামায আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং বিশ রাকাআত নাজায়েয হওয়ার পক্ষে আপনাদের কাছে কী দলীল রয়েছে তখন সর্বসাকুল্যে তাদের সঞ্চয় যা বের হয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. তারা তাহাজ্জুদ বিষয়ক একটি সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে তারাবীর ব্যাপারে প্রয়োগ করেন। আর এই প্রয়োগকে বৈধতা দেওয়ার জন্য বলে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নামাযেরই দুই নাম। যে নামায এগারো মাস তাহাজ্জুদ থাকে তাই রমযানে এসে তারাবীহ হয়ে যায়। তাদেরকে যখন চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল যে, তারাবীহ-তাহাজ্জুদ এক নামায এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন এবং আরো প্রমাণ করুন যে, তাহাজ্জুদের নামায আট রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়া যায় না, তখন তাদের পক্ষে কোন কথাই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। আর না কখনো সম্ভব হবে। মজার কথা হল, যখন তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তারাবীহ-তাহাজ্জুদ একই নামায– এ কথাটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন, তখন তারা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করার পরিবর্তে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)কে উদ্ধৃত করতে আরম্ভ করেছে! তাদের নীতি যেন এই, যে কথা মানব না খুলাফায়ে রাশেদীন বললেও তা মানব না, আর কোন বিশেষ 'কারণে' যদি মানতে হয় তাহলে কাশ্মীরীর কথাও শিরোধার্য!

আল্লাহর এই বান্দারা কাশ্মীরী (রহ.)-এর ওই দলীলহীন কথাটি তো মেনে নিয়েছে, কিন্তু তাঁর উস্তাদগণেরও উস্তাদ ফকীহুন নফস হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর স্বতন্ত্র প্রবন্ধ যাতে তিনি দলীল-প্রমাণ দ্বারা এই বাস্তবতা সাব্যস্ত করে দিয়েছেন যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটো ভিন্ন নামায– এটা আর তাদের নজরে পড়েনি। (তালীফাতে রশীদিয়া ৩০৬–৩২৩)

এই বন্ধুদের কর্মনীতির আরেকটি আশ্চর্যজনক দিক হল, তারা একদিকে বলেন তারাবীহ-তাহাজ্জুদ এক নামায, অপরদিকে বলেন, তারাবীহ আট রাকাআতের বেশি পড়া নাজায়েয বা বিদআত। অথচ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তাহাজ্জুদের রাকাআত সংখ্যা নির্ধারিত নয়। দুই রাকাআত করে যত ইচ্ছা পড়তে থাকুন এবং যখন সুবহে সাদিক হওয়ার আশংকা হবে তখন বিতর পড়ে নিন। দেখুন সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৯

অন্য হাদীসে এসেছে–

أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ.

"তোমরা (তাহাজ্জুদ) ও বিতর পাঁচ রাকাআত পড়, সাত রাকাআত পড়, নয় রাকাআত পড়, এগারো রাকাআত পড় কিংবা তার চেয়ে বেশি পড়।" (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৪২৯; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১১৭৮)

ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী (রহ.) প্রমুখ বলেছেন যে, হাদীসটি সহীহ। (নাইলুল আওতার, শাওকানী ৩/৪৩; আত-তালখীসুল হাবীর, ইবনে হাজার আসকালানী ২/১৪)

তাহাজ্জুদের যে হাদীস গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা তারাবীর ব্যাপারে প্রয়োগ করেন তা সহীহ বুখারী ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে এবং অন্যান্য মাসে চার রাকাআত করে আট রাকাআত এবং তিন রাকাআত বিতর– সর্বমোট এগারো রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়তেন না।

অথচ এটাও তাঁর সব সময়ের আমল ছিল না। কেননা খোদ আম্মাজান আয়েশা (রা.)-এর সূত্রেই তাহাজ্জুদের নামায ফজরের সুন্নত ছাড়া তেরো রাকাআত হওয়াও বর্ণিত আছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৬৪; ফাতহুল বারী ৩/২৬; কিতাবুত তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১০)

অন্যান্য সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায ইশার দুই রাকাআত সুন্নত ও বিতর ছাড়া কখনো কখনো সর্বমোট চৌদ্দ রাকাআত বা ষোল রাকাআত হত; বরং কোন কোন বর্ণনা থেকে আঠারো রাকাআত হওয়াও বোঝা যায়। (নাইলুল আওতার, শাওকানী ৩/২১–২২, হাদীস ৮৯৭; আত-তারাবীহু আকসারা মিন আলফি 'আম ফিল-মাসজিদিন নাবাবী, আতিয়্যা মুহাম্মাদ সালেম, সৌদি আরব ২১–২৩)

এতসব কিছু সত্ত্বেও তারা একদিকে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদকে এক নামায সাব্যস্ত করেন, অন্য দিকে তারাবীর নামায আট রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়াকে নাজায়েয বা বিদআত বলেন; অথচ তাহাজ্জুদ নামায সহীহ হাদীস অনুসারে আট রাকাআতের বেশি পড়াও জায়েয। এটা সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা নয় কি?

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটির ব্যাপারে তাদের কাছে সর্বশেষ নিবেদন এই যে, যদি এই হাদীসটি তারাবীর প্রসঙ্গে হত এবং তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা নির্ধারণই এ হাদীসের উদ্দেশ্য হত তাহলে স্বয়ং উম্মুল মুমিনীন মসজিদে নববীর বিশ রাকাআত তারাবীর উপর আপত্তি উত্থাপন করতেন। ১৪ হিজরী থেকে উম্মুল মুমিনীনের মৃত্যু সন ৫৭ হিজরী পর্যন্ত অবিরাম চল্লিশ বছর তাঁর হুজরা সংলগ্ন মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত তারাবীহ হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন কি কখনো এর উপর আপত্তি করেছেন? তাঁর কাছে তারাবীর রাকাআত সংখ্যার ব্যাপারে একটি অকাট্য হাদীস রয়েছে আর তাঁর সামনে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই হাদীসের বিরোধিতা হচ্ছে, তারপরও তিনি নিশ্চুপ থাকবেন? এটা কি কোনভাবেই সম্ভব?

বাস্তব কথা হল, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনবগত লোকদের পক্ষে এর চেয়েও অনেক অবাস্তব কথা মেনে নেওয়া সহজ। নতুবা এটা তো অতি স্পষ্ট কথা যে, যেহেতু হাদীসটির সম্পর্ক তারাবীর রাকাআত

সংখ্যার সাথে নয়, তাই তিনি কখনো একে বিশ রাকাআতের বিপরীতে পেশ করেননি।

২. তাদের উপস্থাপিত দ্বিতীয় দলীলটি হল ঈসা ইবনে জারিয়ার একটি বর্ণনা যা তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন–

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةً ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا. قَالَ : إِنِّي كَرِهْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ.

"রমযানের এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে আট রাকাআত এবং বিতর পড়লেন। পর দিন আমরা মসজিদে একত্র হলাম এবং আশা করছিলাম, তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন। সকাল পর্যন্ত আমরা এই অবস্থায়ই থাকলাম। নবীজী বললেন, আমি আশংকা করেছি যে, তোমাদের উপর বিতর ফরয করে দেওয়া হবে।"

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের প্রচেষ্টা এজন্য ঠিক নয় যে, ঈসা ইবনে জারিয়া একজন যয়ীফ রাবী। কতিপয় ইমাম তাকে মাতরূক (পরিত্যাজ্য, যার বর্ণনা দলীল বা সমর্থক দলীল কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়) এবং মুনকারুল হাদীস (ভুল ও আপত্তিকর কথাকে হাদীস হিসেবে, ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ণনাকারী) পর্যন্ত বলেছেন।

ইমাম ইবনে আদী (রহ.) তার উপরোক্ত হাদীসটিকে 'গায়রে মাহফূয' সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে আদী (রহ.)-এর ভাষায় 'গায়রে মাহফূয' শব্দটি মুনকার বা বাতিল রেওয়ায়াতের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। 'মুনকার' হচ্ছে যয়ীফ হাদীসেরই একটি প্রকার তবে তা এতই যয়ীফ যে, এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ বৈধ নয়।

দেখুন, তাহযীবুল কামাল ১৪/৫৩৩–৫৩৪; আল-কামিল, ইবনে আদী ৬/৪৩৬; আয্-যুয়াফাউল কাবীর, উকাইলী ৩/৩৮৩; ইতহাফুল মাহারাহ বিআতরাফিল আশারাহ, ইবনে হাজার ৩/৩০৯

এছাড়া এই রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, এটি রমযানের এক রাতের ঘটনা। যেহেতু সে সময় তারাবীর নামায জামাআতের সাথে পড়ার প্রচলন ছিল না, তাই এ রেওয়ায়াতটিকে সহীহ ধরে নিলেও এই সম্ভাবনা থাকে যে অবশিষ্ট রাকাআতগুলো জামাআত ছাড়া একাকী পড়ে নেওয়া হয়েছে। আর এটা নিছক অনুমান নয়, সহীহ মুসলিমে এ ধরনের এক ঘটনায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে,

فَصَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا 'এরপর কিছু নামায পড়েছেন, যা আমাদের কাছে পড়েননি।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১০৪)

মোটকথা একটি মুনকার এবং অতি দুর্বল রেওয়ায়াত (উপরন্তু যা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং মূল বিষয়ে অস্পষ্ট) দ্বারা উপরোক্ত অকাট্য দলীলসমূহের বিরোধিতা করা একদম ভুল। ভাবার বিষয় হল, যদি এই হাদীস সহীহ হত এবং এর দ্বারা তারাবী আট রাকাআত হওয়া প্রমাণিত হত তাহলে হযরত জাবের (রা.)-ই তো সর্বপ্রথম বিশ রাকাআতের বিপক্ষে এই হাদীসটি পেশ করতেন।

৩. তৃতীয় যে 'বস্তুটি' তাদের কাছে আছে তা-ও এই ঈসা ইবনে জারিয়ার বিকৃত বিবরণ যা হযরত উবাই ইবনে কা'ব-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ এর বর্ণনা সূত্রে সেই ঈসা ইবনে জারিয়া রয়েছে, যে রাবী হিসেবে নিতান্ত দুর্বল তদুপরি এটি যে তারাবীর ব্যাপারে তারও কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবত ঘটনাটি তাহাজ্জুদের ব্যাপারে ঘটেছিল। আর তা রমযানে হয়েছিল কিনা তাও সন্দেহপূর্ণ।

এসব বিষয় আরো বিস্তারিতভাবে জানতে হলে মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.)-এর "রাকাআতে তারাবীহ" (৪০-৪৩) অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

এখানেও মনে রাখা উচিত যে, যদি এই হাদীসটি সহীহ হত এবং এতে তারাবীর রাকাআত-সংখ্যাই উল্লেখিত থাকত তাহলে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) যখন তারাবীর ইমাম হলেন তখন আট রাকাআতই পড়াতেন, বিশ রাকাআত পড়াতেন না।

এসব বিষয় এবং অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত হাদীস দুটি যয়ীফ রাবী ঈসা ইবনে জারিয়ার স্মরণশক্তিজনিত দুর্বলতা থেকেই সৃষ্ট এবং এই দুটিও তার ওইসব ভুল বর্ণনারই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর কারণে হাদীস বিশারদ ইমামগণ তাকে 'মুনকারুল হাদীস' বা 'মাতরূক' সাব্যস্ত করেছেন।

আফসোসের বিষয় এই যে, গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা যয়ীফ সূত্রে বর্ণিত এমন হাদীস পরিত্যাগ করেন, যার বক্তব্য সঠিক এবং অন্যান্য অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে সহীহ হিসেবে প্রমাণিত। পক্ষান্তরে এমন সব যয়ীফ হাদীসকে গ্রহণ করেন যার সনদ 'অতি যয়ীফ' হওয়ার পাশাপাশি বক্তব্যও দলীলের ভিত্তিতে 'মুনকার' বা ভুল হওয়া প্রমাণিত!

৪. চতুর্থ এবং সর্বশেষ যে বস্তুটি তাদের কাছে রয়েছে তাও একটি ভুল বিবরণ। একজন বর্ণনাকারী হযরত উমর (রা.)-এর যুগের নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে ভুলক্রমে বিশের স্থলে এগারো রাকাআত উল্লেখ করলেন। আর একেই গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা দলীল বানিয়ে নিলেন। অথচ হযরত উমর (রা.)-এর যুগে তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হত, এতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। অনেক সহীহ রেওয়ায়াত, ইজমা ও ব্যাপক কর্মের মাধ্যমে তা

প্রমাণিত। ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) এবং অন্যান্য মুহাক্কিক আলিম বলেছেন যে, বিশের স্থলে এগারো উল্লেখ করা বর্ণনাকারীর ভুল। দেখুন- আল-ইসতিযকার ৫/১৫৬; রাকাআতে তারাবীহ ১২-২০

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ্, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ইজমা, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং অন্য সব অকাট্য দলীলের বিপরীতে তাদের কাছে এই চার 'বস্তু' রয়েছে। যার একটি হল তাহাজ্জুদের হাদীস, যা অন্যায়ভাবে তারাবীর ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়। দুটি মুনকার ও অতি দুর্বল রেওয়ায়াত, যা বর্ণনাগত দিক থেকে ভুল হওয়ার পাশাপাশি মূল বিষয়েই অস্পষ্ট আর সবশেষে একজন রাবীর ভুল বিবরণ, যিনি বিশের স্থলে ভুলক্রমে এগারো উল্লেখ করেছেন।

একটি সহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা এবং তিনটি মুনকার ও ভুল বর্ণনা সঙ্গে নিয়েই তারা গোটা উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নেমে পড়েছেন এবং বিশ রাকাআতকে নাজায়েয, বিদআত ও সহীহ হাদীসের বিরোধী ঘোষণা করেছেন!

কত ভাল হত, যদি তারা এই ভুল সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দ্বিতীয়বার চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং মৃত্যুর আগেই এই ভুলের সংশোধন করে মুসলিম উম্মাহর বিরোধিতা করে সীরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুতির দায়ভার থেকে মুক্ত হতেন!

বিশেষ জ্ঞাতব্য

তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা বিষয়ক এই আলোচনার পর- যা বর্তমান প্রেক্ষিতে কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে- আমরা মুসল্লী ভাইদেরকে একটি বিশেষ নসীহত পেশ করতে চাই। তা এই যে, আমরা যেন সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অমনোযোগিতা থেকে বেঁচে থাকি। অনেক মসজিদেই দেখা যায় নামায তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য রুকু-সিজদা, কওমা-জলসা ইত্যাদিতে তাড়াহুড়া করা হয়। এটা সংশোধন করা উচিত। কেননা ফরয বা নফল সকল নামাযেই রুকু, সিজদা, কওমা, জলসা ইত্যাদি ইতেদালের সাথে শান্তভাবে আদায় করা ওয়াজিব। এছাড়া নামায শুদ্ধ হবে না।

তদ্রূপ তারাবীতে এত তাড়াতাড়ি কুরআন তেলাওয়াত করা হয় যে, শব্দাবলীও ঠিকমত বোঝা যায় না। বলাবাহুল্য, এত দ্রুত পড়ে খতম করার চেয়ে খতমের চিন্তা না করে শান্তভাবে অল্প অল্প করে পড়াই উত্তম।

এ ধরনের আরো কিছু ত্রুটি আছে যা সংশোধন করে সহীহ পদ্ধতিতে নামায এবং কুরআন তেলাওয়াতের আমলটি করা জরুরি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দিন, আমীন।

সহীহ হাদীসের আলোকে ঈদের নামায

রমযানের রোযা এবং এ মাসের অন্যান্য খায়ের-বরকতের শোকরানা ছাড়াও আরো অনেক হেকমতের কারণে ঈদুল ফিতরের নামাযের হুকুম দেওয়া হয়েছে। সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে এই নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাকিদ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তা আদায় করেছেন। তাঁর মৌখিক নির্দেশনা ও বাস্তবে সম্পাদনের মাধ্যমে এর নিয়ম-পদ্ধতি উম্মতের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এই নামাযের নিয়ম-পদ্ধতি উল্লেখ করেছি।

ঈদের নামাযের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

১. ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহা কোন নামাযেই আযান-ইকামত নেই। এই দুই নামাযে জামাআত অপরিহার্য; তবে আযান-ইকামত নেই। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮৬)

২. উভয় ঈদের নামায ঈদগাহ বা খোলা মাঠে আদায় করা মাসনূন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮৯)

বিনা ওজরে মসজিদে আদায় করা অনুচিত।

৩. উভয় ঈদের নামায দুই রাকাআত করে। এর আগে-পরে কোন সুন্নত বা নফল নামায নেই। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮১; মুসনাদে আহমদ, ২/৫৭, হাদীস ৫১৯০)

৪. ঈদের নামায আদায় করার নিয়ম হল, প্রথমে মনে মনে ঈদের নামাযের নিয়ত করবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে কানের লতি পর্যন্ত হাত ওঠাবে। তারপর হাত বাঁধবে ও ছানা পড়বে। ছানা পড়া শেষ হলে 'আল্লাহু আকবার' বলবে এবং তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত ওঠাবে; এরপর হাত ছেড়ে দিবে। দুই-এক বার 'সুবহানাল্লাহ' পড়া যায় এ পরিমাণ সময় অপেক্ষা করে দ্বিতীয়বার তাকবীর দিবে এবং উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত ওঠাবে, এরপর হাত ছেড়ে দিবে। এবারও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কানের লতি

পর্যন্ত হাত ওঠাতে ওঠাতে তাকবীর দিবে এবং হাত বাঁধবে। এবার যথারীতি আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহা পড়বেন এবং অন্য একটি সূরা মিলাবেন। আর মুক্তাদীরা চুপ থাকবে। তারপর যথানিয়মে তাকবীর দিয়ে রুকূতে যাবে এবং রুকু-সিজদা সমাপ্ত করে দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় রাকাআতে ইমাম সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। আর মুক্তাদীরা চুপ থাকবে। ইমামের কিরাআত সমাপ্ত হওয়ার পর রুকূতে যাওয়ার আগে পূর্বের নিয়মে তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর দিবে এবং চতুর্থ তাকবীর দিয়ে রুকূতে যাবে। নামাযের অন্যান্য তাকবীরের মত বাড়তি ছয় তাকবীরও ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই দিতে হবে, তবে ইমাম উচ্চস্বরে ও মুক্তাদীরা অনুচ্চস্বরে তাকবীর দিবে। এরপর যথানিয়মে নামায শেষ করবে।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীরসহ মোট তাকবীর পাঁচটি। রুকূর তাকবীর হিসাব থেকে বাদ দিলে তাকবীর হয় চারটি। দ্বিতীয় রাকাআতে রুকূর তাকবীরসহ মোট তাকবীর চারটি। তাকবীর বিষয়ক হাদীসমূহ বোঝার জন্য এই বিষয়টা স্মরণ করা প্রয়োজন।

৫. ঈদের নামাযে যাহরী (উচ্চস্বরে) কিরাআত পড়তে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে কখনো সূরা 'আ'লা' ও সূরা 'গাশিয়াহ' আর কখনো সূরা 'কাফ' ও সূরা 'কামার' পড়তেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৮৭, ৮৯১)

৬. নামায শেষ হওয়ার পর দাঁড়িয়ে আরবী ভাষায় দুটি খুতবা দেওয়া মাসনূন এবং দুই খুতবার মাঝে বসাও মাসনূন। ঈদের খুতবা নামাযের পরে হবে, নামাযের আগে নয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৬২, ৯৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮৪; সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস ১২৮৯; মুসনাদুশ শাফেয়ী (কিতাবুল উম্ম) ৫/৪৭৩)

কোন কোন গায়রে মুকাল্লিদ বলে থাকেন যে, 'দুই ঈদে একটি করে খুতবা হবে'। একথা সহীহ হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর সর্ববাদীসম্মত কর্মের পরিপন্থী।

ঈদের নামাযে মোট তাকবীর কয়টি হবে

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, প্রথম রাকাইতে তাকবীরে তাহরীমা, অতিরিক্ত তাকবীর ও রুকূর তাকবীর মিলে পাঁচ তাকবীর হয়। রুকূর তাকবীর বাদ দিলে কিরাতের পূর্বের তাকবীর-সংখ্যা চার। আর দ্বিতীয় রাকাআতে ফাতেহা ও সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর যে তাকবীরসমূহ হয় রুকূর তাকবীরসহ তার সংখ্যা চার।

তাহলে এক হিসাবে প্রতি রাকাআতে তাকবীর সংখ্যা চারটি করে আটটি। আর অপর হিসাবে প্রথম রাকাআতে পাঁচ এবং দ্বিতীয় রাকাআতে চার সর্বমোট নয় তাকবীর। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে তিনটি করে ছয়টি। বাকিগুলো তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীর। একথাগুলো এজন্য বলা হল যে, হাদীস শরীফে তাকবীরের সংখ্যা এভাবেই এসেছে। এবার এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ লক্ষ্য করুন–

١. عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : حَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيْدٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقَالَ : لَا تَنْسَوْا، كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهٖ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهٗ.

رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ وَيَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ وَالْوَضِيْنُ وَالْقَاسِمُ كُلُّهُمْ أَهْلُ رِوَايَةٍ مَعْرُوْفُوْنَ بِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ، لَيْسَ كَمَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ الْآثَارَ الْأُوَلَ. فَإِنْ كَانَ هٰذَا الْبَابُ مِنْ طَرِيْقِ صِحَّةِ الْإِسْنَادِ يُؤْخَذُ فَإِنَّ هٰذَا أَوْلٰى أَنْ يُؤْخَذَ بِهٖ مِمَّا خَالَفَهٗ غَيْرُهٗ. قَالَ الرَّاقِمُ : أَرَادَ بِالْحَسَنِ الصَّحِيْحَ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَالْوَاقِعُ وَلَمْ يَكُنِ الطَّحَاوِيُّ مِمَّنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّحِيْحِ وَالْحَسَنِ.

১. "প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু আবদুর রহমান কাসেম (ইবনে আবদুর রহমান) বলেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিন আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং চারটি করে তাকবীর দিলেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করলেন, ভুলো না যেন। তারপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটিয়ে চার অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, জানাযার তাকবীরের মত (ঈদের নামাযেও চারটি করে তাকবীর হয়ে থাকে)।"

(তহাবী শরীফ, ২/৩৭১, কিতাবুয যিয়াদাত ১ম বাব)

এই হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী 'ছিকাহ' নির্ভরযোগ্য। ইমাম তহাবী (রহ.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী এঁদের বর্ণনাসমূহ সহীহ হওয়া একটি প্রসিদ্ধ কথা। ইমাম তহাবী (রহ.) আরো বলেছেন যে, এই হাদীসের সনদ ওই সব হাদীসের সনদ থেকে অধিক সহীহ যেখানে বারো তাকবীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

٢. عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : صَدَقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. قَالَ ابو عَائِشَةَ : وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي "الْمُصَنَّفِ" زِيَادَةٌ : فَمَا نَسِيتُ قَوْلَهُ أَرْبَعًا كَالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ.

أخرجه أحمد في "مسنده" ٤ : ٤١٦، وأبو داود في "سننه" ١ : ١٦٣.

২. "(প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম) মাকহুল (দামেস্কী) বলেছেন, আমাকে আবু হুরায়রা (রা.)-এর একজন সঙ্গী আবু আয়েশা (আলউমাভী) জানিয়েছেন যে, (কুফার আমীর) সাঈদ ইবনুল 'আস আবু মূসা আশআরী (রা.) ও হুযায়ফা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর-এ কয় তাকবীর দিতেন? আবু মূসা (রা.) উত্তরে বললেন, জানাযার তাকবীরের সমসংখ্যক (চার) তাকবীর দিতেন। হুযায়ফা (রা.) বললেন, তিনি ঠিক বলেছেন। আবু মুসা (রা.) আরো বললেন, আমি যখন বসরার আমীর হিসেবে সেখানে অবস্থান করছিলাম তখন আমি এভাবেই (চার) তাকবীর দিতাম।

আবু আয়েশা বলেন, সাঈদ ইবনুল 'আসের এই প্রশ্নের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আরো বলেন, আবু মুসা (রা.)-এর বাক্য 'জানাযার মত চার তাকবীর' এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১১৫০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৭৮, কিতাবু সালাতিল ঈদাইন, বাব নং ১২)

সনদের বিবেচনায় এই হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের এবং হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য হাদীসেরই একটি প্রকার। (আসারুস সুনান ৩১৪)[১]

সাহাবায়ে কেরামের ফতওয়া ও আমল

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, দুই ঈদের নামাযে (প্রতি রাকাআতে) জানাযার মত চার তাকবীর হবে। (আল-মুজামুল কাবীর, তাবরানী ৯/৩০৫, হাদীস ৯৫২২)

রেওয়ায়াতটির সনদ 'সহীহ'। হাইছামী "মাজমাউয যাওয়ায়েদ" গ্রন্থে (২/৪২২) বলেছেন, رِجَالُهُ ثِقَاتٌ 'রেওয়ায়াতটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।'

জানাযার মত দুই ঈদের তাকবীর চারটি হওয়ার ব্যাখ্যা খোদ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বিভিন্ন আলোচনায় বিদ্যমান রয়েছে। এখানে তার একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল–

عَنْ كُرْدُوسٍ قَالَ : أَرْسَلَ الْوَلِيدُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا عِيدُ الْمُسْلِمِينَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ فَقَالُوا : سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ، فَتِلْكَ خَمْسٌ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ فِي آخِرِهِنَّ، فَتِلْكَ تِسْعٌ فِي الْعِيدَيْنِ، فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

رواه الطبراني، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢ : ٢٠٥ : رجاله ثقات، وقال النيموي في "آثار السنن" ص ٣١٥ : "إسناده حسن". وله شواهد كثيرة بأسانيد صحيحة.

---

(١) الحديث سكت عليه أبو داود ثم المنذري بعده، فأقل أحواله أن يكون صالحا للعمل، وقال النيموي في "آثار السنن" ص ٣١٤ : "إسناده حسن". ولا وجه لإعلاله بابن ثوبان فإن الراجح فيه التوثيق، وما فيه من جرح لا ينزله عن درجة الحسن، ولذا ذكره الذهبي في رسالته : "من تكلم فيه وهو موثق" ص ١٣٣. وأبو عائشة من التابعين من طبقة الحسن وابن سيرين، وهو قرشي أموي، وناهيك أنه كان جليسا لأبي هريرة، وروى عنه إمامان : مكحول وخالد بن معدان، فهو أرفع مما قيل في التقريب من أنه مقبول، ولحديثه هذا شواهد صحيحة من مرفوع و موقوف.

"কুরদূস (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওয়ালীদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হুযায়ফা (রা.), আবু মাসউদ (রা.) এবং আবু মূসা আশআরী (রা.)-এর কাছে ইশার নামাযের পর একথা জিজ্ঞেস করার জন্য লোক পাঠাল যে, মুসলমানদের ঈদ অত্যাসন্ন। ঈদের নামাযের নিয়ম কী হবে? (সাহাবীগণ) সবাই (দূতকে) বললেন, আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ)কে জিজ্ঞেস করুন। লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি উত্তরে বললেন, (নামাযে) দণ্ডায়মান হবে এবং চার তাকবীর দিবে। এরপর সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা তেলাওয়াত করবে। তারপর রুকূর তাকবীর দিয়ে রুকূ করবে। (প্রথম রাকাআতে) এই পাঁচ তাকবীর হল। তারপর (দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য) দাড়াতে এবং সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা তেলাওয়াত করবে। তারপর চার তাকবীর দিবে ও শেষ তাকবীরের সময় রুকূ করবে। (দুই রাকাআতে) সর্বমোট নয় তাকবীর হল। (এটাই) দুই ঈদের (নিয়ম)। তাঁর এই নির্দেশনার সঙ্গে উপস্থিত সাহাবীগণ কেউই দ্বিমত করেননি।

উপরোক্ত বর্ণনায় তাকবীরের যে নিয়ম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) অপর তিন সাহাবীর উপস্থিতিতে শিক্ষা দিয়েছেন তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আনাস (রা.) এবং হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রা.) থেকেও 'সহীহ' সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের রেওয়ায়াতসমূহ মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৭৯-৮১; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৩/২৯৪-২৯৫ এবং তহাবী শরীফ ২/৩৭২-৩৭৩-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকেও এই নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। তবে শেষোক্ত তিন সাহাবীর রেওয়ায়েতে সাধারণ কিছু আপত্তির সুযোগ আছে।

ঈদের তাকবীর প্রসঙ্গে 'সাহাবায়ে কেরামের ফতওয়া ও আমল' শিরোনামে যে আলোচনা চলছে এ প্রসঙ্গে একটি মৌলিক কথা মনে রাখা খুব জরুরি। তা এই যে, নামাযে তাকবীর কয়টি হবে– তা কিয়াস ও যুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারণ

وأما إعلال البيهقي قائلا : "والمشهور أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه .... ولو كان عند أبي موسى فيه علم عن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل ابن مسعود"، ففيه نظر واضح، فالقصتان مختلفتان، احداهما لم يشهدها ابن مسعود، راجع سياقهما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره، وكان من شأن الصحابة عند الإفتاء أو التحديث الإحالة على غيره، ولو كان عنده علم، وهذا معروف من أمرهم، وأما أبو موسى الأشعري فهو القائل : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. يريد عبد الله بن مسعود.

করার মত বিষয় নয়। কেননা ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ওহীর উপর নির্ভরশীল। তাই এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের কোন শিক্ষা কেবল কিয়াস ভিত্তিক হওয়া সম্ভব নয়। এর বুনিয়াদ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত সাহাবীগণকে ঈদের নামাযের নিয়ম নবীজীই শিখিয়েছেন এবং তাঁরাও পরবর্তীদেরকে সেই নিয়মই শিক্ষা দিয়েছেন। এজন্য ঈদের নামাযের তাকবীর-প্রসঙ্গে যে নিয়ম আমরা একাধিক সাহাবীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছি একে তাঁদের কিয়াস বা যুক্তিনির্ভর মত আখ্যা দেওয়া– যা অনেক গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়ের অভ্যাস– একটি মারাত্মক অন্যায়। এ ধরনের কথাবার্তা সাহাবায়ে কেরামের শানে বেয়াদবির শামিল। কেননা তাদের কথার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতি পরিত্যাগ করে নিজেদের মন মতো একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

তাছাড়া এই শিরোনামের আগের শিরোনামে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। এরপর তো আর কোন কথাই বাকি থাকা উচিত নয়। অথচ তাদের আচরণে মনে হয় যে, তারা যেন এই সহীহ হাদীসগুলোকে 'যয়ীফ' সাব্যস্ত করার জন্য মরণপণ করে আছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়াত নসীব করুন।

ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) 'মুয়াত্তা'-এর দুইটি অতুলনীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত-তামহীদ' (১৬/৮৭) ও 'আল-ইসতিযকার' (৭/৪৯)এ এ ধরনের এক প্রসঙ্গে বড় সুন্দর কথা লিখেছেন–

ومَعلُوم أَنَّ هذا وما كَانَ مِثلَه لا يَكُونُ رأيا، لِأنَّه لا فَرقَ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ والاِجتِهادِ بَينَ سَبعٍ فِي هذا وأربعٍ، ولا يَكُونُ إلاَّ تَوقِيفا مِمَّن يَجِبُ التَّسلِيمُ لَه.

"যুক্তির বিচারে 'সাত' এবং 'চার' এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এজন্য এ ধরনের বিষয় কিয়াস বা যুক্তিনির্ভর হতে পারে না। এটা একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার ভিত্তিতেই হতে পারে।"

সারকথা, দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি এবং তাকবীর-সংখ্যা– যা ফিকহে হানাফীতে বলা হয়েছে এবং যে মোতাবেক অসংখ্য মানুষ ঈদের নামায আদায় করেন– তার ভিত্তি প্রথমত সহীহ হাদীস, দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা যা নবী-শিক্ষা থেকেই গৃহীত।

সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেয়ীগণ নামায শিখেছেন। হাদীস ও আসারের সংকলনসমূহ হাতে নিলে, শুধু মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা এবং শরহু মাআনিল আসার'ই যদি পাঠ করা হয় তাহলে, অনেক তাবেয়ী ইমামকে এই নিয়ম শিক্ষা দিতে এবং এই ফতওয়া প্রদান করতে দেখা যাবে, যা বিভিন্ন হাদীস ও আছারের উদ্ধৃতিতে আমরা ইতিপূর্বে লিখে এসেছি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে একটি পদ্ধতি মুসলিম উম্মাহর অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ এবং অগণিত আলেম উলামার মাধ্যমে অনুসৃত হয়ে আসছে আর আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা কলমের এক খোঁচাতেই তাকে 'গলদ' সাব্যস্ত করে ফেলছেন অথবা হুট করে বলে বসছেন যে, 'এই পদ্ধতি কিয়াস-নির্ভর। এর স্বপক্ষে না কোন সহীহ হাদীস আছে, আর না কোন যয়ীফ হাদীস'! আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়াত নসীব করুন এবং চোখের জ্যোতি ও দিলের নূর দুটোই দান করুন। যাতে তারা হাদীসের কিতাবসমূহে উল্লিখিত হাদীস ও আসারসমূহ দেখতে পান এবং তার মর্ম অনুধাবনে সক্ষম হন।

তাকবীর বিষয়ক ইখতেলাফের ধরন

সবশেষে এই বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, সাহাবায়ে কেরাম থেকে ঈদের নামাযের তাকবীর সংক্রান্ত আরো কিছু নিয়ম বর্ণিত আছে। সেসব নিয়মের মধ্যে বারো তাকবীরের নিয়মটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমাসহ বা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া (দুটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা অনুসারে) সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ তাকবীর। এই পদ্ধতিতে উভয় রাকাআতে তাকবীরসমূহ কিরাআতের আগে হয়। ফিকহের বেশ কয়েকজন ইমাম এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এবং অন্য দু' একজন সাহাবী থেকে এই পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে এবং এর সমর্থনে হাসান পর্যায়ের দু-একটি মারফূ হাদীসও রয়েছে।[১]

বারো তাকবীরের কথাও যেহেতু হাদীস শরীফে আছে, তাই এটিও একটি জায়েয পন্থা। কোন দেশে বা কোন ঈদগাহে যদি এই পদ্ধতিতে নামায হয় তাহলে সেখানে আপত্তি করার প্রয়োজন নেই। ঝগড়া-বিবাদের তো প্রশ্নই আসে

---

(١) وذلك إذا اعترفوا بمنهج أئمة الحنفية في النقد، وأما علي طريقة إخواننا غير المقلدين في جرح أدلة أئمة الفقه فتلك ضعيفة بالطريق الأولى كما يعلمون هم أنفسهم.

না। মনে রাখতে হবে, এ মাসআলার মধ্যে যে মতভেদ তা জায়েয-নাজায়েয নিয়ে নয়; বরং কোন পদ্ধতিটি উত্তম তা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী (রহ.) "মুয়াত্তা"-য় বলেন, দুই ঈদের তাকবীরের ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। সুতরাং তুমি যেকোন পদ্ধতিই গ্রহণ করতে পার, তবে আমাদের মতে সেই নিয়মই উত্তম যা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি প্রত্যেক ঈদে নয় তাকবীর বলতেন, প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীরসহ পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে রুকূর তাকবীরসহ চার তাকবীর। প্রথম রাকাআতের কিরাআত তাকবীরের পরে এবং দ্বিতীয় রাকাআতের কিরাআত তাকবীরের আগে পড়তেন। এটাই আবু হানীফা (রহ.)-এর মত।" (মুয়াত্তা মুহাম্মদ ১৪১)

ফিকহে হাম্বলীর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)ও বলেছেন যে, 'ঈদের তাকবীর প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ ছিল। তাঁদের অনুসৃত পন্থাগুলোর মধ্যে যে কোনটিই অবলম্বন করা যায়।'

(ফাতহুল বারী, ইবনে রজব হাম্বলী ৬/১৭৯)

ফিকহে মালেকীর সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) এই মতভেদের ব্যাপারে বলেন, 'এসব পদ্ধতির সবগুলোই জায়েয। কোনটিতেই কোন অসুবিধা নেই। সকল পদ্ধতিই সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই গ্রহণ করেছেন।' (আল-ইসতিযকার ৭/৫৪)

ফিকহে হাম্বলীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)ও তাকবীর-বিষয়ক এই মতভেদকে শুধু উত্তম-অনুত্তম মতভেদ সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, 'একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে অপর পদ্ধতিকে ভুল বলা বা তার উপর আপত্তি করা একটি ভ্রান্তি।' (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৪/২২৪; রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমীন, ইবনে তাইমিয়া ৪৫–৪৮, ৫৯–৬২)

কত ভালো হত যদি আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর এই অবস্থান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন! তারা তো নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী বলেই প্রকাশ করেন। কিন্তু কোথায় ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ইলম ও ফিকহ, তাকওয়া ও ইনসাফ, আর কোথায় তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত গায়রে মুকাল্লিদ সম্প্রদায়!!

সবশেষে যে প্রশ্নটি বাকি থাকে তা এই যে, যখন উভয় পন্থাই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং উভয় পন্থাই সহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রচলিত ছিল তো হানাফী ফকীহগণ প্রথম পদ্ধতি (যেখানে দুই রাকাআতে অতিরিক্ত তাকবীর সর্বমোট

ছয়টি) উত্তম বলছেন কেন? এর জবাব হল, এ পদ্ধতিটিকে উত্তম বলার অনেক কারণ আছে। যথা :

১. হাদীস শরীফে এই পন্থা অত্যন্ত তাকিদ ও গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এভাবে নামায পড়েছেন, নামায শেষে পুনরায় মৌখিকভাবে তা শিখিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন, তোমরা ভুলে যেয়ো না। এরপর হাতের আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন তাকবীরের সংখ্যা কয়টি হবে।

২. এ পদ্ধতি যে হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর সনদ অন্যান্য পদ্ধতির হাদীসগুলোর সনদের চেয়ে অধিক সহীহ ও শক্তিশালী।

৩. প্রবীণ ও বড় বড় সাহাবী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নিয়ম অনুযায়ী ঈদের নামায পড়েছেন। তাঁদের এক বড় জামাআত থেকে এই পদ্ধতিই বর্ণিত হয়েছে।

গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের এই দাবি যে, খুলাফায়ে রাশেদীন অন্য পদ্ধতিটি (বারো তাকবীর) অনুসরণ করেছেন, তা ঠিক নয়। কেননা, তারা যে বর্ণনার ভিত্তিতে এই দাবি করেন প্রথমত তার সনদ বা সূত্র 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। দ্বিতীয়ত সেই সনদে ইবরাহীম আল-আসলামী নামক এক বর্ণনাকারী আছে যে 'মাতরূক' (পরিত্যাজ্য)। এমনকি তাকে কায্যাব (মিথ্যাবাদী)ও বলা হয়েছে।

উপরোক্ত তিনটি কারণ ছাড়া আরো বিভিন্ন কারণে এই পদ্ধতি অগ্রগণ্য, যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের দলীলবিষয়ক বড় বড় কিতাবে রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের সাথে আমাদের মতভেদ এই বিষয়ে নয় যে, তারা যে পদ্ধতিটি কোন কোন ইমামের তাকলীদ করে প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ বারো তাকবীরের পদ্ধতি, তা ভুল বা খেলাফে সুন্নত। তাদের উপর আমাদের আপত্তি এই যে, তারা নিজেদের অবলম্বিত পদ্ধতিকেই একমাত্র মাসনূন পদ্ধতি বলে থাকেন এবং অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে এই দাবি করেন যে, হানাফীরা যে পদ্ধতিতে ঈদের নামায পড়ে তা কোন সহীহ হাদীস নয়, কোন সাহাবীর আমলও তা সমর্থন করে না। তাদের পদ্ধতিটি একটি ভিত্তিহীন ও খেলাফে সুন্নত পদ্ধতি! নাউযুবিল্লাহি মিন-যালিক।

তাদের এই উভয় দাবি সম্পূর্ণ অবাস্তব। তারা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন তা-ই ঈদের নামাযের একমাত্র পন্থা নয়। বরং তা হচ্ছে একাধিক জায়েয পন্থার একটি। তার বিপরীতে শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অধিকাংশই যে পন্থাটি অবলম্বন করেছেন এবং যা দলীলের বিচারেও অগ্রগন্য আমরা তা-ই অনুসরণ করি।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং প্রতিটি মতভেদকে তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার তাওফীক দান করুন। মাসআলা-মাসায়েলের মধ্যে যে ইখতেলাফ শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমোদিত ও সমর্থিত তার মাধ্যমে নিজেদের ঐক্য ও শক্তিমত্তাকে বিনষ্ট করা থেকে নিরাপদ রাখুন, আমীন।

অনুবাদ : মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ

তথ্যসূত্র

المصادر والمراجع

১. আল কুরআনুল কারীম

١. القرآن الكريم

২. তাফসীরে ইবনে আব্বাস রা.
দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত

٢. تفسير ابن عباس

৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর
ইসমাঈল ইবনে কাছীর (৭৭৪ হি.)
দারু ইহইয়াইত তুরাছ, বৈরুত ১৯৬৯

٣. تفسير القرآن العظيم
لابن كثير

৪. তাফসীরে কাবীর
ফখরুদ্দীন রাযী
মাতবা'আতুল বাহিয়্যা আলমিসরিয়্যা, ১৯৩৮ ঈ.

٤. التفسير الكبير للرازى

৫. যাদুল মাসীর
ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি.)
আল মাকতাবুল ইসলামী, দামেস্ক ১৯৬৭ ঈ.

٥. زاد المسير

৬. সহীহ মুসলিম
ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি.)

٦. صحيح مسلم

৭. সহীহ বুখারী
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (২৫৬ হি.)

٧. صحيح البخارى

৮. মুয়াত্তা মালিক
ইমাম মালিক ইবনে আনাস (১৬৯ হি.)

٨. الموطأ للإمام مالك

৯. জামে তিরমিযী
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (২৭৯ হি.)

٩. جامع الترمذي

১০. সুনানে আবু দাউদ
ইমাম আবু দাউদ আসসিজিস্তানী (২৭৫

١٠. سنن أبى داود

১১. সুনানে ইবনে মাজা ١١. سنن ابن ماجه
ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মাজা (২৭৫ হি.)

১২. সুনানে নাসায়ী ١٢. سنن النسائي
ইমাম নাসায়ী (৩০৭ হি.)

১৩. মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ١٣. الموطأ للإمام محمد
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (১৮৯ হি.)
মাতবায়ে ইউসুফী, লখনৌ ১৯২৭ ঈ.

১৪. মুসতাদরাকে হাকিম ١٤. المستدرك للحاكم
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকিম (৪০৫ হি.)
মাতারিফুন নাশর আল হাদীছা, রিয়াদ

১৫. শরহু মা'আনিল আছার ١٥. شرح معاني الآثار
ইমাম তহাবী (৩২১ হি.)

১৬. আল জাওহারুন নাকী ١٦. الجوهر النقي
আলাউদ্দীন আলী ইবনুত তুরকুমানী (৭৪৫ হি.)
মাজলিসু দাইরাতিল মা'আরিফিল উছমানিয়া, হিন্দ (১৩৪৬ হি.)

১৭. সুনানে কুবরা ١٧. السنن الكبرى للبيهقي
ইমাম বায়হাকী (৪৫৮ হি.) প্রাগুক্ত

১৮. মুসনাদে আহমদ ١٨. مسند أحمد
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (২৪১ হি.)
আল মাকতাবুল ইসলামী

১৯. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ١٩. مصنف ابن أبي شيبة
ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে আবী শাইবা (২৩৫ হি.)

২০. সহীহ ইবনে খুযায়মা ٢٠. صحيح ابن خزيمة
মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা (৩১১ হি.)
আল মাকতাবুল ইসলামী

২১. সুনানে দারাকুতনী ٢١. سنن الدار قطني
ইমাম আলী ইবনে উমর দারাকুতনী (৩৮৫ হি.)

২২. মাজমাউয যাওয়াইদ ٢٢. مجمع الزوائد
নূরুদ্দীন হাইছামী (৮০৭ হি.)
দারুল কুতুবিল আরাবী, বৈরুত ১৯৬৭ ঈ.

২৩. আল মু'জাম ٢٣. معجم الطبراني
ইমাম তবারানী

২৪. জামিউল মাসানীদ ٢٤. جامع المسانيد
খুওয়ারাযমী (৬৬০ হি.)
আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া

২৫. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ٢٥. مصنف عبد الرزاق
ইমাম আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম (২২১ হি.)
আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১৯৭০

২৬. বুলূগুল মারাম ٢٦. بلوغ المرام
ইবনে হাজার আসকালানী
ইদারা ইহইয়াউস সুন্নাহ

২৭. আছারুস সুনান ٢٧. آثار السنن
নীমাভী
দারুল ইশাআত, কলকাতা

২৮. শামায়েলে তিরমিযী ٢٨. شمائل الترمذي
ইমাম তিরমিযী (২৭৯ হি.)
কুতুবখানায়ে ইহইয়াভী, সাহারানপুর, এডিশন

২৯. মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল ٢٩. مختصر قيام الليل
মুহাম্মাদ ইবনে নস্‌র আলমাওয়ারদী (২৯৪ হি.)

৩০. যাদুল মা'আদ ٣٠. زاد المعاد
ইবনুল কাইয়েম
মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরুত ১৪০২ হি.

৩১. আল মাকাসিদুল হাসানা — ٣١. المقاصد الحسنة
সাখাবী (৯০২ হি.)
মাকতাবাতুল খালজী, মিসর ১৩৭৫ হি.

৩২. শরহু মুসলিম — ٣٢. شرح مسلم للنووي
নববী

৩৩. উমদাতুল কারী — ٣٣. عمدة القاري
বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫ হি.)

৩৪. ফাতহুল বারী — ٣٤. فتح الباري
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)
আল মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা

৩৫. শরহুল মুয়াত্তা — ٣٥. شرح الموطأ للزرقاني
আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ যুরকানী (১১২২ হি.)
মুসতফা আলবাবী, মিসর ১৩৮১ হি.

৩৬. আল মুসাফফা — ٣٦. المصفى
শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী
কুতুবখানায়ে রহীমিয়া, দিল্লী

৩৭. মা'আরিফুস সুনান — ٣٧. معارف السنن
মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী (১৩৯৭ হি.)
এইচ, এম, সায়ীদ, করাচি

৩৮. তাহকীকু আহমাদ কাবির লিজামিইত তিরমিযী — ٣٨. تحقيق أحمد شاكر لجامع الترمذي
আহমদ শাকির
ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত

৩৯. তুহফাতুল আহওয়াযী — ٣٩. تحفة الأحوذي
মুবারকপুরী (১৩৫৩ হি.)

৪০. আউনুল মা'বূদ — ٤٠. عون المعبود
শামসুল হক আযীমাবাদী (১৩২৯ হি.)

৪১. আত তা'লীকাতুস সালাফিয়্যা — ٤١. التعليقات السلفية
আতাউল্লাহ হানীফ
দারু নাশরিল কুতুবিল ইসলামিয়া, লাহোর

৪২. নাসবুর রায়া — ٤٢. نصب الراية
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আযযায়লায়ী (৭৬২ হি.)
আল মাজলিসুল ইলমী, ঢাবেল

৪৩. সুবুলুস সালাম — ٤٣. سبل السلام
মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আসসানআনী (১১৮২ হি.)
দারুল হাদীছ

৪৪. মিসকুল খিতাম শরহু বুলুগিল মারাম — ٤٤. مسك الختام
নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (১৩০৭ হি.)
মাতবায়ে শাহজাহানী, ভূপাল ১৩০৯ হি.

৪৫. নাইলুল আওতার — ٤٥. نيل الأوطار
আশ শাওকানী (১২৫৫ হি.)
দারুল জীল, বৈরুত

৪৬. আত তালখীসুল হাবীর — ٤٦. التلخيص الحبير
ইবনে হাজার আসকালানী
শারিকাতু তিবা'আতিল ফান্নিয়া, কায়রো

৪৭. জুযউল কিরাআ খালফাল ইমাম — ٤٧. جزء القراءة خلف الإمام
ইমাম বুখারী (২৫৬ হি.)

৪৮. আলউম্ম — ٤٨. الأم
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ শাফেয়ী (২০৪ হি.)
মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল আযহারিয়া ১৩৮১ হি.

৪৯. আল ই'তিবার ফিন নাসিখি ওয়াল মানসূখি মিনাল আছার — ٤٩. الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار
আবু বকর মুহাম্মাদ আল হাযেমী
ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত ১৩৪৬ হি.

৫০. ফাতহুল কাদীর — ٥٠. فتح القدير
ইবনুল হুমাম
দারুল ফিকর, বৈরুত ১৩৯৭

৫১. মীযানুল ই'তিদাল — ٥١. ميزان الاعتدال
আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আযযাহাবী (৭৪৮ হি.)

৫২. তাহযীবুত তাহযীব — ٥٢. تهذيب التهذيب
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.)
দাইরাতুল মা'আরিফিল নিযামিয়্যা, হিন্দ ১৩২৬ হি.

৫৩. তাদরীবুর রাবী — ٥٣. تدريب الراوي
জালালুদ্দীন সুয়ূতী
দারুল কুতুবিল হাদীছা ১৩৮০ হি.

৫৪. আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী'ইল ইসলামী — ٥٤. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي
মুসতফা সিবায়ী

৫৫৪. আছারুল হাদীছিশ শরীফ — ٥٥. أثر الحديث الشريف
মুহাম্মাদ আউয়ামা
মাতবা'আ মুহাম্মাদ হাশিম

৫৬. আল বিনায়া — ٥٦. البناية
বদরুদ্দীন আহমদ আল আইনী

৫৭. আদ দিরায়া — ٥٧. الدراية
ইবনে হাজার আসকালানী

৫৮. ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন — ٥٨. إعلام الموقعين
ইবনুল কাইয়েম
মাতাবিউল ইসলাম, মিসর

৫৯. আলমীযান — ٥٩. ميزان الشريعة الكبرى
শা'রানী
আল মাতবাআতুল আযহারিয়্যা

৬০. আল খায়রাতুল হিসান — ٦٠. الخيرات الحسان
ইবনে হাজার হাইতামী(৮৫২ হি.)
দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা

৬১. আলমুসতাসফা — ٦١. المستصفى
গাযালী
মাকতাবাতুল জুনদী, মিসর

৬২. ইরশাদুল ফুহুল — ٦٢. إرشاد الفحول
শাওকানী (১২০০ হি.)
মাতবাআ মুস্তফা আলবাবী ১৩৫৬ হি.

৬৩. আল ইজতিহাদ — ٦٣. الاجتهاد
সাইয়েদ মুহাম্মাদ মূসা
দারুল কুতুবিল হাদীছা, মিসর

৬৪. আল ইহকাম — ٦٤. الإحكام
আল আমিদী (৬৩১ হি.)
দারুল ফিকর

৬৫. আল মুদাওওয়ানাতুল কুবরা — ٦٥. المدونة الكبرى
ইমাম মালিক ১৭৮ হি.
মাতবাউস সা'আদা, মিসর

৬৬. জামিউ বায়ানিল ইলম — ٦٦. جامع بيان العلم
ইবনে আবদুল বার

৬৭. আত তারাবী আকছারা মিন আলফি 'আম — ٦٧. التراويح أكثر من ألف عام...
আতিয়্যা মুহাম্মাদ সালিম
মাতবাআতুল মাদানী ১৩৯১

৬৮. ইকদুল জীদ — ٦٨. عقد الجيد
শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী
আল মাতবা'আতুস সালাফিয়্যা, কায়রো

৬৯. আল আহকাম — ٦٩. الأحكام
ইবনে হায্ম (৪৫৬ হি.)
মাতবাআতুস সা'আদা, মিসর

৭০. আল ফাতাওয়া — ٧٠. الفتاوى
ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.)

৭১. ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া মিসরিয়া — ٧١. فتاوى ابن تيمية المصرية
ইবনে তাইমিয়া
মাতবাআতু কুর্দিস্তান, মিসর ১৩২৬ হি.

৭২. কায়িদাতু আনওয়াইল ইসতিফতাহ — ٧٢. قاعدة أنواع الاستفتاح
ইবনে তাইমিয়া
আদ দারুল কাইয়েম, মুম্বাই ১৯৬২

৭৩. মুখতাসারু ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া — ٧٣. مختصر فتاوى ابن تيمية
মুহাম্মাদ ইবনে আলী আলবা'নী
দারু নাশরিল কুতুব, গুজরানওয়ালা
১৩৯৭ হি.

৭৪. আল ফাতাওয়াল ফিকহিয়্যা — ٧٤. الفتاوى الفقهية
ইবনে হাজার হাইতামী
আব্দুল হামীদ আহমদ, মিসর

৭৫. আবু হানীফা — ٧٥. ابو حنيفة
আবু যাহরা
দারুল ফিকরিল আরাবী

৭৬. তানাওউউল ইবাদাত — ٧٦. تنوع العبادات
ইবনে তাইমিয়া
মাতবাআতুল ইমাম, মিসর

৭৭. আল আইম্মাআতুল আরবা'আ — ٧٧. الائمة الأربعة
মুসতফা আশশাকলা
দারুল কিতাবিল মিসরী

৭৮. তাজুল আরূস — ٧٨. تاج العروس
আযযাবীদী
দারু মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরুত
১৩০৬

৭৯. আল মুগনী — ٧٩. المغني
ইবনে কুদামা
মাতবাআতুল ইমাম, মিসর

৮০. আল মুহাল্লা — ٨٠. المحلى
ইবনে হায্‌ম
প্রাগুক্ত

কিতাবে উল্লেখিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে একটি কথা

এ কিতাবে কুরআন মাজীদের মোট একত্রিশটি আয়াত এবং তিনশ দশটি হাদীস ও আছার উল্লেখিত হয়েছে। একশ সাতচল্লিশটি হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম কিংবা কোনো একটিতে রয়েছে। আটাশিটি হাদীস কুতুবে সিত্তার অপর চার কিতাব (সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহ) থেকে নেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট পঁচাত্তরটি হাদীস অন্যান্য গ্রহণযোগ্য হাদীস গ্রন্থ (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সুনানে বায়হাকী ও তহাবী ইত্যাদি) থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অর্ধেকের কিছু কম হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও তা সহীহ হওয়ার প্রতি যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বরং অধিকাংশ হাদীসের সঙ্গেই মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্বীকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর একটি উপকারিতা এই যে, কিতাবটি অধ্যয়নের সময় এতে উল্লেখিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে পাঠকের মন আশ্বস্ত থাকবে। দ্বিতীয়ত ওই ভুল ধারনারও জবাব হবে, যা একশ্রেণীর মানুষ হাদীসে নববী সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার করে রেখেছে। যাদের নীতি হল কোনো ধরণের বিচার বিবেচনা ছাড়াই ওইসব হাদীসকে জায়ীফ বলে দেয়া, যা তাদের কল্পনা প্রসূত অবস্থানের বিপরীত মনে হয়।

"এ কিতাব থেকে পয়গম্বরে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায স্পষ্টভাবে সামনে আসে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা যেসব বিভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকে তার স্বরূপ বুঝতেও এ কিতাব সহায়ক হবে। তাই ব্যক্তিগত অধ্যয়নের পাশাপাশি মসজিদে জামাতের নামায শেষে আগত মুসল্লীদেরকে দু' একটি আয়াত বা হাদীস পড়ে শুনিয়ে দিলে তা ইলম ও বরকতের কারণ হবে। আর ছাত্রদেরকে এ কিতাবের দলীলগুলো মুখস্থ করিয়ে দেওয়া উচিত।"

(মাওলানা) মুহাম্মদ আসআদ মাদানী– জানাশীন শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী

design : najmul haider · abul creation